রবি কুমার সাহা

২৬/৪/১৯৮৫.

ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চার জনক জগদীশচন্দ্র

দিবাকর সেন

পরিবেশক
নবীন গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪৩-বি বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

Bharatia Bijnancharchar Janak Jagadischandra

By. Dibakar Sen

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬

প্রকাশক
ইন্দো-জি ডি আর মৈত্রী সমিতির পক্ষে
ডঃ পঞ্চানন সাহা
২৭-জি, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

মুদ্রক
ফ্রেন্ডশিপ প্রিন্টার্স
২৭-জি, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

প্রচ্ছদ শিল্পী :
আলোকশঙ্কর মৈত্র

দাম—কুড়ি টাকা

ভূমিকা

ভারতের বিজ্ঞানীদের মধ্যে অধ্যাপক রামানুজম অংকশাস্ত্র চর্চার মাধ্যমে তাঁহার প্রতিভার স্বীকৃতি পাইলেও আচার্য জগদীশচন্দ্রই প্রথম ভারতীয় যিনি স্থায়ীভাবে ভারতের নামকে বিশ্বের বিজ্ঞানজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার বহু কারণ আছে, যাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হইল যথা ঃ

(১) তিনি ইংল্যাণ্ডের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করায় তাঁহার আবিষ্কার ও গবেষণার বিবরণসহজেই পাশ্চাত্ত্য জগতের গবেষণা পত্রিকাগুলিতে বিবেচিত হইত, (২) ব্যবহারিক বিজ্ঞানে তাঁহার পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্ত্যে বিজ্ঞানীদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে তিনি সক্ষম হইয়াছিলেন ও পরিচিতি ও প্রশংসাও লাভ করিয়াছিলেন, (৩) জড় ও সজীবের মধ্যে তিনি নানা বিষয়ে যে সাদৃশ্য বর্ত্তমান তাহা প্রত্যক্ষ পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন যাহা তখন ভালভাবে স্বীকৃত না হইলেও বর্ত্তমান জৈব পদার্থবিদ্যার চর্চার পত্তন করিয়াছিলেন, (৪) বিলাতের রয়াল সোসাইটি বা ফরাসী বিজ্ঞান একাডেমীর ও অনুরূপ সংস্থার স্বীকৃতি তাঁহাকে বিশ্ববিখ্যাত হইতে সাহায্য করিয়াছিল। কিন্তু ভারতবাসী তথা বাঙালী হিসাবে আমাদের যাহা গর্বের বিষয় তাহা হইল তাঁহার জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেম যাহা তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া সর্বদা আত্মবিশ্বাসের সহিত দুরূহ বৈজ্ঞানিক সমস্যার উপযুক্ত সমাধান আবিষ্কারে আস্থা যোগাইয়াছিল, যাহার কতকাংশ তিনি দেশবাসীর মধ্যে সঞ্চারিত করিতে পারিয়াছিলেন। বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি তাঁহার নিজের বৈজ্ঞানিক আদর্শকে উত্তরসূরীদের মধ্যেও রোপণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

এইজন্যই আচার্য জগদীশচন্দ্রের ঐতিহাসিক অবদান ভারতের বিজ্ঞান চর্চাকে নূতনতর পথের সন্ধানে চিরদিন প্রেরণা যোগাইবে। আজিকার অনুকূল পরিবেশে তাঁহার প্রেরণা ভারতের সকল বিজ্ঞান-সাধকদের উদ্দীপ্ত রাখিতে চিরসহায়ক হইয়াছে। শ্রী দিবাকর সেন প্রণীত বর্ত্তমান গ্রন্থটি এই মহান বিজ্ঞানীর জীবন ও কর্মের ক্ষুদ্র প্রয়াস হইলেও একটি মহান প্রচেষ্টা।

ইতি

শ্রী মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী

উপাচার্য, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

লেখকের কথা

ভারতীয় আধুনিক বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসে আচার্য জগদীশচন্দ্র প্রবাদ-পুরুষে পরিণত হয়েছেন। কিন্তু কোনো মানুষ যখন প্রবাদে পরিণত হ'ন তখন অনেকক্ষেত্রেই অর্ধসত্যের সঙ্গে বিভিন্ন ধরণের আবেগের সংমিশ্রণের ফলাফল পাঠকের দরবারে হাজির হয়। তাতে প্রকৃত ইতিহাসের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় না, বরং বিভ্রান্তিকেও বাড়ানো হয়। জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে এ অভিজ্ঞতা আমার কর্মজীবনের। বর্তমান গ্রন্থে এসব প্রশ্ন মনে রেখেই জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত একটি সত্যানিষ্ঠ চিত্রই তুলে ধরতে চেয়েছি। তাছাড়া গ্রন্থখানিতে বক্তব্যের মূল ভাবধারা যথাযথ রাখার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দুষ্প্রাপ্য উদ্ধৃতিগুলোকে বাংলায় অনুবাদ করতে সচেষ্ট হয়নি। আলোকচিত্র ও অপ্রকাশিত চিঠিপত্র জে, সি, বোস ট্রাস্টের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

বর্তমান গ্রন্থের প্রধান উদ্যোক্তা ডঃ পঞ্চানন সাহা, তাঁর আগ্রহ ভিন্ন এই গ্রন্থ রচনা সম্ভব হয়ে উঠত না। আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার ভূমিকা লিখেছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিজ্ঞানী মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী। এজন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

"ভারত ও সমাজতান্ত্রিক জি. ডি. আর" পত্রিকায় গ্রন্থটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। সেই সুবাদে পাঠকদের তরফ থেকে লিখিতভাবে এবং মৌখিক অনেকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। এজন্য তাঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন শিল্পী অলোক শঙ্কর মৈত্র ও প্রয়োজনীয় আলোকচিত্র তুলেছেন সুধীন্দ্র কিশোর চক্রবর্তী। গ্রন্থটি ছাপবার ব্যাপারে যাঁরা নানাভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন বিপ্লব প্রধান, সুশান্ত চৌধুরী, কণাদ মাইতি ও শিশিরকুমার ঘোষাল।

এঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

দিবাকর সেন,
আচার্য জগদীশচন্দ্রের যন্ত্রাগার,
উদ্ভিদতত্ত্ব বিভাগ
বসু বিজ্ঞান-মন্দির।

ভারতবর্ষের আধুনিক বিজ্ঞানচর্চার জনক আচার্য জগদীশচন্দ্র অনেক আশ্চর্য সংগ্রামের ভেতর দিয়ে গবেষণার কাজ করেছেন। একথা সবারই জানা। কিন্তু তখনকার দিনে কি অবস্থায়, কি পরিস্থিতিতে জগদীশচন্দ্র কি রকম প্রতিবন্ধকতার সামনে পড়েছিলেন। সে বাধা কি আকস্মিক বা কোনও ব্যক্তি কিম্বা গোষ্ঠীবিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল? নাকি কোনও সুনির্দিষ্ট অপকৌশলের জালে তিনি পড়েছিলেন। তার সঠিক কোনও ইতিহাস চোখে পড়েনি। তাই বোধহয় জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে কোনকিছু ভাবনাচিন্তা করতে গেলে দরকার তাঁর সময় ও সময়ের পটভূমিকা সম্পর্কে কিছু আলোচনা।

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে বেশকিছু ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ভারতে এসেছিলেন। উদ্দেশ্য, ভারতের অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে বৃটেনের বাণিজ্যিক উদ্যোগকে ফলপ্রসূ করা। শুরুতে এরা দু'টি কাজকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। প্রথমটি ভারতবর্ষের মানচিত্র তৈরি করা। দ্বিতীয়টি সেনাবাহিনীর প্রয়োজনে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটানো। এই কাজকে ত্বরান্বিত করতে গেলে প্রয়োজন লোকবল। ভারতের মাটিতে ভারতীয় কর্মী নিয়োগই সুবিধাজনক। তাই এতে কিছু ভারতীয়ের কর্মসংস্থান হ'লো। তবে গোপন শর্ত অনুযায়ী। জানা যায় সৈন্যবিভাগের একাউন্টেন্ট জেনারেলের এক নির্দেশনামা থেকে। গোপন নির্দেশটি পাঠানো হয়েছিল সার্ভেয়ার জেনারেলকে। তাতে লেখা 'throw cold water on all natives being taught or employed in making Geographical discoveries.'

সর্বকালের নিয়ম অনুসারে, সম্ভবত আমাদের দেশেও বিজ্ঞানের প্রথম পদক্ষেপ ঘটে চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতির মাধ্যমে। এই চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির শুরুতেও ছিল একই ধরনের বঞ্চনা। ১৮৩১ সালে রামকমল সেন (কেশবচন্দ্র সেনের ঠাকুর্দা), আত্মভোলা গ্রান্ট সাহেবের সহযোগিতায় কলকাতার সংস্কৃত কলেজে একটি ছোট্ট হাসপাতাল চালু করেন। প্রতিষ্ঠানটির নাম ছিল 'Sanskrit College Hospital'। এখানে ডাক্তারি পড়ানো হ'ত মাতৃভাষায়। ভারতবর্ষ বিশাল দেশ। তাই সর্বত্র ইয়োরোপীয় ডাক্তার নিয়োগ খরচ সাপেক্ষ

ব্যাপার। এ সমস্যার সহজ সমাধান হ'ল দেশীয় মানুষদের কিছুটা ডাক্তারি শিখিয়ে নেওয়া। এই ভাবধারার পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৩৫ সালে গড়ে ওঠে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ। এখান থেকে পাশকরা ছাত্ররা কেউ কোনও উচ্চ পদে চাকুরি পেতেন না। তাদের জন্য সর্বোচ্চ পদ বাধা ছিল 'সাব-এসিস্টেন্ট সার্জন' অবধি। এই বঞ্চনার পরিপ্রেক্ষিতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কলকাতায় সম্পূর্ণ ভারতীয় উদ্যোগে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার জন্য দু'টি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। প্রথমটি রাজাবাজার ট্রেনটার্মিনাসের কাছে (সে সময় রাজাবাজারে একটি ট্রেন টার্মিনাস ছিল। নাম ক্যালকাটা মেডিক্যাল স্কুল। দ্বিতীয়টি বর্তমান বসুবিজ্ঞান মন্দিরের বিপরীত দিকে। এখন যেখানে ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়। নাম ছিল College of Surgeons and Physicians. প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই দু'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই ছিল বর্তমান আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডের ওপর। ১৯০৪ সালে এই দু'টি প্রতিষ্ঠান মিলে সম্পূর্ণ ভারতীয় উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজ বা আজকের আর. জি, কর মেডিক্যাল কলেজ।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় ভারতীয়দের অধস্থ পদে নিয়োগের সংখ্যা ১৮৮০ সালের পর থেকে কিছু বাড়ে। কারণ একটিই। খুব কম খরচে কাজ করিয়ে নেওয়া। ১৮৮০ সালে বৃটিশ সরকারের আণ্ডার সেক্রেটারি Mr. C.S Baley-'র রিপোর্টে বৃটিশ সরকারের নীতি পরিস্ফুট। তিনি লিখেছিলেন, Why incur-extra-expenditure by importing qualified geologists from England. As an official had noted earlier, the natives are very much cheaper ; if the works is to be really done thoroughly in future genarations, it must be done by the natives of India. প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৮৯১ সালে Lansdowne-এর রিপোর্টেও ওপরের বক্তব্যের সাক্ষ্য মেলে।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের এই নীতির ফলে দেখা যায় গোটা উনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত ৩৫০টি গবেষণাপত্রের মধ্যে ভারতীয়দের দ্বারা লিখিত প্রবন্ধের সংখ্যা মোটে তিনটি!

এই পটভূমিকায় ১৮৫৮ সালের ৩০শে নভেম্বর আচার্য জগদীশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। অধুনা বাংলাদেশের ময়মনসিংহ শহরে। পিতা ভগবানচন্দ্র বসু ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। সরকারি কাজ ছাড়াও তিনি স্বদেশী ব্যবসা,

দেশের ছেলেদের জন্য কারিগরী শিক্ষার স্কুল, কৃষকদের জন্য ঋণের ব্যবস্থা ইত্যাদি নানা ধরনের জনকল্যাণমূলক কাজের পথিকৃৎ ছিলেন। পথিকৃতের পথ সর্বদাই অসমান। তাঁর জীবনে সার্থকতা ছিল ক্ষুদ্র, বিফলতা ছিল বিরাট। পরবর্তীকালে জগদীশচন্দ্র পিতার এই বহুমুখী কর্মপ্রয়াসের কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন, 'যখন ফল ও নিষ্ফলতার মধ্যে প্রভেদ ভুলিতে শিখিলাম তখন হইতেই আমার প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হইল।'

তখনকার দিনে ইংরেজী স্কুলে ভর্তিকে উচ্চ শিক্ষার প্রাথমিক সোপান হিসেবে গণ্য করা হত। তাছাড়া আভিজাত্যের প্রশ্নও এতে জড়িত ছিল। কিন্তু শিশুশিক্ষার ব্যাপারে ভগবানচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল পৃথক। তিনি বিশ্বাস করতেন 'জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয়সাধন ও দেশের জনগণের সঙ্গে নিজের মনের সংযোগ যদি একান্ত কাম্য হয় তবে মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষার উদ্বোধন হওয়া উচিত।' পুত্রকে তিনি গ্রামের পাঠশালায় পাঠিয়েছিলেন। স্কুলে সহ-পাঠীদের প্রায় সবাই ছিল সমাজের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর শিশু। তাদের সাথে মিশে, শিশু জগদীশচন্দ্রের কীটপতঙ্গ ও গাছপালার স্বভাব লক্ষ্য করার মত একটা মন গড়ে ওঠে। সমাজ জীবনের এই প্রথম পাঠই জগদীশচন্দ্রকে প্রকৃতিমুখী করে তোলে। জানা যায় তাঁর নিজের কথাতেই। তিনি বলেছিলেন 'স্কুলে দক্ষিণ দিকে আমার পিতার মুসলমান চাপরাশীর পুত্র এবং বাম দিকে এক ধীবর পুত্র আমার সহচর ছিল। তাদের নিকট আমি পক্ষী ও জলজন্তুর বৃত্তান্ত স্তব্ধ হইয়া শুনিতাম। সম্ভবত, প্রকৃতির কার্য অনুসন্ধানে অনুরাগ এই সব ঘটনা হইতেই আমার মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল।' জগদীশচন্দ্রের শিশুমনে আরও একটি প্রবণতা আমরা দেখতে পাই, ছোটখাট দু'একটি ঘটনার মাধ্যমে। এর উল্লেখ রয়েছে অধ্যাপক দেবেন্দ্র মোহন বসুর জীবনস্মৃতিতে। তিনি লিখে ছিলেন, 'একদা তিনি (জগদীশচন্দ্র) চারটি গুবরে পোকা ধরে সুতো দিয়ে বেঁধে দেশলাই বাক্সের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন। তাতে সুন্দর একটি রথ তৈরী হয়েছিল। এইখানে ভবিষ্যৎ প্রকৃতিবাদীর সঙ্গে ভবিষ্যৎ ইঞ্জিনিয়ারের মিলন ঘটেছে। পরবর্তীকালে আমরা তাঁকে স্কুল পাম্পিং ব্যবস্থা দ্বারা ছোট ছোট নালির সাহায্যে একটা পোলের তলা দিয়ে জল-সরবরাহের ব্যবস্থা করতে দেখি। বাল্যকালে তিনি বোনদের সঙ্গে জন্তু পুষতেন ও তাদের জন্য খাঁচা তৈরি করতেন। পরবর্তীকালে যখন তাঁর পিতা বর্ধমানের ম্যালেরিয়া মহামারীতে অনাথ ছেলেদের জন্য একটি শিল্পশিক্ষা কেন্দ্র খুলেছিলেন তখন কিশোর

জগদীশচন্দ্র তাঁর মায়ের কাছে চেয়েচিন্তে যোগাড় করা ভাঙা পিতল বাসনপত্র ঐ কারখানায় গালিয়ে একটা ছোট্ট পিতলের কামান তৈরি করেছিলেন।'

ভগবানচন্দ্র সেকালে প্রায়ই কৃষিমেলা ও শিল্প-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতেন। সাথে গ্রামীণ যাত্রাগানের ও কথকতার আসর বসতো। সেইসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই বালক জগদীশচন্দ্র রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনাবলী জানতে পারেন। তা থেকে যে নীতিশিক্ষা তিনি শৈশবে পেয়েছিলেন, সে বিষয়ে উত্তর জীবনে বলেছিলেন; 'বর্তমানকালে স্কুলকলেজের পাঠ্যসূচীর মধ্য দিয়ে নৈতিক শিক্ষাদানের নীরস চেষ্টা আশানুরূপ সার্থকতা লাভ করেনি বলে অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। আমাদের শৈশব নীতিশিক্ষার প্রণালীটা ছিল অন্যরূপ। কথকদের মুখে রামায়ণ-মহাভারতের নানারকম কাহিনীর সরস ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ নৈতিক শিক্ষা লাভ করতো। জীবনের প্রাথমিক অধ্যায়ে আমাদের হৃদয়ানুভূতির উপর যে কথকতার আবেদন তা আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। তফাৎ শুধু এই যে, তখন যা নিছক ঐতিহাসিক ঘটনার ক্রমবিবরণী বলে মনে করিয়াছিলাম, আজ তা চিরকালের সত্য হয়ে ধরা পড়েছে। পার্থিব ও অপার্থিব জগতের স্বরূপ নির্ণয়ের জন্যে মানুষের যে অন্তহীন প্রয়াস, এসব কাহিনী যেন তারই রূপক।' কর্ণের বীরত্ব ও নিষ্ঠা বালক জগদীশচন্দ্রকে চিরকালের জন্য মুগ্ধ করেছিল। কর্ণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে অন্যত্র তিনি বলেছিলেন, 'আমিই আমার পূর্বপুরুষ, গঙ্গাকে কি কেহ জিজ্ঞাসা করে কোন উৎস হইতে তাহার জন্ম ? স্রোতেই তার পরিচয়।' পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রের অনুরোধে কর্ণচরিত্রকে কেন্দ্র করে কবিতা লেখেন।

১৮৬৯ সালে জগদীশচন্দ্র কলকাতায় এলেন। ভর্তি হলেন সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে। নগর-সভ্যতার সাথে প্রথম পরিচয়। স্কুলের প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা বিচিত্র। অভিজ্ঞতাটি জগদীশচন্দ্রের ব্যক্তি চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকেও অনুধাবনযোগ্য। ক্লাস শেষে বিকেলে সদ্যপরিচিত সহপাঠীদের প্রতিনিধি হিসেবে একজন সহপাঠী তাঁকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে বসলো। ব্যাপারটি পূর্বপরিকল্পিত ও শর্তসাপেক্ষ। যুদ্ধে পরাজিত হ'লে স্কুলে আর আসা চলবে না। পরবর্তীকালে এই ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে জগদীশচন্দ্র বলেছিলেন, সেদিনের লড়াইটা আমার কাছে ছিল অস্তিত্বের লড়াই। আর ওদের কাছে ছিল খেলার লড়াই। অস্তিত্বের প্রশ্নে আমাকে অনেক মূল্য দিয়ে অসম যুদ্ধে জিততেই হলো। জগদীশচন্দ্রের এই রূপটির প্রথম পরিচয় পেতে

গেলে আমাদের আবার ফিরে যেতে হবে আরও বেশ কয়েক বছর পেছনে। যখন জগদীশচন্দ্রের বয়স সবে পাঁচ কি ছয়। পিতা ভগবানচন্দ্র বসুর সাজাপ্রাপ্ত একজন ডাকাত সর্দার সদ্য জেলখানা থেকে ছাড়া পেয়েছে। স্বাভাবিক জীবন-যাপনের প্রতিশ্রুতিতে বালক জগদীশচন্দ্রের দেখাশুনো করার ভার তাঁর ওপর বর্তেছে। সর্দারের সময় কাটে বালক জগদীশচন্দ্রকে নানা ডাকাতির গল্প বলে। এমন সময়ে জগদীশচন্দ্রকে একটি ছোট্ট টাট্টু ঘোড়া কিনে দেওয়া হলো। ঘোড়ার পিঠে ঘুরে বেড়ান জগদীশচন্দ্র। কিছুদিনের মধ্যেই শহর ফরিদপুরে এক ঘোড়দৌড়ের আসর বসলো। ঘোড়ার পিঠে জগদীশচন্দ্র গেছেন দৌড় দেখতে। ছোট্ট ঘোড়া ও তার ছোট্ট সওয়ারী দেখে একজন প্রতিযোগী হঠাৎ বলে বসলেন, কি হে, তুমিও কি দৌড়বে ? যেমনি কথা, তেমনি কাজ। রাজী হয়ে গেলেন জগদীশচন্দ্র। ঘোড়দৌড়ের অভিজ্ঞতা তাঁর পক্ষে নূতন। তাছাড়া প্রতিযোগীরা সবাই প্রাপ্তবয়স্ক। শুরু হলো দৌড়। জগদীশচন্দ্র ভয় পেলেন না। সবার শেষে রক্তাক্ত দেহে পৌঁছলেন বালক জগদীশচন্দ্র। কিন্তু নির্দিষ্ট দূরত্ব ঠিক ঠিক ভাবে অতিক্রম করলেন। পথে থেমে যাননি। এই যে শেষপর্যন্ত দেখার প্রবণতা, তা পরবর্তীকালের বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জগদীশচন্দ্রের চরিত্রে অম্লান দেখা যায়।

১৮৭৫ সালে জগদীশচন্দ্র সেণ্ট জেভিয়াস' স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও সেণ্ট জেভিয়ার্সেরই কলেজ বিভাগে ভর্তি হন। ১৮৮০ সালে বি. এ. পাশ করেন। কলেজ জীবনে 'ল্যাটিন' তাঁর অন্যতম বিষয় ছিল। কলেজে তিনি বিশিষ্ট বিজ্ঞান অধ্যাপক ফাদার লাফোঁর ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আসেন। ফাদার লাফোঁর প্রাঞ্জল বিজ্ঞান বিষয়ক ব্যাখ্যা জগদীশচন্দ্রের খুব ভাল লাগত। কলেজে ছাত্র অবস্থায় তিনি একবার বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সে ভ্রমণের বর্ণনা বড় সুন্দর। লিখেছিলেন পিতা ভগবানচন্দ্র বসুকে। 'গতকাল আমার অধ্যাপকের সহিত শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন দেখিতে গিয়াছিলাম। কলিকাতার নিকটে যে এইরূপ একটি চমৎকার পরিবেশ আছে তাহা পূর্বে জানিতাম না। গাড়ী হইতে নামিয়া বাগানের ফটকে উপস্থিত হইয়া চারিদিকে তাকাইয়া আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। ফরিদপুর হইতে আসিয়া অবধি শহরের কৃত্রিম আবেষ্টনীর মধ্যে আমার প্রাণ যেন হাফাইয়া উঠিতেছিল। তাই গঙ্গার তীরে এই বিস্তৃত উদ্যানটি দেখিয়া আমার মন জুড়াইয়া গেল। বিকাল অবধি বেড়াইয়া আনন্দ ও শিক্ষা দুইই লাভ করিয়াছি।'

বি. এ. পাশ করার পর সমস্যা দেখা দিল। যে সমস্যা আমাদের অধিকাংশ মানুষের। তিনি কি করবেন। ইচ্ছে ছিল লণ্ডনে গিয়ে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়ে ভারতীয় শাসন-বিভাগে যোগ দেন। কারণ সে সময় গোটা পরিবার আর্থিক কারণে ক্ষতিগ্রস্ত। ভাল চাকুরি দরকার। কিন্তু পিতা অনুমতি দিলেন না। বললেন, তাঁকে এমন একটা বিষয় নিতে হবে যাতে নিজেকে ছাড়া আর কাউকে শাসন করার প্রশ্ন থাকবে না। জগদীশচন্দ্র লণ্ডন গিয়ে ভর্তি হলেন ডাক্তারি পড়তে। কিন্তু শারীরিক কারণে ডাক্তারি পড়া ছাড়তে হলো। তিনি লণ্ডনের ক্রাইস্ট কলেজে ভর্তি হলেন। প্রথমেই ঠিক করতে পারলেন না, কোন বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করবেন। অবসর সময়ে তিনি বিভিন্ন বিষয়ের খ্যাতনামা পণ্ডিতদের বক্তৃতা শুনতে লাগলেন। কেটে গেল প্রথম বছর। দ্বিতীয় বছরে পদার্থ, রসায়ন ও উদ্ভিদবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনো শুরু করলেন। ১৮৮৩ সালে জগদীশচন্দ্র প্রকৃতি-বিজ্ঞানে ট্রাইপোস পাশ করলেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। একই বছরে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এস-সি. ডিগ্রিও। ১৮৮৪ সালে দেশে ফিরে যোগ দিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তখনকার বৃটিশ শিক্ষাবিদদের মনোবৃত্তির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে পরবর্তীকালে জগদীশচন্দ্র একবার বলেছিলেন, 'Sir Croft, D. P. I., told me frankly that an Indian was temperamentally unfit to teach the exact method of modern Science'.

প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেওয়ার পরই গবেষণার সুযোগ ঘটল না। দেখলেন আশ্চর্য ব্যাপার। একই যোগ্যতাসম্পন্ন একজন ভারতীয় অধ্যাপকের বেতন ইউরোপীয় অধ্যাপকের দুই-তৃতীয়াংশ আর চাকুরি পাকা না হলে তারও অর্ধেক। তাছাড়া ছাত্রদের পঠনপাঠনের রীতিও বড় অদ্ভুদ। সঠিক অর্থে সেখানে প্রয়োগশালার কোনও অস্তিত্ব নেই।

এক দিকে তিনি উঠে পড়ে লাগলেন প্রত্যক্ষ পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্রদের পড়ানোর ব্যবস্থার কাজে। অন্যদিকে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন অপমানজনক বেতন-বৈষম্যের প্রতিবাদে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এ বৈষম্যের সূত্রপাত ১৮৪৮ সালে। প্রথম ভারতীয় বিলেত ফেরত ডাক্তার হিসেবে ডাঃ ভোলানাথ বসু ও ডাঃ বি. এন. শীল যখন ইংলণ্ড থেকে M.D. পাশ করে দেশে ফিরেছিলেন তখন তাঁদের কোন উচ্চ পদ দেয়া হয়নি। বাংলা সরকার এঁদের নিয়োগের ব্যাপারে এক গোপন রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন স্বাস্থ্যবিভাগের নিয়োগকর্তাকে। রিপোর্টে বলা

হয়েছিল, "যদিও দুজন 'নেটিভ' ঘটনাচক্রে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে লণ্ডন থেকে M. D. পাশ করে এসেছে তবুও কোনভাবেই এদের কোন উচ্চ পদে চাকুরী দেওয়া চলে না। তাহলে অন্যান্য 'নেটিভরা' উচ্চাকাঙ্খী হবে।"

জগদীশচন্দ্রকে প্রথম ভারতীয় হিসেবে এ সংগ্রামে জয়ী হতে সময় লেগেছিল তিন বছর। আর নয় বছর কেটেছিল প্রয়োগশালাকে পরীক্ষার উপযুক্ত করতে। তবে এ সময়ে জগদীশচন্দ্রের একটি পকেট ডায়রীতে তাঁর গবেষণামূলক চিন্তা-ধারার সাক্ষ্য মেলে। ডায়রীটি আজ এক দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার নিজস্ব আত্ম-আলাপনের দলিলে পরিণত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এ ডায়রীর ব্যাপারটি প্রথম জানা যায় আচার্য জগদীশচন্দ্রের মহাপ্রয়াসের পর। ১৯৩৮ সালে। ডায়রীটি ১৮৮৫ সালের। ৫ই মার্চ, রবিবার। ছুটির দিনে বসে লিখছেন তরুণ জগদীশচন্দ্রঃ

'বিষুব অঞ্চলে যে অফুরন্ত সৌরশক্তি নষ্ট হয় তা কোনও উপায়ে কাজে লাগানো যাইতে পারা যায় কিনা, তাহা লইয়া আমি অনেক ভাবিতেছি। অবশ্য গাছপালা সৌরশক্তিকে কাজে লাগায়। কিন্তু এই প্রবহমান সৌরশক্তিকে সরাসরি কাজে লাগাইয়া সৌর এঞ্জিন (যাহা একটি তাপ এঞ্জিন ছাড়া কিছুই নহে) তৈয়ারী করিবার চেষ্টা হইয়াছে। যে-কোনও সংযোগস্থলে তাপ প্রয়োগ করিয়া আমরা তাপ-বৈদ্যুতিক প্রবাহও পাইতে পারি। কিন্তু এই রকম তাপ-বৈদ্যুতিক ব্যাটারী প্রকৃতপক্ষে কোনও কাজেই লাগে না। প্রচুর শক্তিও পরিবহনের সময় নষ্ট হয়। এখন আমার চিন্তা সৌরশক্তিকে সরাসরি বিদ্যুৎপ্রবাহে রূপান্তরিত করা যাইতে পারে কিনা।

'ক্লোরোফিলের সাহায্যে সূর্যকিরণ কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে বিশ্লিষ্ট করিয়া কার্বন জমা করে এবং ইহার ফলে Kinetic energy* পরিণত হয় Potential Energy-তে। 'এই রাসায়নিক ভাঙাগড়ার প্রক্রিয়ায় লাল হলুদ রং-এর সূর্যরশ্মি সব থেকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। ধরা যাউক, ভাঙার জন্য কার্বন-ডাই-অক্সাইড পাওয়া গেল না। তাহা হইলে শোষিত সৌরশক্তি কিরূপ লইয়া নির্গত হইবে? সম্ভবত, তাপশক্তিরূপে। কিন্তু শোষিত সূর্যশক্তি হইতে আমরা কি বৈদ্যুতিক শক্তি পাইতে পারি?'

এ বিষয়ে ডায়রীতে আর কিছু লেখা নেই। তবে রয়েছে কিছু খসড়া। খসড়াটি খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যায়, এই সমস্যাটি নিয়ে জগদীশচন্দ্র সে সময় বেশ কিছুকাল মনোযোগ দিয়েছিলেন।

*আলোকের প্রবহমান শক্তিকে জগদীশচন্দ্র Kinetic Energy বলেছেন।

১৮৮৭ সালের জানুয়ারি মাসে জগদীশচন্দ্রের বিয়ে হয় দুর্গামোহন দাশের দ্বিতীয়া কন্যা অবলাদেবীর সঙ্গে। সেকালে দুর্গামোহন সমাজ-সংস্কারের একজন বড় নেতা ছিলেন। ১৮৮১ সালে অবলাদেবী প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। আবেদন করেন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে। ডাক্তারী পড়ার জন্য। কিন্তু আবেদন নামঞ্জুর হয়। কারণ তিনি মেয়ে। প্রতিবাদে দুর্গামোহনের ইচ্ছায় অবলাদেবী মাদ্রাজে যান ও সেখানকার মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দুর্গামোহন দাশের প্রথম জামাতা পি. কে. রায় ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথম বাঙালী অধ্যক্ষ, আর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ছিলেন ভ্রাতুষ্পুত্র।

উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি বৈজ্ঞানিক ম্যাক্স্ওয়েল একটি গাণিতিক সূত্র প্রতিষ্ঠা করেন। সূত্রের সাহায্যে তিনি বললেন, 'কোনও বৈদ্যুতিক পরিবাহকের মধ্যে যদি বিদ্যুৎশক্তি স্পন্দিত হতে থাকে, তবে চারদিকের অপরিবাহী মাধ্যমেও এক বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে। ছড়িয়ে পড়া বৈদ্যুতিক তরঙ্গের গতিবেগ আলোর গতিবেগের সমান। তাছাড়া সাধারণ আলোকও আসলে শূন্যে ছড়িয়ে পড়া বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ। এবং এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য খুব ছোট।

গাণিতিক সূত্রের অস্তিত্ব বাস্তবে পরিণত হলো জার্মান বিজ্ঞানী হাইনরিখ হার্ৎসের হাতে। বৈজ্ঞানিক হার্ৎস ছিলেন আশ্চর্য করিৎকর্মা পুরুষ। জার্মানীর Hamburg শহরে ছেলেবেলা কাটে। তিনি মাত্র ১৫ বছর বয়সে স্কুলের পড়া ছেড়ে দেন। দিনে মাত্র একঘণ্টা করে গৃহশিক্ষকের কাছে পড়াশুনা করতেন। বাকি সময়টা কাটত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নির্মাণের কাজে। মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিগরী স্কুলে হাতেকলমে এক বছর শিক্ষালাভের পর বার্লিন শহরে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী Helmholtz-এর অধীনে কাজ শুরু করেন। তাঁর গবেষণা জীবনের সময়সীমা ১৮৮৪ সাল থেকে ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত। ম্যাক্সওয়েলের গাণিতক সূত্রকে বাস্তবে প্রমাণ করার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তিনি সাধারণ আলো ও বৈদ্যুতিক তরঙ্গের সমধর্মিতা প্রমাণের চেষ্টা শুরু করলেন। উপলব্ধি করলেন, আলোক তরঙ্গের থেকে সৃষ্ট বিদ্যুৎ-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য কোনমতেই বড় হলে চলবে না। দরকার ছোট মাপের বৈদ্যুতিক তরঙ্গ। হার্ৎস নিজের পরীক্ষার জন্য ছোট মাপের তরঙ্গ সৃষ্টি করলেন। দৈর্ঘ্য পাঁচ মিটার। কিন্তু তা দিয়ে আলোক তরঙ্গের প্রতিফলন, প্রতিসরণ, সমাবর্তন প্রভৃতি বিষয়ের সংশয়হীন পরীক্ষা সম্ভব হলো না। মাত্র ৩৬ বছর বয়সে

বৈজ্ঞানিক হার্ৎস মারা গেলেন। কাজ থেমে রইল না। বৈজ্ঞানিক রিঘি লজ, লাম্পা, লেভেডভ, পপভ প্রমুখ বিজ্ঞানী কাজ শুরু করলেন।

১৮৯৪ সালে বৈজ্ঞানিক অলিভার লজ একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখেন। বিষয়, Heinrich Hertz and his Successors। রচনাটি পড়ে ও পত্নী অবলা বসুর ঐকান্তিক অনুপ্রেরণায় জগদীশচন্দ্র গবেষণার কাজ শুরু করলেন। এতদিন অবসর সময় কাটিয়েছেন বিচিত্র বৈজ্ঞানিক হবিচর্চার মাধ্যমে। কখনো ফটোগ্রাফি করেছেন, কখনো বা এডিসনের ফনোগ্রাফ নিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। গবেষণার শুরুতেই তিনি 'দৃশ্য আলোক তরঙ্গ ও হার্ৎস উদ্ভাবিত অদৃশ্য বিদ্যুৎতরঙ্গের সমধর্মিতা' প্রমাণ করলেন। পরীক্ষায় তিনি ব্যবহার করলেন অতি ক্ষুদ্রমাপের তরঙ্গ। যার দৈর্ঘ্য পাঁচ মিলিমিটার। সৃষ্টি হলো পৃথিবীর প্রথম "মাইক্রোওয়েভ"। তিনি তাঁর আবিষ্কারের কার্যক্ষমতা পরীক্ষা করে দেখলেন কলকাতার টাউন হলে। সেই পরীক্ষার সহজ বর্ণনা জগদীশচন্দ্রের ভাষাতেই বলি : 'অদৃশ্য আলোক ইটপাটকেল, ঘরবাড়ি ভেদ করিয়া অনায়াসেই চলিয়া যায়। সুতরাং ইহার সাহায্যে বিনা তারে সংবাদ প্রেরণ করা যাইতে পারে। ১৮৯৫ সালে কলিকাতা টাউন হলে এ সম্বন্ধে বিবিধ পরীক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলাম। বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্ণর স্যার উইলিয়ম ম্যাকেঞ্জি উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যুৎ ঊর্মি তাহার বিশাল দেহ এবং আরও দুই রুদ্ধ কক্ষ ভেদ করিয়া তৃতীয় কক্ষে নানাপ্রকার তোলপাড় করিয়াছিল।

বেতার বিদ্যুতের সমতাপাদন (polarisation), বক্রীভবন (refraction) ও পরাবর্ত্তন (reflection) ইত্যাদি নানাবিষয়ে কাজ এগিয়ে চললো। কাজের স্বীকৃতি ও প্রশংসা আসতে লাগলো নানা জায়গা থেকে। বৈজ্ঞানিক কেলভিন লিখলেন—

The University, Glasgow : April 14, 1896, Dear Mr. chunder Bose,

I thank you for your letter of March 18 and for the exceedingly interesting pamphlet describing your experimental researches in the physical laboratory of your Presidency College, which you have kindly sent me, and which I have received today. I have found time to look through it, although not yet to learn all its contents, but I have seen

enough to fill me literally with wonder and admiration, and to allow me to ask you to accept my congratulations for so much success in the difficult and novel experimental problems which you have attacked. As a slight expression of my thanks I am sending you by post along with this separate copies of a few papers of my own.

Yours truely
Kelvin.

এ সময়ে জগদীশচন্দ্রের আর একটি কাজ উল্লেখযোগ্য। ১৮৯৫ সালে রন্‌টগেন-রশ্মি আবিষ্কারের কিছুদিনের মধ্যেই নিজস্ব পদ্ধতিতে তিনি একটি X-ray যন্ত্র আবিষ্কার করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সেই সুবাদে ডাঃ নীলরতন সরকার এশিয়ার প্রথম X-ray ব্যবহারকারী ডাক্তার হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিলেন।

১৮৯৬ সালের জুলাই মাস। জগদীশচন্দ্র প্রথম বৈজ্ঞানিক সফরে ইয়োরোপ গেলেন। সাথে নিয়ে গেলেন বিদ্যুৎ-তরঙ্গ পরিমাপক যন্ত্রটি। ২১শে সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ পরিমাপক যন্ত্রটি ও তার গুণাবলীর ওপর বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতাটি বিজ্ঞানী সমাজে খুব সমাদৃত হয়। জানা যায় আচার্য পত্নীর লেখাতে। অবলা দেবীর বর্ণনা বড় হৃদয়স্পর্শী। তিনি লিখেছেন :

'বিলাতে পৌঁছিয়াই আচার্য লিভারপুলে সমাগত ব্রিটিশ এসোসিয়েশনের বৈজ্ঞানিক সম্মিলনে বক্তৃতা দিতে নিমন্ত্রিত হন। বক্তৃতার দিন হলটি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক দ্বারা পূর্ণ দেখিলাম। তাহার মধ্যে Sir J. J. Thomson Oliver Lodge ও Lord Kelvin ছিলেন। আমি বাঙ্গালীর মেয়ে সভয়ে, উপরের গ্যালারীতে অন্যান্য দর্শকবৃন্দের মধ্যে বসিলাম। এতকাল ভারতবাসী বিজ্ঞানে অক্ষম এই অপবাদ বহু কণ্ঠে বিঘোষিত হইয়াছে। আজ বাঙ্গালী এই প্রথম বিজ্ঞান-সমরে বিশ্বের সম্মুখে যুঝিতে দণ্ডায়মান। ফল কি হইবে ভাবিয়া আশঙ্কায় আমার হৃদয় কাঁপিতেছিল। হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া আসিতেছিল। তারপর যে কি হইল সে সম্বন্ধে আমার মনে স্পষ্ট কোন ছবি আজ আর নাই। তবে ঘনঘন করতালি শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম যে পরাভব স্বীকার করিতে হয় নাই বরং জয়ই হইয়াছে। দেখিলাম এক বৃদ্ধ লাঠিতে ভর করিয়া গ্যালারিতে উঠিয়া আমাকে অভিবাদন করিয়া আচার্যের আবিষ্ক্রিয়া

সম্বন্ধে বহুবিধ প্রশংসা করিলেন। জানিতে পারিলাম ইনিই অদ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক লর্ড কেলভিন। ইনি অত্যন্ত আদর করিয়া আমাদিগকে তাঁহার গ্লাসগোর ভবনে নিমন্ত্রণ করিলেন। অলিভার লজ মহাশয়ও নানারূপে আমাদের সম্বর্ধনা করিলেন। তাঁহারা দুজনেই আচার্যকে ইংলন্ডে থাকিয়া অধ্যাপক হইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষের হাওয়া ছাড়া তিনি কাজ করিতে অসমর্থ বলিয়া আচার্য তাহাদিগকে অসম্মতি জানাইলেন।"

ফেরার পথে ফ্রান্সের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বার্লিনের Physikalische Gesselschaft-এ (বিজ্ঞান পরিষদ) বক্তৃতা দেন। তাঁর বক্তৃতা সংস্থার মুখপত্রগুলিতে প্রকাশিত হয়।

সফরশেষে দেশে ফিরলেন জগদীশচন্দ্র। সঙ্গে নিয়ে এলেন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের D. Sc ডিগ্রী। ফিরেছিলেন বোম্বে হয়ে। তারপর ট্রেনে কলকাতা। সার্থক বৈজ্ঞানিক সফরকে স্বাগত জানাতে সেদিন হাওড়া স্টেশনে বহু ছাত্র সমবেত হয়। সমাবেশে মাননীয় ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন ডাঃ নীলরতন সরকার, আনন্দমোহন বসু, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডঃ পি কে রায়, অধ্যাপক হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রমুখ। এক কথায় সেদিনের সমাবেশ একটি জাতীয় অনুষ্ঠানের রূপ নিয়েছিল।

না। সেদিন সে অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন না। কয়েকদিনের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিককে অভিনন্দন জানাতে গেলেন জগদীশচন্দ্রের ১৩৯, ধর্মতলা স্ট্রীটের বাড়িতে (সে সময় জগদীশচন্দ্র এই ঠিকানায় থাকতেন)। হাতে একগুচ্ছ ম্যাগনোলিয়া ফুল। জগদীশচন্দ্র বাড়ি ছিলেন না। কিন্তু, রবীন্দ্র-জগদীশ প্রগাঢ় বন্ধুত্ব সেদিন থেকেই শুরু। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জগদীশচন্দ্রের এই প্রথম বৈজ্ঞানিক সাফল্য উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ 'বিজ্ঞানলক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিম মন্দিরে' কবিতাটি লেখেন। কবিতাটি ১৩০৪ সালের মাঘ মাসের 'প্রদীপ' পত্রিকায় ছাপা হয়। রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে 'প্রথম বন্ধুত্ব' প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে বলেছিলেন…"চলা আর পথ বাঁধা এই দুই উদ্যোগের সব্যসাচিতায় জীবন ছিল সদাই চঞ্চল। এমন সময়ে জগদীশের সঙ্গে আমার প্রথম মিলন। তিনি তখন চূড়ার উপর উঠেন নি। পূর্ব উদয়াচলের ছায়ার দিকটা থেকেই চালু চড়াই পথে যাত্রা করে চলেছেন, কীর্তি-সূর্য আপন সহস্র কিরণ দিয়ে তাঁর সফলতাকে দীপ্যমান করে তোলে নি। তখনো অনেক বাধা, অনেক সংশয়। কিন্তু নিজের শক্তি স্ফুরণের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের যে আনন্দ সে যেন যৌবনের

প্রথম প্রেমের আনন্দের মতই আগুনে ভরা, বিঘ্নের পীড়নে দুঃখের তাপে সেই আনন্দকে আরো নিবিড় করে তোলে। প্রবল সুখ দুঃখের দেবাসুরেরা মিলে অমৃতের জন্য যখন জগদীশের তরুণ শক্তিকে মন্থন করছিল সেই সময় আমি তাঁর খুব কাছে এসেছি।"

জগদীশচন্দ্র যোগ দিলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে। বাংলা গভর্ণমেণ্টের কাছে আবেদন জানালেন কিছুটা আর্থিক সুবিধার জন্য। আর্থিক অসঙ্গতি যেন গবেষণার পথে অন্তরায় না হয়। আবেদনপত্রটি আজ ঐতিহাসিক দলিলে পরিণত হয়েছে। আবেদনপত্রটিতে তদানীন্তন বৃটিশ সরকারের ভাইসরয় কাউন্সিলের ফিনান্স মেম্বারের মন্তব্য বড় অদ্ভুত। মন্তব্যের তারিখ ৭ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৭ সাল। এই মন্তব্য থেকে পরিস্কার বোঝা যায় ব্রিটিশ আমলা ও ব্রিটিশ শিক্ষাব্রতীদের মধ্যে কত তফাৎ। মন্তব্যে ফিনান্স মেম্বার লিখেছিলেন:

'He (Bose) is now drawing Rs. 500/- and it is simple nonsence on the part of a native gentleman in the service of the Government to talk, under such circumstances of "difficulty in maintaining himself on his small means". I wonder what any of the Universities in England would say to any of its staff who said, "I am a distinguished man, and you must agree to give me, on that account, more than the allowance of my offices". I think Mr. Bose has got his head to bit turned and he can wait a bit for his distinations and records.'

কিন্তু সৌভাগ্যবশত, ব্রিটিশ সরকারের হোম মেম্বার দার্শনিক J. Woodburn এ ব্যাপারে বিপরীত মন্তব্য জানিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন,······ 'Mr. Bose's distinction is not ordinary distinction, and as to the adequacy of his salary, I am personally aware that it has not been sufficient to meet the expences of his experiments and tours.'

এই পরস্পর বিরোধী মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বাৎসরিক দু'হাজার টাকা অনুদান মঞ্জুর হলো। পুরোদমে কাজ শুরু করলেন জগদীশচন্দ্র। বিদ্যুৎ-তরঙ্গ গ্রাহক যন্ত্র 'কোহেরারের' উন্নততর আবিষ্কারের কাজে হাত দিলেন।

এতদিন পর্যন্ত বিদ্যুৎ-তরঙ্গ গ্রাহক যন্ত্র হিসাবে যেসব যন্ত্রের চল ছিল

সেগুলোতে Semi Conducting Crystal ব্যবহারের প্রচলন ছিল না। প্রায় সবই ছিল প্রথম আবিষ্কৃত কোহেরার যন্ত্রের কমবেশী উন্নততর মডেল। জগদীশচন্দ্রই প্রথম Semi Conducting Crystal-কে গ্রাহকযন্ত্র হিসাবে কাজে লাগালেন। ব্যবহার করলেন 'গ্যালেনা' নামে এক ধরনের স্ফটিকের। তৈরি হলো আরও অনেক বেশী ক্ষমতাসম্পন্ন কোহেরার যন্ত্র। জগদীশচন্দ্র এর নাম দিলেন 'তেজোমিটার বা আলোক কোষ। জগদীশচন্দ্রের পক্ষে পারিবারিক বন্ধু হিসেবে সারা বুল ও নিবেদিতা যন্ত্রটির পেটেন্ট নেন।

এই আবিষ্কারের গুণাবলী ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ১৯০১ সালে তিনি বলেছিলেন, 'এই আবিষ্কার কোহেরার তড়িৎ চাঞ্চল্য, হার্জিয়ান তরঙ্গ ও অন্যান্য বিকীরণ গ্রহণ করিয়া তার প্রকাশ ও নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিখ্যাত বিজ্ঞানী ব্রুনো লাঙ্গে (Bruno Lange) 1938 সালে (Photo Elements, Reinhold, 1938, p. 39) জগদীশচন্দ্রের ১৮৯৭ সাল থেকে ১৯০১ সালের কাজের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন, 'গ্যালেনা (Lead Sulphide) টেলুরিয়াম এবং অন্যান্য খনিজ নির্দেশকের আবিষ্কার হয়েছিল সুদূর পূর্বপ্রাচ্যে কলকাতায়। আবিষ্কারক জগদীশচন্দ্র বসু। ভারতীয় পদার্থবিদ এই আবিষ্কারের উপযোগিতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ ছিলেন। তাই বসু তাঁর ফটোসেল (Tejometer) যন্ত্রটিকে একটি কৃত্রিম চোখের সঙ্গে তুলনা করেন।' জগদীশচন্দ্রের পেটেন্টের সময়সীমা 'অল্প কিছুদিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। তাছাড়া এ বিষয়ে তাঁর প্রচারও যথেষ্ট ছিল না। তাই গোটা আবিষ্কারটির আবার পুনঃ-আবিষ্কার হয় ১৯১৭ সালে।

জগদীশচন্দ্র যখন এই কোহেরার যন্ত্র নিয়ে কাজ করছিলেন তখন তিনি একটি অদ্ভুত সমস্যার সম্মুখীন হন। এই সমস্যা তাকে সে সময়ে বেশ কিছুকাল বিব্রত করেছিল। ঘটনাটি ঘটে ১৮৯৭ সালের ২৭শে ডিসেম্বর। কলকাতায় এসেছেন জগদীশচন্দ্রের প্রাক্তন অধ্যাপক বিলেতের রয়াল সোসাইটির অন্যতম সদস্য বৈজ্ঞানিক লর্ড র‍্যালে। তিনি জগদীশচন্দ্রের গবেষণা খুঁটিয়ে দেখলেন। জগদীশচন্দ্রের কাজের প্রশংসা করলেন। উৎসাহ দিলেন প্রচণ্ডভাবে। কিন্তু সেদিন বিকেলেই জগদীশচন্দ্র একটি চিঠি পেলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের প্যাডে। লিখেছেন অস্থায়ী প্রিন্সিপাল। অনেকটা চার্জ শীট গোছের। তাতে লেখা—I learn from Lord Raleigh that he visited the Presidency College this morning and inspected the Laboratory

over which he was shown by you. I should be glad to hear by what authority you have received outsiders into the Laboratory……'

প্রতিবাদ করলেন জগদীশচন্দ্র। এতে ফল হলো বিপরীত। গবেষণার কাজ রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হলো। জানা যায় ত্রিপুরার মহিমচন্দ্র দেববর্মণের 'দেশীয় রাজ্যগ্রন্থে'। তিনি লিখেছিলেন, 'একদিন রবিবাবুর তলবে জগদীশ-বাবুর গৃহে উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিলাম, প্রাইভেট কার্যে কলেজের বিজ্ঞানাগার ব্যবহার করা কর্তৃপক্ষের অভিপ্রেত নহে (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জগদীশ-চন্দ্রের গবেষণাকে কলেজ কর্তৃপক্ষব্যক্তিগত কাজ হিসেবেই চিহ্নিত করেছিলেন লেখক)। রবিবাবু ইহাতে মর্মান্তিক বেদনা অনুভব করিলেন। বিশেষতঃ, বুঝিলেন জগদীশবাবুর নিজের বিজ্ঞানাগার না হইলে তাঁহার বিজ্ঞানের নূতন তথ্য আবিষ্কারের পথ চিরতরে বন্ধ হইয়া যাইবে। পরামর্শ হইল ২০,০০০ টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে। ১০,০০০ টাকা রবিবাবু নিজের আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিবেন। বাকী টাকার জন্য ত্রিপুরার দরবারে ভিক্ষা করিতে উপস্থিত হইবেন।'

অবশ্য বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠার কথা জগদীশচন্দ্রের মনে উদয় হয় প্রথম রয়াল সোসাইটির বক্তৃতার পর, জানুয়ারি ১৮৯৭ সালে। জানা যায় অবলা বসুর বর্ণনায়। বর্ণনাটি সুন্দর। তিনি লিখেছিলেন, 'সভাপতির পার্শ্বে আমি বসিলাম, যে স্থানে ডেভি ও ফ্যারাডে বক্তৃতা দিতেন, সেই হলে ও সেই টেবিলে যখন এই তরুণ বাঙ্গালী বক্তৃতা দিতে দাঁড়াইলেন তখন আনন্দে আমার জীবন সার্থক মনে হইল। ভারতের জয় পতাকা আবার নূতন করিয়া বিশ্বের সম্মুখে তোলা হইল, মনে করিলাম। অন্যান্য সভার রীতির মতন এই সভাতে বক্তার পরিচয় দেওয়ার রীতি নাই। কারণ এখানে যিনি বক্তৃতা দেন তাঁহাকে সকলেই জানে। সুতরাং ঘড়িতে নয়টা বাজিবামাত্র আচার্য বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। এক ঘণ্টা নীরবে সকলে বক্তৃতা শুনিলেন এবং বক্তৃতা অন্তে সকলেই আচার্যকে ঘিরিয়া অভিবাদন করিলেন। Lord Raleigh বলিলেন যে এরূপ নির্ভুল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা কখনও হয় নাই,—দু'-একটি ভুল হইলেমনে হইত যেন জিনিষটা বাস্তব; এ যেন মায়াজাল। আমি যখন আচার্যের সহিত ইংলণ্ডে যাই তখন জড়পিণ্ডবৎ ছিলাম। কিন্তু এইসব লোকের সংস্পর্শে আসিয়া দেখিতে দেখিতে অনেক শিখিলাম। এই রয়াল ইন্স্টিটিউ-

র্শনের কার্যপদ্ধতি দেখিয়া তখন হইতেই আমাদের দেশে এরূপ কোন স্থান করিবার বাসনা আমার মনেও উদয় হইল এবং বসু বিজ্ঞান মন্দিরের সূচনা ও কল্পনা তখন হইতেই আরম্ভ হইল…।'



১৮৯৭ সাল। রয়্যাল ইন্‌স্‌টিটিউশনে বক্তৃতারত জগদীশচন্দ্র

জগদীশচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজের কর্মজীবনে সুস্থভাবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন কমই। কিন্তু কখনো দমে যান নি। প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর আর একটি গঠনমূলক কাজে। তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের আলাদা কোনও শিক্ষাক্রম চালু ছিল না। ছাত্রদের বিজ্ঞান পড়ান হতো ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে। তিনি, মহেন্দ্রলাল সরকার, পি. কে. রায়, নীলরতন সরকার প্রমুখের সহযোগিতায় ১৮৯৮ সালে একটি সায়েন্স ডিগ্রী কমিটি তৈরি করেন। বিশ্ববিদ্যালয় এই কমিটির সুপারিশ মেনে নিতে বাধ্য হয়। সেই সুবাদে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু হয় আজকের B.Sc. থেকে D.Sc. পর্যন্ত শিক্ষাবর্ষ।

১৮৯৮ সালের প্রথমদিকে ভারত ভ্রমণে এলেন ভগিনী নিবেদিতা ও মিসেস ওলে বুল ভারতীয় জনমানসের সাথে পরিচিত হতে। কারণ ভারতবর্ষ স্বামী

বিবেকানন্দের দেশ। কৌতূহলী হয়ে তাঁরা একদিন গেলেন জগদীশচন্দ্রের গবেষণাগার দেখতে প্রেসিডেন্সি কলেজে। জগদীশচন্দ্রের গবেষণার কাজে বাধা বিপত্তি দেখে দুঃখ পেলেন। এরপর নিবেদিতা স্বদেশ (আয়ারল্যান্ড) ছেড়ে পাকাপাকিভাবে চলে আসেন ভারতবর্ষে। নারীশিক্ষা, জনকল্যাণমূলক কাজেও স্বদেশী আন্দোলনে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেন। আচার্য পত্নী অবলাদেবীও ছিলেন আমাদের দেশে নারীশিক্ষার একজন পথিকৃত। বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর নিবেদিতার সঙ্গে বসু পরিবারের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। তিনি বসু পরিবারের বহু ভ্রমণেরও সঙ্গী হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তখনকার সমাজ ব্যবস্থায় কোনও বিদেশী মহিলার সঙ্গে মেলামেশা করার মানসিকতা সাধারণ ভারতীয় জনমানসে গড়ে ওঠেনি। ব্রাহ্ম আন্দোলনের আলোকপ্রাপ্ত বসু পরিবার সহ গুটিকয়েক পরিবার এ ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন। তাছাড়া জগদীশচন্দ্রের অসীম সঙ্কল্প ও বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ করার দৃপ্ত মানসিকতা নিবেদিতাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তাই পরবর্তী সময়ে নিবেদিতাকে দেখা যায় জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কাজে উৎসাহদাত্রী রূপে। ১৯১১ সালের অক্টোবর মাসে নিবেদিতা মারা যান দ্বারকানাথ রায়ের বাড়িতে।

১৮৯৯ সাল। বিদ্যুৎ-তরঙ্গ গ্রাহক যন্ত্রে স্ফটিক ব্যবহার করে নানা ধরনের গবেষণার কাজ এগিয়ে চললো। সেই সুবাদে তিনি আবিষ্কার করলেন আজকের যুগান্তকারী ক্রিস্টাল রেকটিফায়ার (Crystal rectifier) ও ফটো ভল্-টিক সেল (Photo Voltic cell)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জগদীশচন্দ্রের এ সময়ের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তীকালের অনেক যুগান্তকারী আবিষ্কারের বীজ এতে নিহিত ছিল।

এ সময়ই এই বিদ্যুৎ-তরঙ্গ গ্রাহক যন্ত্র সম্পর্কিত গবেষণা তাঁকে সম্পূর্ণ নূতন এক গবেষণারাজ্যে টেনে নিয়ে গেল। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "তখন তারহীন সংবাদ ধরিবার কল নির্মাণ করিয়া পরীক্ষা করিতেছিলাম। দেখিলাম; হঠাৎ কলের সাড়া কোনও অজ্ঞাত কারণে বন্ধ হইয়া গেল। মানুষের লেখাভঙ্গী হইতে তাহার শারীরিক দুর্বলতা ও ক্লান্তি যেরূপ অনুমান করা যায়, কলের সাড়ালিপিতে সেই এবইরূপ চিহ্ন দেখিলাম। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বিশ্রামের পর কলের ক্লান্তি দূর হইল এবং পুনরায় সাড়া দিতে লাগল। উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগে তাহার সাড়া দেবার শক্তি বাড়িয়া গেল এবং বিষ প্রয়োগে তাহার সাড়া একেবারে অন্তর্হিত হইল।"

আশ্চর্য উপলব্ধি। বারবার পরীক্ষা করে দেখলেন। যাচাই করলেন নিজস্ব পরীক্ষালব্ধ ফলাফল। প্যারিস শহরে অনুষ্ঠিত হবে পদার্থবিদ্যার ওপর এক আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান আলোচনাচক্র। ঠিক করলেন নিজের এই উপলব্ধির কথা জানাতে হবে বিশ্ববাসীকে। আমন্ত্রণ পত্রও এসে গেল। কিন্তু জগদীশচন্দ্রের পক্ষে আমন্ত্রিত হওয়া আর সেখানে গিয়ে বক্তৃতা দেওয়া, এই দু'য়ের প্রভেদ অনেক। জানা যায় রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিতে। ২রা মার্চ ১৯০০ সাল। জগদীশচন্দ্র লিখছেন; "গত মঙ্গলবার দিন Belvedere-এ গিয়েছিলাম। Sir J. Woodburn আমাকে অনেককাল হইতেই বিশেষ অনুগ্রহের চক্ষে দেখেন. আমার কাজের কথা শুনিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং আগামী সোমবার দিন Laboratory-তে আসিয়া experiment দেখিবেন ও আমার ছাত্রদিগের কর্ম দেখিবেন বলিয়াছিলেন। আপনারা আমার Paris Congress-এ যাওয়া উচিত বলিয়াছিলেন। তাঁহার আমার কার্যে অনুগ্রহ দেখিয়া আমি সেকথা বলিলাম, আর যে নিমন্ত্রণ পত্র আসিয়াছে সেকথা উল্লেখ করিলাম। Lt. Governor বলিলেন যে তিনি যথাসাধ্য আমাকে সাহায্য করিবেন। তবে এ বিষয় Secretary of State-এর হাত।

সপ্তাহখানেক বাদে জগদীশচন্দ্র চিঠি পেলেন D. P. I. এর। দেখতে পেলেন Sir Woodburn-এর সাথে সাক্ষাৎকারের ফল বিপরীত হয়েছে। চিঠিতে লেখা, "I am informed you had an interview with the Lt. Governor and have asked to be deputed to the Paris Exn., to attend a meeting of European Scientists. May I ask you to inform me of the reasons for making your request to His Honour.

চিঠি পেয়ে আবার রবীন্দ্রনাথকে দুঃখ করিয়া লিখলেন, "ইহার explanation কি দিতে হইবে জানিনা। আমাদের কর্মফল অনেক এবং অনেক দুরাশা আমাদিগকে পদে পদে লাঞ্ছিত করে। কতদূর মন সঙ্কীর্ণ করিতে হইবে, কতদূর কর্মক্ষেত্র সঙ্কুচিত করিতে হইবে—ইহার শেষ কোথায় ?......" Woodburn এর তাগিদে কিছুদিনের মধ্যেই প্যারিস যাওয়ার পথ অনেকটা সুগম হলো। কিন্তু D. P. I. আবার লিখলেন; The only difficulty is that there is no one who can take up your work during your absence, the College will suffer. অবশেষে D. P. I. এর অযৌক্তিক

যুক্তিতর্কের অবসান হলো। জগদীশচন্দ্র প্যারিসে গেলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এ যাত্রায় ত্রিপুরার মহারাজা তাঁর আর্থিক সাহায্যের হাত প্রসারিত করেছিলেন।

জগদীশচন্দ্র তাঁর বক্তৃতায় জড়পদার্থের সাড়াকে ভৌত রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করলেন। বক্তৃতার প্রতিক্রিয়া হলো মিশ্র। সম্ভবত, সেইদিন থেকেই শুরু। জগদীশচন্দ্র অজান্তে পা বাড়ালেন অজানা বন্ধুর পথে। তাই সেদিন সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। সুসঙ্গত সমালোচনায় মৌলিক গবেষণার কাজ দ্রুত এগিয়ে যায় সন্দেহ নেই। কিন্তু জগদীশচন্দ্রকে যে ধরণের সমালোচনার সামনে পড়তে হয়েছিল তা স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধিপ্রসূত ছিল না। কারণ জগদীশচন্দ্রের জড় পদার্থের সাড়া বিষয়ক মতবাদ ছিল ইয়োরোপীয় প্রখ্যাত বিজ্ঞানীদের মতবাদের পরিপন্থী। তাছাড়া বিজ্ঞান গবেষণার ব্যাপারে নূতন দিগন্তের কথা শুনতে হবে একজন ভারতীয়ের মুখে —এ কেমন কথা। কিন্তু প্যারিস সম্মেলনে শ্রোতা হিসেবে স্বামী বিবেকানন্দ উপস্থিত ছিলেন। তাঁর নিজস্ব প্রতিক্রিয়ার কথা তিনি লিখেছেন তাঁর 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে।

"আজ ২৩শে অক্টোবর; কাল সন্ধ্যার সময় প্যারিস হ'তে বিদায়। এ বৎসর এ প্যারিস সভ্যজগতে এক কেন্দ্র, এ বৎসব মহাপ্রদর্শনী। নানা দিগদেশ সমাগত সজ্জনসঙ্গম। দেশদেশান্তরের মণীষিগণ নিজ নিজ প্রতিভা প্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করছেন আজ এ প্যারিসে। এ মহাকেন্দ্রের ভেরীধ্বনি আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে নাদতরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বদেশকে সর্বজনসমক্ষে গৌরবান্বিত করবে। আর আমার জন্মভূমি—এ জার্মান ফরাসী ইংরেজ ইতালী প্রভৃতি বুধমণ্ডলীমণ্ডিত মহারাজধানীতে তুমি কোথায়, বঙ্গভূমি? কে তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে? সে বহু গৌরবর্ণ প্রতিভামণ্ডলীর মধ্য হ'তে এক যুবা যশস্বী বীর বঙ্গভূমির—আমাদের মাতৃভূমির নাম ঘোষণা করলেন, সে বীর জগৎপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে সি বোস। একা যুবা বাঙালী বৈদ্যুতিক আজ বিদ্যুদ্বেগে পাশ্চাত্যমণ্ডলীকে নিজের প্রতিভা মহিমায় মুগ্ধ করলেন—সে বিদ্যুৎসঞ্চার, মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবন তরঙ্গ সঞ্চার করলে। সমগ্র বৈদ্যুতিকমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ জগদীশচন্দ্র বসু—ভারতবাসী, বঙ্গবাসী, ধন্যবীর! বসুজ ও তাঁর সতীসাধবী সর্বগুণসম্পন্না গেহিনী যে দেশে যান, সেথায়ই ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেন—বাঙ্গালীর গৌরববর্ধন করেন।

ধন্য দম্পতি !

জগদীশচন্দ্র লণ্ডনে এলেন। জড় পদার্থের সাড়া বিষয়ক সমস্যাটি পদার্থবিদ হিসেবে গভীরভাবে চিন্তা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। লণ্ডনে আসার সাথে সাথেই একজন শরীরতত্ত্ববিদ বললেন 'there is nothing in common between the living and the non-living'. অন্য একজন জীবতত্ত্ববিদ জগদীশচন্দ্রের নূতন উপলব্ধির ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে বললেন 'This is magic'. জগদীশচন্দ্র ঠিক করলেন, দেখা করবেন কেমব্রিজের শরীরবিদ্যাবিশারদ স্যার মাইকেল ফস্টারের সাথে। যিনি রয়্যাল সোসাইটির সেক্রেটারিও। কিন্তু চিন্তার সাথে কাজের যথার্থ সংযোগ ঘটলো না। হবে কি করে? অসুস্থ হলেন তরুণ বিজ্ঞানী। একাকী রয়েছেন উইমেলডনের একটি বাড়িতে। বিছানায় শায়িত। সামনে জানালা। দূরে লণ্ডনের ঘোলাটে আকাশ। আকাশের পটভূমিতে একটি 'Horse chest nut' গাছ। একদিন গাছটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে জগদীশচন্দ্রের হঠাৎ মনে হল, এইতো কয়েকদিন আগে প্যারিসে দেখিয়ে এসেছেন জড় পদার্থের বৈদ্যুতিক সাড়া। তবে কেন এই গাছটির ভেতর এ ধরনের কোনো সাড়া দেখতে পাওয়া যাবে না। শরীরতত্ত্ববিদরাতো বলে থাকেন উত্তাপ, শৈত্য, বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক আঘাত ইত্যাদি প্রয়োগ করে জান্তব তন্তুর অবস্থার পরিবর্তন ঘটালে সেগুলি বৈদ্যুতিক সাড়ার মাধ্যমে তাদের জীবনের অস্তিত্ব প্রকাশ করে। প্রাণীপেশীতে উত্তেজনা ঘটালে তারা সঙ্কুচিত হয়। মৃত-পেশীতে এরকম কোনো সাড়া দেখতে পাওয়া যায় না। প্রাণী বিজ্ঞানীরাতো আরও বলেন, প্রাণীপেশীতে সবচেয়ে সূক্ষ্ম জীবন লক্ষণ হচ্ছে উত্তেজনার ফলে বৈদ্যুতিক সাড়া। মনে পড়লো কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের নিজের তৈরি প্রয়োগশালার কথা। পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখেছেন, তাঁর নিজের তৈরি 'কোহেরার যন্ত্র' বিদ্যুৎরশ্মিপাতের ফলে ঐ ধরনের বৈদ্যুতিক সাড়া দেয়। টিনের তারে মোচড় দিয়ে দেখেছেন ঐ একই ধরনের বৈদ্যুতিক সাড়া পাওয়া যায়। শুয়ে শুয়ে আরও মনে হলো, প্রাণী আর নির্বাক উদ্ভিদজগৎ ভিন্ন নিয়মে চালিত। স্পর্শকাতর দু'চারটি গাছ ছাড়া গাছের কোনো উত্তেজনায় অনুভূতি নেই—এসব ধারণা ঠিক নাও হতে পারে।

অসুস্থতার সংবাদে কলকাতা থেকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'সীজার যে নৌকা চড়েন সে নৌকা কি কখনও ডুবিতে পারে?'

উত্তরে সুস্থ হওয়ার পর জগদীশচন্দ্র অসুস্থতার বর্ণনা দেন। বর্ণনাটি সুন্দর। বর্ণনায় লিখেছিলেন, "সীজারের জাহাজ ডুবিয়া যায় নাই বলিয়া যে আমার ক্ষুদ্র ডিঙ্গি রক্ষা পাইবে একথা বিশ্বাস হয় নাই। এখন দেখিতেছি যে, ভাগ্যলক্ষ্মী আমার উপর সীজার অপেক্ষাও সুপ্রসন্ন। কারণ যখন ব্রুটাস্ সীজারের পেটে ছুরি বসাইয়া দিয়াছিলেন, তখন উক্ত সীজার অবিলম্বে পপাত চ! মমার·চ! অথচ যখন তিনজন ডাক্তার আমার উদর বিদারণ করিয়া ১॥ ঘণ্টাকাল অতি সহর্ষে বিবিধ প্রকারে অস্ত্রচালনা করিয়াছিলেন। তারপর যে আমি এ ভবধামে ফিরিয়া আসিব; ইহা কল্পনাতীত। ক্লোরোফর্মের নেশা চলিয়া গেলে, জীবনের উপর একান্ত ধিক্কার জন্মিয়াছিল এবং আহার ত্যাগ করিয়াছিলাম। তখন তোমার বন্ধুজায়া আমার সম্মুখে মাছের ঝোল ডাল ভাত রাখিতে আরম্ভ করিলেন—এমনকি বিদেশী মৎস্য দেশীরূপে কল্পিত হওয়াতে আমাকে ভ্রান্ত করিয়াছিল; তখন স্বদেশপ্রেম (আহার) জীবন অপেক্ষাও প্রিয়তর হইয়াছিল।" প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই অসুস্থ শরীরে তিনি একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। বিষয়বস্তু, ব্যবহারিক বেতার বিদ্যা ও তাঁর নব আবিস্কৃত কোহেরার যন্ত্র বিষয়ক। প্রবন্ধ পড়ে Dr. Murhead এসে দেখা করলেন জগদীশচন্দ্রের সাথে। বললেন, "এ বিষয়ের আবিস্কার গোপন রাখুন।" অন্য একটি টেলিগ্রাফ কোম্পানির মালিক বললেন; There is money in it—Let me take out patent for you. You do not know what money are you throwing away. I will only take half share in the profit—I will finance it.

এ পরিস্থিতিতে জগদীশচন্দ্রের মনের অবস্থা জানা যায় রবীন্দ্রনাথকে লেখা অন্য একটি চিঠিতে। তিনি লিখেছিলেন, এই ক্রোড়পতি আরও কিছু লাভ করিবার জন্য আমার নিকট ভিক্ষুকের ন্যায় আসিয়াছে। বন্ধু, তুমি যদি এদেশের টাকার উপর মায়া দেখিতে—টাকা—টাকা—কি ভয়ানক সর্বগ্রাসী লোভ। আমি যদি এই যাঁতাকলে একবার পড়ি তাহা হইলে উদ্ধার নাই। দেখ আমি যে কাজ লইয়া আছি তাহা বাণিজ্যের লাভালাভের উপর মনে করি।......'

কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা করলেন স্যার মাইকেল ফস্টারের সাথে। ১০ই মে ১৯০১ সালে রয়াল সোসাইটিতে বক্তৃতা দিলেন। পুরো এক ঘণ্টা। দৃপ্ত বাচনভঙ্গী যেন বিশ্ববাসীর সামনে বক্তৃতা দিচ্ছেন।

বক্তৃতা শুনে সাধুবাদ জানালেন উপস্থিত পদার্থ বিজ্ঞানীরা। এই

বক্তৃতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথকে লেখা অবলা দেবীর চিঠি উপভোগ্য। তিনি লিখেছিলেন, "১৭ই মে ১৯০১ সাল। শুক্রবার দিন যদি বক্তৃতাতে আপনি উপস্থিত হইতেন তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন আমি লজ্জা ত্যাগ করিয়া কেন আপনার নিকট উপস্থিত হইতেছি। সেদিন আমার মনে হইল আমি স্ত্রী জাতির মধ্যে এমন কি পুণ্য করিয়াছিলাম! দীনা ভারতীর বিজয়মাল্যে যে পুরুষরত্নকে শোভিত করিয়াছেন কি পুণ্যবলে আমি তাঁর সহধর্মিণী হইলাম। আমার কেবল তাহাই মনে হইতেছিল। নিজের সৌভাগ্য স্মরণ করিয়া আহ্লাদ ও বিস্ময় যুগপৎ উদয় হইতেছিল। আপনিও যদি সেই বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর মধ্যে এই ক্ষুদ্র ভারতবর্ষীয়ের নির্ভীক সত্যপ্রচার দেখিতেন তাহা হইলে স্তম্ভিত হইতেন—সেদিন আর লোকে কি বলিবে সে ভয় ছিল না। 'আমি সত্য লইয়া আসিয়াছি তোমরা শ্রবণ কর' এই ভাবই প্রকাশ হইতেছিল।

২

কয়েকদিনের মধ্যেই জগদীশচন্দ্র ব্যক্তিগতভাবে দেখা করলেন বিলেতের তদানীন্তন সর্বপ্রধান জীবতত্ত্ববিদ স্যার বার্ডন সেণ্ডারসনের সাথে। নিজের নূতন উপলব্ধির কথা তুলে ধরলেন। অনুরোধ করলেন এ বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা করার। কিন্তু ফল হলো বিপরীত। সেণ্ডারসন সাহেব খানিকটা বিরক্ত হয়ে বললেন, "জীবনতত্ত্ব সম্বন্ধে আপনি যা বলছেন, সে সম্বন্ধে আমাদের চেষ্টা আগে নিস্ফল হয়েছে; তাই আপনার কথা অসম্ভব ও অগ্রাহ্য, এশাস্ত্রে আপনার অনধিকার চর্চা হয়েছে। আপনি পদার্থ বিজ্ঞানের পথে যশস্বী হয়েছেন। আপনার সামনে সেই প্রশস্ত পথে বহু কৃতিত্ব অপেক্ষা করছে। আপনার অজানা পথ থেকে আপনি নিবৃত্ত হোন।" একটু থেমে আবার বললেন, "আমি উদ্ভিদ সম্বন্ধে সমস্ত জীবন অনুসন্ধান করেছি, কেবল লজ্জাবতী গাছ সাড়া দেয়।" তারপর অন্যান্য কয়েকজন উপস্থিত শরীরতত্ত্ব-বিদদের দিকে তাকিয়ে বললেন:

"......That ordinary plants should give electric response is simply impossible. It cannot be. Prof. Bose has applied

physiological terms in describing his physical effects on metals. Though his paper is printed yet we hope he will revise it and use physical terms and not use our physiological expressions in describing phenomena of dead matter."

উত্তরে জগদীশচন্দ্র বললেন, Scientific terms কোনো ব্যক্তিবিশেষের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। জগদীশচন্দ্রের এ কথায় শরীরতত্ত্ববিদরা চটেছিলেন ঠিকই তবে তার থেকেও তাঁরা ভয় পেয়েছিলেন বেশি। কারণ জগদীশচন্দ্রের বক্তব্য যদি একবার প্রতিষ্ঠিত হয় তবে তাঁদের প্রচারিত থিয়োরী একেবারে চূর্ণ হয়ে যাবে। জগদীশচন্দ্র জানতেন, বিজ্ঞানের জয়যাত্রার যদি কোনো মতকে চরম বলে মেনে নিয়ে থেমে থাকা যায় তবে বিজ্ঞানের অগ্রগতি কখনোই সম্ভব নয়। তাছাড়া তিনি বিশ্বাস করতেন সত্যের পথে কোনো প্রতিবন্ধকই স্থায়ী হতে পারে না। তাই তিনি বার্ডন সেন্ডারসনের সাবধানবাণীর পরিপ্রেক্ষিতে বলেছিলেন, "তখন কুমতির প্ররোচনায় বলিলাম, নিবৃত্ত হইব না। এই বন্ধুর পথই আমার। আজ হইতে সোজা পথ ছাড়িলাম। আজ যাহা প্রত্যাখ্যাত হইল তাহাই সত্য ; ইচ্ছাতেই হউক অনিচ্ছাতেই হউক তাহা সকলকে গ্রহণ করিতেই হইবে।"

কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল শরীরতত্ত্ববিদদের চক্রান্তে রয়াল সোসাইটিতে ছাপাবার জন্য দেওয়া বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেল। এদিকে জগদীশচন্দ্রের ছুটি শেষ হয়ে আসছে। দেশে ফেরা প্রয়োজন। একান্ত অসহায় পরিস্থিতি। এ অসময়ে রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি জগদীশচন্দ্রকে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। আজ তা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ৪ঠা জুন ১৯০১ সাল, তোমাকে বারম্বার মিনতি করিতেছি—অসময়ে ভারতবর্ষে আসিবার চেষ্টা করিও না। তুমি তোমার তপস্যা শেষ কর—দৈত্যের সহিত লড়াই করিয়া অশোকবন হইতে সীতা উদ্ধার তুমিই করিবে। আমি যদি কিঞ্চিৎ টাকা আহরণ করিয়া সেতু বাঁধিয়া দিতে পারি তবে আমিও ফাঁকি দিয়া স্বদেশের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিব।" এ চিঠি পাওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই সাহায্যের হাত বাড়ালেন বিলেতের লিনিয়ান সোসাইটির সভাপতি অধ্যাপক ভাইনস্। অধ্যাপক ভাইনস্ জগদীশচন্দ্রের প্রাক্তন শিক্ষকও। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি লিনিয়ান সোসাইটিতে বক্তৃতার ব্যবস্থা করলেন। ২০শে মার্চ ১৯০২ সাল। জগদীশচন্দ্র বক্তৃতা দিলেন লিনিয়ান সোসাইটিতে। বক্তৃতা শেষে অধ্যাপক ভাইনস্ উঠে দাঁড়িয়ে দর্শকমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে পর পর

তিনবার ঘোষনা করলেন, জগদীশচন্দ্রের মতবাদ ও পরীক্ষার বিষয়ে যদি উপস্থিত কোনো বৈজ্ঞানিকের মনে কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে তিনি তা করতে পারেন। না; কেউ উঠে দাঁড়ালেন না। অবশেষে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী Prof. Hartog দাঁড়িয়ে বললেন, We have nothing but admiration for this wonderful piece of work.

কিছুদিন পরের ঘটনা। ভারত সরকার অনেক চিন্তার (?) পর জগদীশচন্দ্রের ছুটি বাড়িয়েছেন। খবর এসেছে। কিন্তু সুস্থির হওয়া গেল না। এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে গেল। রয়্যাল সোসাইটির ফিজিওলজিক্যাল সোসাইটিতে রক্ষিত ও অপ্রকাশিত "উদ্ভিদের বৈদ্যুতিক সাড়া" বিষয়ক প্রবন্ধটি কিছু হেরফের করে ছাপা হলো। তবে তা জগদীশচন্দ্রের নামে নয়। লেখক Prof. Waller। এ ঘটনায় জগদীশচন্দ্র ভেঙে পড়লেন। আশ্চর্য হলেন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের নীচতা দেখে। দেখা করলেন অধ্যাপক ভাইনস্-এর সাথে। অধ্যাপক ভাইনস্ তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'There are many queer things, you have yet to learn'. এ বিষয়ে জগদীশচন্দ্র লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। চিঠিটিতে জগদীশচন্দ্রের মানসিক অবস্থাও পরিস্ফুট। "আমি কি কষ্টের ভিতর দিয়া যাইতেছি তুমি জানিবে না। তোমরা নিরাশ হইবে একথা মনে করিয়া আমি এখানে কিরূপ বাধা পাইয়াছি তাহা জানাই নাই। তুমি মনেও করিতে পার না।·· ···Royal Society-তে গত বৎসর মে মাসে 'Plant response' সম্বন্ধে লিখিয়াছিলাম, তাহা Waller ও B. Sanderson চক্রান্ত করিয়া publication বন্ধ করিয়া দিলেন।······সেই আবিষ্কার চুরি করিয়া Waller গত নভেম্বর মাসে কাগজে বাহির করিয়াছে।······এ সব কথা আর কাহাকেও বলিও না।

প্রসংগত উল্লেখ্য, অধ্যাপক ভাইনস্-এর তৎপরতায় অনেক চেষ্টার পর লেখাটি জগদীশচন্দ্রের বলে প্রমাণিত হয়। পরবর্তীকালে রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি Sir William Crookes স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে জগদীশচন্দ্রের Maida Vale-এর অস্থায়ী নিজস্ব গবেষণাগারে গিয়ে কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন "Do you know whose casting vote prevented the publication of your papers on Plant Response by the Royal Society? I am that person, I could not believe that such things were possible, and thought your oriental imagination had led

you astray. Now I fully confess that you have all along been right."

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা এতকাল জগদীশচন্দ্রের পদার্থ বিজ্ঞানের (আজকের) যুগান্তকারী আবিষ্কারকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানচর্চার অগ্রগতি হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। এর বেশী কিছু নয়। তাই অধিকাংশ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীই জগদীশ-চন্দ্রের এই নবদিগন্তের গবেষণার কাজকে বন্ধ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। এদের বিরোধিতার স্বরূপ কখনোই স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি প্রসূত ছিল না। এ সময়ে রবীন্দ্রনাথকে লেখা অন্য একটি চিঠিতেও তাঁর চরম মানসিক অবস্থার পরিচয় মেলে। তিনি লিখেছিলেন, "তুমি কি জান যে, এই বিদেশে থাকিয়া দিনরাত্রি পরিশ্রম করিয়া আমার মন কিরূপ অবসন্ন ও শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। সম্মুখে অজ্ঞাত রাজ্য, আমি একাকী পথ খুঁজিয়া ক্লান্ত—কখনও একটু আলোক পাই তাহারই সন্ধানে চলিতেছি। তোমার স্বরে আমি ক্ষীণ মাতৃস্বর শুনিতে পাই—সেই মাতৃস্বর ব্যতীত আমার আর কি উপাস্য আছে—তাঁহার বরেই আমি বল পাই—আমার আর কে আছে?"

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদের নীচতায় বিস্মিত জগদীশচন্দ্র ঠিক করলেন তাঁর মতবাদ পুস্তকাকারে প্রকাশ করবেন। উঠেপড়ে লাগলেন বই লিখতে; ১৯০০ সাল থেকে ১৯০২ এর গোড়ার কাজগুলোকে একত্রিত করে। সমাপ্তির শেষ পর্যায়ে জানালেন রবীন্দ্রনাথকে। লিখলেন, "আমার পুস্তকের শেষ প্রুফ লইয়া ব্যস্ত আছি, আর ৩/৪ সপ্তাহে পুস্তক মুদ্রিত হইবে। প্রুফ দেখিবার সময় গত দুই বৎসরের দারুণ সংগ্রামের কথা মনে হইয়া একান্ত ক্লিষ্ট হই। আমার এই দীর্ঘ যন্ত্রণার ফল যেন তোমাদের গ্রহণীয় হয়।......"

জগদীশচন্দ্রের এই প্রথম বই 'Response in the Living and Non-living' গ্রন্থটি লেখার সময় তাঁর মানসিক যন্ত্রণার পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায় তাঁর নিজস্ব দিনলিপিতে*। দিনলিপিটিতে তারিখের উল্লেখ নেই। ওপরে লেখা February 1902। তারপর লিখছেন—

My book will be soon printed though it will not be published till the middle of October. I do not know whether I shall ever write another, and I have therefore a great longing for putting a few lines in dedication :

*জগদীশ বসু ট্রাস্ট-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

"To my Countrymen
Love and Service"
or
"To my Countrymen
who will yet claim
The intellectual heritage
of their ancestors"

এই লেখার পাশে ছোট অক্ষরে লেখা To my Countrymen this work is dedicated. এরপর অনেক নীচে আবার লিখেছেন, My work is practically ended and the future is full of uncertainty and enforced in activity, but I still think that we have to keep up strength of mind in working, for the establishment of Truth.

We live by such hopes and thus lean on a rock which will endure !

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জগদীশচন্দ্র সর্বমোট চোদ্দটি বড় বই লিখেছিলেন। এর মধ্যে যে বইগুলো সে সময় জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠেছিল, সেগুলো হলো,

1. Response in the Living and Non-Living (1902)
2. Plant Response As a means of Physiological Investigation (1906)
3. Comparative Electro-physiology (1907)
4. Researches on the Irritablity of plants (1913)
5. Physiology of the Ascent of Sap (1922)
6. Physiology of Photosynthesis (1924)
7. Nervous Mechanism of Plants (1926)
8. Motor Mechanism of Plants (1928)
9. Growth and Tropic Movements of Plants (1929)
10. Plant Autographs and their Revelations.

এই বইগুলোর মধ্যে তিনটি ফরাসী ভাষায় ও দুটি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করা হয়। ১৯২৭ সালে তাঁর পদার্থবিদ্যা বিষয়ক প্রবন্ধগুলিকে একত্রিত করে Collected Physical Papers নামে প্রকাশিত হয়। বইটির ভূমিকা লেখেন

স্যার জে. জে. টমসন। ভূমিকার শেষ ছত্রে লিখেছিলেন,……Another aspect of these papers is that they mark the dawn of the revival in India, of interest-in researches in Physical Sciences; this which has been so marked a feature of the last thirty years is very largely due to the work and influence of Sir Jagadish Bose.

জগদীশচন্দ্র যখন তাঁর প্রথম বইটি লিখেছিলেন তখন দৃষ্টি ও ফটোগ্রাফী সম্পর্কে একটি কাজ করেন। জানা যায় লণ্ডন থেকে লেখা ৩০শে মে ১৯০২ তারিখের একটি চিঠিতে। তিনি রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন, "আগামী সপ্তাহে Photographic Society-তে বক্তৃতার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছি—দৃষ্টি ও ফটোগ্রাফী সম্বন্ধে বলিতে হইবে। চক্ষে যে ছায়া পড়ে তাহা মিলাইয়া যায়, কেবল তাহার প্রতিধ্বনি সুপ্ত ও জাগরিত স্মৃতিরূপে থাকিয়া যায়। কিন্তু photo-র ছবি একেবারে অপরিবর্ত্তিত রূপে মুদ্রিত হইয়া যায়। কি করিয়া সেই আণবিক আড়ষ্টতা (molecular arrest) সাধিত হয় তাহার সম্বন্ধে অতি আশ্চর্য experiment-এ সফলতা লাভ করিয়াছি।"

এই কাজ ও তাঁর প্রথম বইটির বিষয়বস্তুর ওপরে কাজের সময় জগদীশচন্দ্রের মানসিক অবস্থা আমরা রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিতে দেখেছি। কিন্তু এত মানসিক দুর্বিপাকের মধ্যেও জগদীশচন্দ্র ভেঙে পড়েননি। মন শুকিয়ে যায়নি। জানা যায় এ সময়েরই অন্য একটি প্রয়াস থেকে। তিনি এ সময়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথের লেখা কবিতা ও গল্প বিদেশে প্রচার করার চেষ্টা করেন। উল্লেখ রয়েছে জগদীশচন্দ্রের চিঠিতে। তিনি লিখেছিলেন,

"তোমার পুস্তকের জন্য আমি অনেক মতলব করিয়াছি। তোমাকে যশোমণ্ডিত দেখিতে চাই। তুমি পল্লীগ্রামে আর থাকিতে পারিবে না। তোমার লেখা তরজমা করিয়া এদেশীয় বন্ধুদিগকে শুনাইয়া থাকি, তাঁহারা অশ্রুসম্বরণ করিতে পারেন না। তবে কি করিয়া publish করিতে হইবে এখনও জানিনা। publisher-রা ফাঁকি দিতে চায়।……সে যাহা হউক তোমার ভাগে কেবল glory; লাভালাভের ভাগ্য আমার। যদি কিছু লাভ হয় তাহার অর্দ্ধেক তরজমাকারীর, আর অর্দ্ধেক কোনো সদনুষ্ঠানের।"

অন্য একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, "তুমি পল্লীগ্রামে লুক্কায়িত থাকিবে আমি তাহা হইতে দেব না।……তোমার গল্পগুলি আমি এদেশে

প্রকাশ করিব। লোকে তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে। আর ভাবিয়া দেখিও তুমি সার্বভৌমিক। এদেশের অনেকের সহিত তোমার লেখা লইয়া কথা হইয়াছিল। ......আমি মনে করি তোমার কবিতা চিরকালের জন্য।* তোমার লেখা আমাকে যেরূপ জ্বলন্ত করে সেরূপ যেন অসংখ্য লোককে করিতে পারে।"

১৯০২ সালের অক্টোবর মাসে দেশে ফিরলেন জগদীশচন্দ্র। ১লা জানুয়ারি ভারতীয় বৃটিশ সরকার তাঁকে সি. আই. ই. উপাধি দান করলো। এটি হলো জগদীশচন্দ্রের সরকারের তরফ থেকে প্রথম স্বীকৃতি। এই উপলক্ষে তখনকার বেঙ্গলী কাগজ 8. 1. 1903-এ লিখল, We note that Dr. J. C. Bose has been made a C. I. E. We are bound to say that this is a very inadequate recognition of his great service to Science. In England, nothing less than a knighthood would have been conferred on him...."

জগদীশচন্দ্রের এই উপাধি প্রাপ্তির অনুভূতি বেশ মজার। তিনি রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন, "আজ কাগজে এক সংবাদ দেখিয়া চক্ষু স্থির! আমার একটি পুচ্ছ সংযোগ হইয়াছে। এরূপ অনুগ্রহের কারণ বুঝিতে পারিতেছি না।"

কাজ শুরু করলেন জগদীশচন্দ্র। কিন্তু প্রত্যেকটি শরীরবৃত্তঘটিত পরীক্ষাকে 'ফিজিও কেমিক্যাল' সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করা হলো না। সঙ্কল্প থেকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সরে আসতেই হলো। দেখতে পেলেন উদ্ভিদ রাজ্যের অপার রহস্য জগতের সামনে তিনি দাঁড়িয়ে। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জন্ম হলো আজকের আধুনিক জীবপদার্থবিদ্যার। নূতন এক "জীবন গ্রন্থের" সূচনা করলেন পদার্থবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে। ঠিক যেভাবে "প্রায় চারশতাব্দী আগে গ্যালিলিও ল'অব মেকানিকস্ ও তাঁর গাণিতিক অভিব্যক্তি সম্পর্কে যুগান্তকারী গবেষণাশেষে ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, প্রাকৃতিক মহাগ্রন্থ গণিতের ভাষায় লেখা হয়েছে।"

বৃক্ষজগতের সীমাহীন সমস্যার মধ্যে জগদীশচন্দ্র ডুব দিলেন। উদ্ভিদের শরীরচর্চার জন্য তখন যে ধরনের যন্ত্রের চল ছিল, সেগুলোকে দরকার মত

---

* জগদীশচন্দ্র যে সময় এ উক্তি করেছিলেন তখন রবীন্দ্রনাথের বিশেষ খ্যাত ছিলেন না। কবিতার মূল্যায়নও হয়নি।

পাল্টালেন। অদলবদল করলেন। সুবিধে হলোনা। অনুভব করলেন, উদ্ভিদ সম্পর্কে সঠিক কিছু জানতে গেলে দরকার সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি। উপযুক্ত যন্ত্র তৈরির অক্ষমতাই উদ্ভিদ সম্পর্কে মনগড়া মতবাদের সৃষ্টি করতে প্ররোচিত করেছে। সামান্য উপকরণকে কাজে লাগিয়ে সূক্ষ্ম কাজের উপযোগী অথচ সরল যন্ত্র নির্মাণে তিনি ছিলেন বিরল প্রতিভার অধিকারী। সে সময় আচার্যদেবের অর্থবল ছিল না। ছিল না উপযুক্ত যন্ত্রাগার ও যন্ত্রী। যা অসম্ভব তা সম্ভব করেছিলেন নিজস্ব একটি বিশ্বাস ও সহজাত বিরল উদ্ভাবনী শক্তিকে কেন্দ্র করে। মালেক, পুঁটিরাম, বারিক, জামশেদ ও রজনীকান্তের মত আরো কয়েক-জন "অল্পশিক্ষিত" কারিগরকে শিখিয়ে নিয়ে তাদের দিয়ে যে বিরাট কিছু করা যায়—এ বিশ্বাসের কারণ জানতে গেলে আমাদের আবার ফিরে যেতে হবে সেই ১৮৯৭ সালের গোড়ায়। প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রয়োগশালায় বসে কাজ করেছেন জগদীশচন্দ্র। হঠাৎ একটি লোক ঢুকল ঘরে। জীর্ণ বেশবাস। মাসদুয়েক আগে লোকটি বেয়ারারের কাজ করতো কলেজে। অপদার্থতার অভিযোগে চাকুরীটি খুইয়েছে। নাম নানক মাম। পুনরায় কর্মপ্রার্থী, শীর্ণ মুখমণ্ডলের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে আবার কাজে বহাল করলেন জগদীশচন্দ্র অবশ্যই অধ্যক্ষের অনুমতি নিয়ে। বছর দুই বাদে একদিন জগদীশচন্দ্রের Dynamo Electric যন্ত্র খারাপ হলো। গবেষণার প্রয়োজনে দরকার তখুনি যন্ত্রটিকে সারানো। দেখা গেল ভারপ্রাপ্ত বৃটিশ ইঞ্জিনীয়ার হঠাৎ মারা গেছেন। চিন্তাগ্রস্ত জগদীশচন্দ্র বসে আছেন নিজস্ব কামরায়। দরজা ঠেলে ঢুকল সেই নানক মাম। দৃঢ়তার সাথে যন্ত্রটি সারাবার অনুমতি চাইল। বলিষ্ঠ বাচন-ভঙ্গিতে বিস্মিত দ্বিধাগ্রস্ত জগদীশচন্দ্র অনুমতি দিলেন। মাত্র ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ঠিক হয়ে গেল জটিল যন্ত্রটি। মুগ্ধ জগদীশচন্দ্র মানুষের কর্মক্ষমতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলেন।

পরবর্তীকালে নিজের যন্ত্রনির্মাণের কথা বলতে গিয়ে জগদীশচন্দ্র বলেছিলেন, As regards construction of apparatus by Indian machanicians, it seemed to me that the race, which by the subtle dexterity of their hands wrought wonders in the past, could not altogether be extinct. It was only necessary for me to take my craftsmen into my confidence and fire them with enthusiasm and to hold before them the marvel to be

achieved. All these instruments have been constructed in my workshop.

উদ্ভিদ গবেষণার শুরুতে প্রথমে ফটোগ্রাফি ও অপটিক্যাল লিভার ব্যবস্থায় কিছু পরীক্ষা ও নিরীক্ষা চালালেন। কিন্তু দেখলেন এ ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। চাই আরও নিখুঁত যন্ত্র। প্রয়োজনের সাথে তালে তাল রেখে যন্ত্রের ক্রমবিকাশ শুরু হলো দ্রুতলয়ে। তৈরি হতে লাগল একের পর এক স্বয়ংলেখ যন্ত্র। দামী যন্ত্রাংশ দিয়ে নয়, সামান্য উপকরণকে কাজে লাগিয়ে সম্পূর্ণ যান্ত্রিক উপায়ে ঘড়িকলের সাহায্যে। যন্ত্রগুলো গাছকে সুন্দরভাবে কথা বলাতে সক্ষম হলো। যন্ত্রগুলোর গঠনপ্রণালী আজকের দিনেও বিস্ময়।

উদ্ভিদ আর প্রাণীর সাড়ার মধ্যে কতটা মিল আছে, এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই তাঁর উদ্ভিদরাজ্যে প্রবেশ। এজন্য উদ্ভিদ তাত্ত্বিক গবেষণার শুরুতেই স্পর্শকাতর গাছগুলোই তাঁর কাছে প্রথমদিকে প্রাধান্য পেল। সেই উপযোগী যন্ত্রও। উত্তেজনায় গাছ কিরকম সঙ্কুচিত হয় তা মাপার জন্য "কুঞ্চন গ্রাফ" যন্ত্র আবিষ্কার করেন।

বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের নাম সাধারণত গ্রীক বা ল্যাটিন শব্দ থেকে বেছে নেওয়ার রীতি। কিন্তু জগদীশচন্দ্র যন্ত্রের নামকরণ করেছিলেন মাতৃভাষায়। পরে অবশ্য বাধ্য হয়েই পরবর্তী যন্ত্রগুলোর নামকরণ করেছিলেন ইংরেজী বা ল্যাটিনে। এ বিষয়ে জগদীশচন্দ্রের বর্ণনা উপভোগ্য। 'ক্রেস্কোগ্রাফ' যন্ত্রের নামকরণ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, ইচ্ছা ছিল কলের নাম 'ক্রেস্কোগ্রাফ' না রাখিয়া 'বৃদ্ধিমান' রাখি, কিন্তু হইয়া উঠিল না। আমি প্রথম প্রথম আমার নূতন কল গুলির সংস্কৃত নাম দিয়াছিলাম ; যেমন 'কুঞ্চনমান' এবং 'শোষণমান'। স্বদেশী প্রচার করিতে যাইয়া অতিশয় বিপন্ন হইতে হইয়াছে। প্রথমত, এই সকল নাম কিম্ভূতকিমাকার হইয়াছে বলিয়া বিলাতি কাগজ উপহাস করিলেন। কেবল বোস্টনের প্রধান পত্রিকা অনেকদিন আমার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। সম্পাদক লেখেন; "যে আবিষ্কার করে, তাহারই নামকরণের প্রথম অধিকার। তাহার পর নূতন কলের নাম পুরাতন ভাষা ল্যাটিন ও গ্রীক হইতেই হইয়া থাকে। তাহা যদি হয় তবে অতি পুরাতন অথচ জীবন্ত সংস্কৃত হইতে কেন হইবে না?" বলপূর্বক যেন নাম চালাইলাম। কিন্তু ফল হইল অন্যরূপ। গতবারে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতার সময় তথাকার বিখ্যাত অধ্যাপক আমার কল 'কাঞ্চনম্যান' সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

প্রথমে বুঝিতে পারি নাই। শেষে বুঝিলাম 'কুঞ্চনমান' 'কাঞ্চনম্যানে রূপান্তরিত হইয়াছে। হাণ্টার সাহেবের প্রণালী মতে কুঞ্চন বানান করিয়াছিলাম, হইয়া উঠিল কাঞ্চন। রোমক অক্ষরমালার বিশেষ গুণ এই যে, ইহার কোনো একটা স্বরকে অ হইতে ঔ পর্যন্ত যথেচ্ছরূপে উচ্চারণ করা হইতে পারে; কেবল হয় না ঋ ও ৯। তাহাও উপরে কিম্বা নীচে দুই একটা ফোঁটা দিলে হইতে পারে। সে যাহা হউক, বুঝিতে পারিলাম—হিরণ্যকশিপুকে দিয়া বরং হরিনাম উচ্চারণ করানো যাইতে পারে, কিন্তু ইংরেজকে বাংলা কিম্বা সংস্কৃত বলানো একেবারেই অসম্ভব। এ জন্যই আমাদের হরিকে হ্যারী হইতে হয়। এই সকল দেখিয়া কলের 'বৃদ্ধিমান নামাকরণের ইচ্ছা একেবারেই চলিয়া গিয়াছে' বৃদ্ধিমান—হইতে বারম্রোয়ান হইত। তার চেয়ে বরং 'ক্রেস্কোগ্রাফ'ই ভালো।"

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জগদীশচন্দ্রের এই স্বদেশীয়ান থাকা সত্ত্বেও পরবর্তীকালে তাঁকে নিজের দেশেই অদ্ভুত এক সমালোচনার সামনে পড়তে হয়েছিল। এক ধরনের দেশীয় স্বার্থান্বেষী ও ঈর্ষাপরায়ণ লোক ইংরেজীতে প্রশ্ন তুলেছিলেন, "Why then, does not Sir Jagadish, publish his original articles in Bengali? It will enrich the Bengali scientific literature, which now presents a poor picture and raise the status of the Bengali language in the estimation of the civilized world. And who knows, there may flock in Bengali, thousands of devotees from the remotest corner of the earth to learn the Bengali language, only to read the valuable researches published in that language?"

আশ্চর্য ব্যাপার। জগদীশচন্দ্র সেদিন উত্তর দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। বলেছিলেন, "ইংরেজী ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আমার যাহা কিছু আবিষ্কার সম্প্রতি বিদেশে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, তাহা সর্বাগ্রে মাতৃভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তাহার প্রমাণার্থ পরীক্ষা এদেশে সাধারণ সমক্ষে প্রদর্শিত হইয়াছিল। কিন্তু আমার একান্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ এদেশের সুধী শ্রেষ্ঠদিগের নিকট তাহা বহুদিন প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। আমাদের স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ও বিদেশের হলমার্কা না দেখিতে পাইলে কোনো সত্যের মূল্য সম্বন্ধে একান্ত সন্দিহান হইয়া থাকেন। বাংলাদেশে আবিষ্কৃত, বাংলা ভাষায় লিখিত তত্ত্বগুলি যখন

বাংলার পণ্ডিতদিগের নিকট উপেক্ষিত হইয়াছিল তখন বিদেশী ডুবুরীগণ এদেশে আসিয়া যে নদীগর্ভে পরিত্যক্ত আবর্জনার মধ্যে রত্ন উদ্ধার করিতে প্রয়াসী হইবেন, ইহা দুরাশামাত্র।"

আজকের দিনের বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল প্রচারের পথ মোটামুটি ভাবে যথাযথ নিয়মে বাঁধা। কিন্তু জগদীশচন্দ্রের পক্ষে তা ছিল অন্যরকম। বৈজ্ঞানিক মতকে স্থায়ীরূপ দিতে বারদশেক তাঁকে বিদেশে যাত্রা করতে হয়েছিল। জাহাজে, কখনও বা স্থলপথে। সেই সুদূর ইয়োরোপে। সাথে থাকতো পরীক্ষার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও পরীক্ষার উপযোগী গাছপালা। এককথায়, দেশের পরাধীনতা ও চাপিয়ে দেওয়া অনুন্নত অবস্থা থেকে তৈরী বাধা বিপত্তির বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রাম ছিল জগদীশচন্দ্রের সমস্ত জীবন। উদ্ভিদতত্ত্ব বিষয়ে জগদীশচন্দ্রের গবেষণার সময়সীমা তেত্রিশ বছর। সেই সূত্রে শতাধিক আশ্চর্য যন্ত্র তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। তাই এবার আমরা তাঁর এই বৃহৎ কর্মকাণ্ডের মুখ্য আবিষ্কার ও ঘটনাকে এ পর্যায়ে অনুসরণ করবো।

উদ্ভিদ গবেষণায় প্রথম সার্থক ও সাড়া জাগানো যন্ত্র "রেজোনাণ্ট রেকর্ডার" (Resonant Recorder)। প্রাণীদেহের মত উদ্ভিদের ভেতরেও যে "রিফ্লেক্স আর্কের" অস্তিত্ব রয়েছে তা এই যন্ত্র দিয়ে দেখা যায়। এই পরীক্ষার জন্য তিনি বেছে নেন লজ্জাবতী লতা (mimosa pudica)। লজ্জাবতীর একটি উপপত্রে বৈদ্যুতিক বা যান্ত্রিক আঘাত দিয়ে দেখলেন আঘাতের স্থান থেকে লজ্জাবতীর ছোট ছোট পাতা বন্ধ হতে হতে পত্রমূল পর্যন্ত যায়। তখন বাকি উপপত্রগুলিতে কোন সাড়া দেখতে পাওয়া যায় না। আঘাত পত্রমূলে পেঁছে বিপরীতমুখী হয়ে ফিরে আসে অন্যান্য পাতায়। তখন বাকি পাতা বন্ধ হয়। উদ্ভাবিত যন্ত্রের কার্যক্ষমতা বড় অদ্ভুত। উত্তেজনার গতিবেগের এক সেকেণ্ডের দু'শো ভাগের একভাগ সময়ের তারতম্য থাকলেও তা এই যন্ত্র জানিয়ে দেয়। জগদীশচন্দ্র পরীক্ষায় প্রমাণ করে দেখালেন, লজ্জাবতী পাতায় উত্তেজনা দিলে উত্তেজনার গতিবেগ এক সেকেণ্ডে চারশ মিলিমিটার পর্যন্ত হতে পারে। আরও নানা পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করে দেখালেন, উদ্ভিদদেহে উত্তেজনা পরিবহনের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ স্নায়ুধর্মী। উপসংহারে এলেন প্রাণীর স্নায়ুতে যে বিশেষত্ব আছে উদ্ভিদ কাণ্ডেও তা বর্তমান। এ বিষয়ে জগদীশচন্দ্রের পূর্ববর্তী বিজ্ঞানী অধ্যাপক ফেফার (Prof. Wilhelm Pfeffer) ও ডঃ হ্যাবারল্যাণ্ডের (Dr. Gottlieb

Haberlandt) বক্তব্য অন্যরকম ছিল। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, প্রাণীদেহের মত উদ্ভিদের ভেতরে স্নায়বিক উত্তেজনা সংক্রান্ত কোন ব্যাপার নেই। আর লজ্জাবতী লতার সাড়ার ক্ষেত্রে বলতেন, একটি পাতায় আঘাত দিলে ক্রমশ অন্য পাতা বন্ধ হয় কারণ আঘাতে উদ্ভিদদেহে জলপ্রবাহ উৎপন্ন হয়। তাই জলপ্রবাহের ধাক্কায় পাতা বন্ধ হয় ও পত্রমূল নীচের দিকে নামে।

জগদীশচন্দ্রের "রেজোনান্ট রেকডার" ও ঐ বিষয়ের গবেষণা সম্পর্কে Waldemar Kaempffert তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ "What Plants Feel"এ বলেছিলেন, Researches that Dr. Bose conducted on nervous impulse are of immense importance to humanity. Prof. Wilhelm Pfeffer, of the University of Leipzig, the Nestor of European plant physiologists, had decided some years ago that mimosa was nerveless.······Pfeffer's dictum in these matters is almost final. Dr. Gottlieb Haberlandt, a distinguished Professor of Botany of the Berlin Botanical Gardens, a Scientist of commanding position, came to the same conclusion······ Pfeffer and Haberlandt are wrong······ Dr. Bose found that when a Mimosa was in the best condition an excitation was transmitted with a velocity of thirty millimeters (1·18 feet) a Second.

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই গবেষণার সূত্র ধরেই পরবর্তীকালে জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদের বিদ্যুৎ সক্রিয় স্তর খুঁজে বার করার জন্য 'ইলেকট্রিক প্রোব' (Electric probe) একটি যন্ত্র আবিস্কার করেন। অন্য আর একটি পরীক্ষায় তিনি তুলনামূলকভাবে দেখিয়েছিলেন, প্রাণীদেহের সম্ভাব্য বিচ্ছিন্ন স্নায়ুতন্তের গুণাবলী ও উদ্ভিদের বিচ্ছিন্ন "ভাস্কুলার স্ট্রান্ডের" গুণাবলী এক।

গাছটির নাম বনচাঁড়াল। শুদ্ধ বাংলায় বনচণ্ডাল। ইংরেজীতে Desmodium gyrans বা Indian Telegraphic plant. এর কাণ্ডের প্রতি পর্বে তিনটি করে পাতা থাকে। মাঝের পাতাটি বড় আর দু'পাশে দুটি ছোট পাতা। যেন দুটি হাত। এই ছোট পাতা দুটি সদাই কর্মচঞ্চল। অনেকটা যেন রাস্তার মোড়ের ট্রাফিক-পুলিশের মত। একবার পাতা দুটি

উপরে ওঠে আর একবার নিচের দিকে নামে। বনচাঁড়ালের এই স্বতঃস্পন্দন আপাত কোন কারণ ছাড়াই খালি চোখে দেখতে পাওয়া যায়। এই অদ্ভুত চলনের জন্য বিজ্ঞানীদের মনে গাছটি সম্পর্কে জানার কৌতুহল জেগেছিল সেই প্রাচীনকাল থেকেই। এই গাছ ও তার পাতার চলন সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা বেশ মজার। গ্রামবাংলার "গুণীনরা" এই স্পন্দনশীল পাতাগুলি "বশীকরণের" কাজে ব্যবহার করতেন। তাদের ধারণা ছিল কোন বিশেষ দিনে কোন বিশেষ সময়ে পাতাদুটি স্পন্দিত হওয়ার সময় যখন উপরের দিকে ওঠে তখন এক নিশ্বাসে পাতাদুটি কেটে কোন খাওয়ার জিনিসের সাথে কাউকে খাইয়ে দিলে তাকে "বশ" করা যায়। গ্রামের রাখাল ছেলেদের ধারণা ছিল, হাতের তুড়ি দিলেই পাতাদুটি নাচ শুরু করে। এতো গেল আমাদের দেশের কথা। বিদেশেও নানা ধরনের ব্যাখ্যা শোনা যেত। শোনা যায় ইংলন্ডের রাণী নাকি একবার পুরস্কারও ঘোষণা করেছিলেন গাছটির সম্পর্কে আরও খোঁজখবর পাওয়ার আশায়।

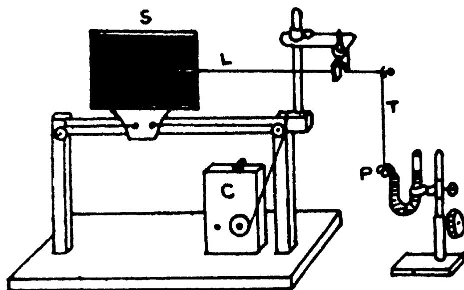


বনচাঁড়ালের পাতা

আচার্য জগদীশচন্দ্রের আগে যে সব বিজ্ঞানী এই স্পন্দনের গতিপ্রকৃতি নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন, তাঁরা কেউই কৃতকার্য হননি। অন্তরায় ছিল সঠিক সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আবিষ্কারের অক্ষমতা। সেই অক্ষমতাই হয়তো গাছটিকে সেকালে রহস্যময় করে তুলেছিল সাধারণ মানুষের কাছে। সমস্যা সমাধানে অনেক পরিশ্রমের পর জগদীশচন্দ্র আবিষ্কার করলেন "প্লান্ট ফাইটোগ্রাফ" (Plant Phytograph) যন্ত্র।

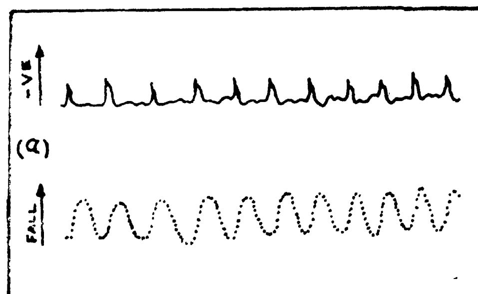
অনেক উন্নতমানের। অনেক সূক্ষ্ম। গাছের পরীক্ষাধীন পাতাটিকে রাখলেন একটি জলভর্তি কাচের "U" টিউবে। একটি সিল্কের সরু সুতো

দিয়ে যুক্ত করলেন একটি কাচের তৈরী জুয়েলের উপরে বসানো লিভারের সাথে। এই লিভারটিকেই তিনি লেখনী হিসেবে কাজে লাগালেন। এবার



Plant Phytograph যন্ত্র
P পাতা, T সিল্কের সুতো, L কাচের লিভার, C ঘড়িকল ও S কাচের প্লেট।

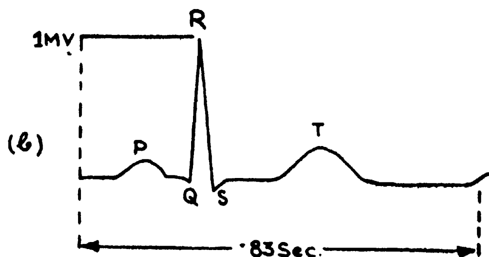
লেখবার জন্য ভুষোমাখানো একটি কাচের প্লেটের সংযোজন ঘটালেন সুন্দর ভাবে। ভুষোমাখানো প্লেটটিকে ঘড়িকলের সাহায্যে প্রতি চার সেকেণ্ড অন্তর নিজে থেকে সামনের দিকে এগিয়ে এসে লিভারের মুখ থেকে একটি ছোঁয়া নিয়ে



(1) বনচাঁড়াল গাছের বৈদ্যুতিক লিপি
(2) পাতার চলন

পিছিয়ে যাবার ব্যবস্থা করলেন। সেই সাথে একই যান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্লেটটিকে ধীরে ধীরে বাঁ দিক থেকে ডান দিকে চালনা করলেন। এ ব্যবস্থা হলো নিখুঁত। ঘর্ষণজনিত ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা খুবই কমে গেল। লিভার ব্যবস্থায় ছয়গুণ বড়

করে তরঙ্গলিপি নিলেন জগদীশচন্দ্র। আশ্চর্য সে তরঙ্গলিপি। উনি তুলনা করলেন প্রাণীদেহের হৃদস্পন্দন লিপির সাথে। মিল রয়েছে যথেষ্ট। তাপের তারতম্য ঘটালেন। দেখলেন প্রাণীর স্পন্দনের মতই বনচাঁড়ালের স্পন্দন বেড়ে



মানুষের হৃদস্পন্দন লিপি

গেল। পিলোকার্পিন, আট্রোপিন, ব্রোমাইড প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করে বিভিন্ন বাস্তবধর্মী পরীক্ষা চালালেন। প্রতিক্রিয়া সবই হলো প্রাণী-হৃদপিণ্ডের উপর প্রয়োগের অনুরূপ।

এসব পরীক্ষার ফলাফল জগদীশচন্দ্রকে আরও গভীরে টেনে নিয়ে গেল। গ্যালভানোমিটারকে দরকার মত পাল্টে কাজ আরম্ভ করলেন। দেখলেন প্রাণীর মত বৈদ্যুতিক সাড়ার অস্তিত্ব রয়েছে এতে। মিল রয়েছে ছোট পাতাদুটির চলনের সাথে। তুলনামূলক পরীক্ষা করলেন ব্যাঙের হৃদপিণ্ডের স্পন্দনের সাথে। রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগের ফলও উভয়ের মূলগত সাদৃশ্যকেই ইঙ্গিত করলো। উপসংহারে এলেন জগদীশচন্দ্র। বললেন, "এই তথাকথিত স্বতঃ-স্পন্দনের ব্যাপারটি আপনা থেকেই ঘটে না, পূর্বলব্ধ বহিরাগত উত্তেজনার ফল স্বরূপই সেটা প্রকাশ পায়।" আরও বললেন, প্রাণীর হৃদপিণ্ডের স্পন্দনের সঞ্চালনকে অনুসরণ করে ঠিক যেভাবে 'ইলেকট্রিক রেস্‌পনস্‌' চলতে থাকে, বনচাঁড়ালের স্পন্দনের সাথেও একই ধরনের স্পন্দন চলতে থাকে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জগদীশচন্দ্রের মৃত্যুর প্রায় ত্রিশ বছর পরে ষাটের দশকে প্রয়াত বিজ্ঞানী অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন বসু, বিনয়কৃষ্ণ দত্ত ও আশুতোষ গুহ ঠাকুরতা বসুবিজ্ঞান মন্দিরে জগদীশচন্দ্রের এই ফাইটোগ্রাফ যন্ত্রের সাথে 'ইলকট্রনিক' যন্ত্রের সংযোগ ঘটিয়ে বনচাঁড়াল গাছের বৈদ্যুতিক লিপি নিয়ে পরীক্ষা করেন। প্রাপ্ত লিপি যেন মানুষের হৃদপিণ্ডের বৈদ্যুতিক সাড়ার

প্রতিচ্ছবি। পার্থক্য যেটুকু আছে তা'হলো শুধু সময়ের। এরা আরও একটি মজার পরীক্ষা করেছিলেন। বনচাঁড়াল গাছের কচি পাতাগুলি সারাদিন স্পন্দনের পর রাত্রিবেলা থেমে থাকে; কিন্তু পরিণত পাতাগুলির স্পন্দন চলতে থাকে অবিরাম। পরীক্ষাধীন কচি বনচাঁড়ালের পাতার ওপর 'গ্লুকোজ' প্রয়োগ করলেন। দেখা গেল কচি পাতাটি পরিণত পাতাগুলির মতই স্পন্দিত হচ্ছে সারাদিন সারারাত। এবার 'গ্লুকোজের' পরিবর্তে আবার জল দেওয়া হলো। ফলে দেখা গেল পরীক্ষাধীন পাতাটি আবার আগের মত রাত্রিতে থেমে থাকছে। কারণ হিসেবে জানা গেল, কচি পাতার মধ্যে "ক্লোরোফিলের ভাগ" অল্প থাকায় উপযুক্ত পরিমান 'কার্বোহাইড্রেট' জমা হতে পারে না। তাই কচি পাতাগুলি রাত্রিতে থেমে থাকে।

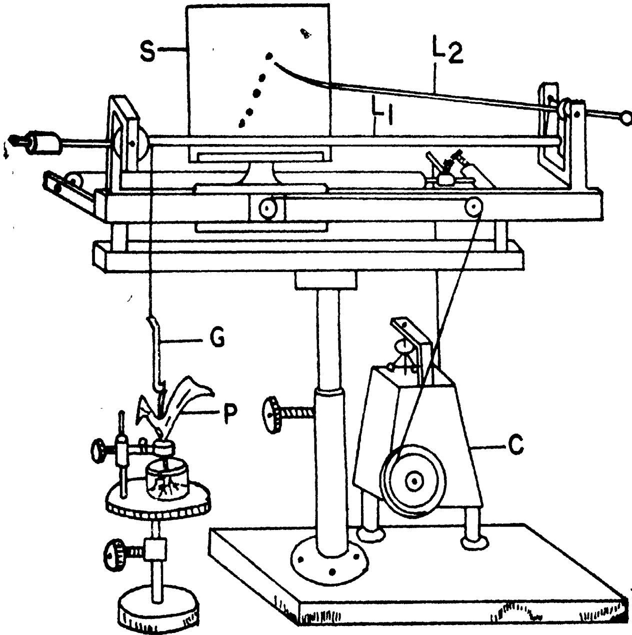
জগদীশচন্দ্র দেখলেন, এই যন্ত্রদিয়ে এক ঘণ্টার বেশী ধারাবাহিক তরঙ্গলিপি নেওয়ার উপায় নেই। যন্ত্রাংশের কিছু অদল বদল করে নূতন একটি উন্নততর যন্ত্র আবিষ্কার করলেন। নাম দিলেন Diurnal Phytograph। এই যন্ত্রে ধারাবাহিক তরঙ্গলিপি নেওয়ার সময়সীমা বেড়ে হলো পুরো চব্বিশ ঘণ্টা। তাছাড়া Temparature রেকর্ড করারও একটা ব্যবস্থা করলেন, অন্য একটি লিভারের সাহায্যে। পরবর্তীকালে এই যন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে উদ্ভিদ চর্চার আরও অনেক নূতন দুরূহ তথ্য আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল।

উদ্ভিদের জল শোষণ প্রক্রিয়া জীবনধর্মী ও জীবন্ত কোষের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। একথা ছিল তখনকার বিজ্ঞানীদের মতবাদের পরিপন্থী। তখনকার প্রচলিত ধারণাগুলি ছিল গোষ্ঠীগত ও দ্বিধা বিভক্ত। কোন গোষ্ঠী বিশ্বাস করতেন জল শোষণ ও জলের ঊর্ধ্বগতির কারণ গাছের শেকড়ের চাপ। কেউবা বলতেন, বায়ুর চাপের ওপর জল শোষণ নির্ভর করে। আবার অনেকের ধারণা ছিল বাতাসে পাতার সঞ্চিত জল শুকিয়ে গেলে শেকড়ের দিক থেকে জল এসে ঘাটতি পূরণ করে। সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে জগদীশচন্দ্র তাঁর 'ফাইটোগ্রাফ' যন্ত্রকে কাজে লাগালেন। পরীক্ষা করে দেখালেন উদ্ভিদের জলশোষণ পুরোপুরিভাবে উদ্ভিদের জীবন্তকোষের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। পরীক্ষার পরবর্তী ধাপ হিসেবে তিনি 'পটোগ্রাফ' নামে একটি সূক্ষ্ম যন্ত্র আবিষ্কার করলেন। যন্ত্রটির সাহায্যে উদ্ভিদের জলশোষণের গতি ও পরিমাণ লিপিবদ্ধ করলেন। অন্য একটি পরীক্ষায় দেখালেন, জলশোষণের গতিবেগ তাপমাত্রার হেরফেরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে হয়ে থাকে। কম মাত্রায়

উত্তেজক পদার্থ প্রয়োগে শোষণের হার বাড়ে ও মাত্রা বেশী হলে বিপরীত ফল দেখা যায়।

গাছের বৃদ্ধি অনেকগুলি শর্তের ওপর নির্ভরশীল; বৃদ্ধির হারও খুব কম। গাছের বৃদ্ধি সম্পর্কে প্রচলিত প্রবাদ হলো, The movement of plants' growth is two thousand times less rapid than the pace of the proverbially slow footed snail. Taking the average annual growth in height of a tree to be 5 ft. it will take a tree a thousand years to cover a distance of a mile. সাধারণ গাছের বৃদ্ধির মোটামুটি গাণিতিক হিসেব এক ইঞ্চি জায়গাকে যদি এক লক্ষ টুকরো করা যায় তার একভাগ হলো একটি গাছের এক সেকেণ্ডের বৃদ্ধি। পারিপার্শ্বিক অবস্থা যথাযথ না থাকলে গাছের বৃদ্ধি সঠিকভাবে ধরা কখনোই সম্ভব নয়। জগদীশচন্দ্রের আগে যে সব যন্ত্রের চলছিল তা দিয়ে কয়েকঘণ্টা অপেক্ষা না করলে বৃদ্ধির কোন হিসেব পাওয়া সম্ভব ছিল না। যা পাওয়া যেত তাও যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ, প্রচলিত যন্ত্রগুলোর প্রসারণ ক্ষমতাও কুড়ির অধিক ছিলনা। তাছাড়া বিভিন্ন বৃদ্ধিকারক ওষুধ প্রয়োগের ফলাফল দেখার সুষ্ঠু কোন ব্যবস্থা ছিল না বললেই চলে। অথচ কৃষিকার্যে গাছের বৃদ্ধি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে জগদীশচন্দ্র সমস্যাটি হাতে নিলেন। উপলব্ধি করলেন, গাছের বৃদ্ধির সঠিক হার, বিভিন্ন উত্তেজক পদার্থ বা সার প্রয়োগে গাছের প্রতিক্রিয়া জানতে গেলে দরকার পরীক্ষার সময়কাল সীমিত করা আর বর্ধিত আকারে বৃদ্ধির তরুলিপি নেওয়া। এসব কথা মনে রেখে জগদীশচন্দ্র একটি গাছ এক সেকেণ্ডে যতটা বাড়ে তার দশ হাজার গুণ বড় করে বৃদ্ধির হার রেকর্ড করলেন। প্রথমে microscopic optical projection উপায়ে। কিন্তু এতে অসুবিধে দেখা দিল। পরীক্ষাধীন গাছের তরুলিপি চাহিদা অনুযায়ী হলো না। সমস্যা সমাধানে তৈরী করলেন অন্য আর একটি বৃদ্ধি মাপার যন্ত্র। এ ব্যবস্থায় গাছের বৃদ্ধি লেখা হবে ঘূর্ণায়মান ড্রামে, ফটো তোলার কাগজে। না। এতেও মুশকিল হলো। কারণ অন্ধকার ঘর দরকার। গাছের বৃদ্ধির সাথে তালে তাল মিলিয়ে তখনি খালিচোখে দেখা যাবেনা তরুলিপি। কেটে গেল বেশ কয়েকটি বছর। সমস্যাটি হাতে নিয়েছিলেন ১৯০৬ সালে। অনেক চেষ্টার পর তৈরী হল চাহিদা-মাফিক যন্ত্র। Compound Lever Crescograph। ১৯১৩ সালের শেষভাগে।

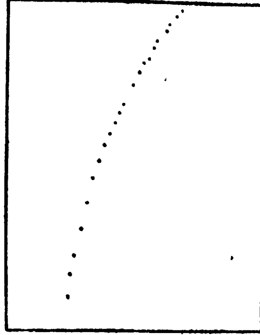
এই যন্ত্রের গঠন প্রণালী বিস্ময়কর। উপকরণ খুবই সাধারণ। যন্ত্রটিতে দুটি লিভার রয়েছে। প্রথমটি অ্যালুমিনিয়ামের, দ্বিতীয়টি খুব সরু কাচের। প্রথম লিভারের গোড়ায় যে গাছটির বৃদ্ধি মাপা হবে সেই গাছটি



Compound Lever Crescograph

খুব সরু কাচের link দিয়ে লাগানোর ব্যবস্থা আছে। প্রথম লিভারটির সামনের দিকের সাথে দ্বিতীয় লিভারটির গোড়ায় খুব সরু সুতো দিয়ে বাঁধা। দু'টো লিভারেরই প্রসারণ ক্ষমতা একশ। ফলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি আসল বৃদ্ধি থেকে দশ হাজার (১০০ × ১০০) গুণ বড় করে দেখায়। তরুলিপি নেওয়ার জন্য একটি ভুষোমাখানো কাচের প্লেট আছে। বৃদ্ধির লিপি নেওয়ার সময় ভুষোমাখানো কাচের প্লেটটি ঘড়িকলের সাহায্যে ডানদিক থেকে বা দিকে নির্দিষ্ট গতিতে আস্তে আস্তে সরে যায়। আর প্রতি চার সেকেণ্ড অন্তর প্লেট নিজে থেকে যান্ত্রিক ব্যবস্থায় সামনের দিকে এগিয়ে এসে কাচের

লিভারটিকে ছুঁয়ে ছোট একটি বিন্দুর মত দাগ নিয়ে আগের জায়গায় চলে যায়। এ ব্যবস্থায় ঘর্ষনজনিত ভুলভ্রান্তি খুবই সামান্য। গাছের বৃদ্ধির সাথে সাথে কাঁচের লিভারটিও বিন্দুর রেখা আঁকতে আঁকতে ওপরের দিকে উঠে যায়।



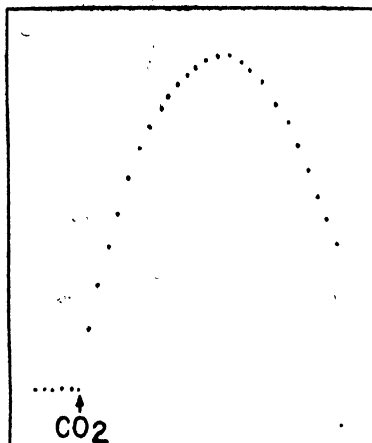
গাছের বৃদ্ধির লিপি

এবার যে কোন দুটি বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব (লম্বভাবে) চল্লিশ হাজার টুকরো করলে পরীক্ষাধীন গাছের এক সেকেণ্ডের বৃদ্ধির হিসেব পাওয়া যাবে।

এ তো গেল গাছের সরাসরি বৃদ্ধি মাপের ব্যবস্থা। কিন্তু এতে বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন উত্তেজক পদার্থ কিম্বা সার প্রয়োগের বিলম্বিত প্রভাব যথাযথভাবে পাওয়া সম্ভব হলো না। কারণ খুব অল্প সময়ের মধ্যে কাচের লিভারটি ভুষোমাখানো প্লেটটিকে ছাড়িয়ে যায়। তাই তিনি একটি নিখুঁত যান্ত্রিক কৌশলের সংযোজন ঘটালেন। মণ্ডসমেত পরীক্ষাধীন গাছটিকে গাছের বৃদ্ধির হারের সাথে সমতা রেখে নীচের দিকে নামানোর ব্যবস্থা করলেন। এ ব্যবস্থায় প্লেটের ওপর বিন্দুর সারি আড়ভাবে (Horizontal) পড়তে থাকলো। উত্তেজক পদার্থ বা সার প্রয়োগের ফলাফল বিলম্বিত লয়ে সুন্দরভাবে দেখা গেল।

এর পর উদ্ভিদের বৃদ্ধির গবেষণায় অভাবনীয় আরেকটি চমক দিলেন এক যন্ত্র। নাম Magnetic Crescograph। যন্ত্রটির প্রসারণ ক্ষমতা হলো দশ লক্ষগুণ। পরীক্ষার মাধ্যমে প্রকাশ পেল উদ্ভিদের বৃদ্ধির নানা জটিল গোপন অজানা তথ্য। বৃদ্ধির গতি পাটিগণিতের নিয়মে চলে না। গতি কখনো হয় দ্রুতলয়ে কখনো বিরতিসহ। অনেক সময় বৃদ্ধি হতে থাকে ছন্দের গতিতে। গাছের বৃদ্ধির উপযুক্ত তাপমাত্রা হলো ৩৪ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড।

বিভিন্ন বর্ণালী প্রয়োগ করে পরীক্ষা করলেন। দেখলেন; বৃদ্ধির ওপর নীল আলোর প্রভাব সবচেয়ে কম। এসব পরীক্ষা ছাড়াও বিভিন্ন উত্তেজক পদার্থ



কার্বলিক অ্যাসিড প্রয়োগের ফলাফল

কমবেশী প্রয়োগ করে প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলেন। বিস্ময়কর অনেক অজানা তথ্যের সংযোজন হলো এ গবেষণায়।

৩

ইতিমধ্যে জগদীশচন্দ্রের আরও দুখানি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে গেছে। ১৯০৬ সালে "Plant Response as a means of Physiological Investigation" ও ১৯০৭ সালে "Comparative Electrophysiology" গ্রন্থদুটি প্রকাশের পর সাড়া পড়ে গিয়েছিল চারদিকে। সমালোচনাও বেরিয়েছিল বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। "The Electrician" কাগজ 'Comparative Electrophysiology' বইটি সম্পর্কে লিখেছিল, This book should interest a large circle of scientific readers, dealing as it does with problems of Physics, Botany, Physiology……in

the present volume he has given further instances of this. This book contains much that is novel and the feeling on the part of many will be reading of his experiments—This must be tried......" ১৯০৬ সালের বইটি সম্পর্কে Medical Review-র উক্তি, "Prof. Bose's ambitious work is a monument of scientifically directed industry, patient observation, far reaching ingenuity.

এই অভুতপূর্ব সাড়ার পরিপ্রেক্ষিতে জগদীশচন্দ্র ১৯০৭ সালে বৈজ্ঞানিক সফরে লণ্ডন যান। পথে অবশ্য মাস দুই জার্মানীতে ছিলেন। এ যাত্রায় লণ্ডনে বেশীদিন থাকা হয়নি। ১৯০৮ সালের শেষভাগে জগদীশচন্দ্র প্রথম আমেরিকা যাত্রা করেন। সেখানে তিনি বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দেন। জগদীশচন্দ্রের এই সফরের প্রতিক্রিয়া জানা যায় রবীন্দ্রনাথকে লেখা ৬ই ডিসেম্বর ১৯০৭ সালের এক চিঠিতে। জগদীশচন্দ্র লিখেছিলেন, "......শুনিয়া সুখী হইবে এখানে American Association for Advancement of Science হইতে বিশেষরূপ আহূত হইয়া বক্তৃতা দিতে Baltimore গিয়াছিলাম। সেখানে অনেক বৈজ্ঞানিক উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই সানন্দ বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। অনেকস্থলে আমার কলের সাহায্যে নূতন গবেষণা আরম্ভ হইয়াছে। Washington এর Agricultural Department-এ আমাকে আহ্বান করিয়াছিলেন। সেখানে কৃষি সম্বন্ধে গবেষণায় বৎসরে ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এক সহস্র বৈজ্ঞানিক এই কার্যে নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা আমার অনুসন্ধান হইতে অনেক ফল প্রত্যাশা করেন। আর এক সপ্তাহ পরে Illinois যাইব।......"

দেশে ফেরার কিছুকাল বাদে ১৯১১ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ময়মনসিংহ শহরে। উদ্যোক্তারা জগদীশচন্দ্রকে এই সভার সভাপতি হিসেবে মনোনীত করেন। জগদীশচন্দ্র বক্তৃতা দিতে ময়মনসিংহ আসবেন এই সংবাদে সাড়া পড়ে গেল চারদিকে। সভায় স্থান সংকুলান হবে না আশংকায় সম্মিলনীর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহারাজা কুমুদচন্দ্র সিংহ চিঠি লিখলেন জগদীশচন্দ্রকে। বললেন, বক্তৃতার দিন আমরা প্রবেশমূল্য ধার্য করতে চাই। কারণ এ ব্যবস্থা ছাড়া ভীড় সামলাবার আর কোন উপায় দেখছি না। জগদীশচন্দ্র কিন্তু এ ব্যবস্থা মেনে নিতে পারলেন না। উত্তরে

জানালেন, শুধু বিত্তশালী লোকের জন্য তিনি বক্তৃতা দিতে ময়মনসিংহ যেতে রাজী নন। কোন কারণেই যেন প্রবেশমূল্য ধার্য করা না হয়। দরকার হলে তিনি দু'দিন বক্তৃতা দেবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জগদীশ-চন্দ্র দু'দিন ভাষণ দিয়েছিলেন। একদিন বাংলায় অন্যদিন ইংরেজীতে। বাংলা বক্তৃতাটি ১৩১৮ সালের বৈশাখ সংখ্যায় 'প্রবাসী' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। ভাষণটি সর্বকালের প্রশংসনীয় বক্তৃতারূপে বাংলা সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। বক্তৃতাটির সামান্য অংশ পাঠকদের উদ্দেশ্যে তুলে ধরছি—

"……কবি এই বিশ্ব-জগতে তাঁহার হৃদয়ের দৃষ্টি দিয়া একটি অরূপকে দেখিতে পান, তাহাকেই তিনি রূপের মধ্যে প্রকাশ করিতে থাকেন। অন্যের দেখা যেখানে ফুরাইয়া যায় সেখানেও তাঁহার ভাবের দৃষ্টি অবরুদ্ধ হয় না। সেই অপরূপ দেশের বার্তা তাঁহার কাব্যের ছন্দে ছন্দে নানা আভাসে বাজিয়া উঠিতে থাকে। বৈজ্ঞানিকের পন্থা স্বতন্ত্র হইতে পারে কিন্তু কবিত্ব-সাধনার সহিত তাঁহার সাধনার ঐক্য আছে। দৃষ্টির আলোক যেখানে শেষ হইয়া যায় সেখানেও তিনি আলোকের অনুসরণ করিতে থাকেন, শ্রুতির শক্তি যেখানে সুরের শেষ সীমায় পেঁছায় সেখান হইতেও তিনি কম্পমান বাণী আহরণ করিয়া আনেন।……

……বৈজ্ঞানিক ও কবি, উভয়েরই অনুভূতি, অনির্বচনীয় একের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। প্রভেদ এই, কবি পথের কথা ভাবেন না, বৈজ্ঞানিক পথটাকে উপেক্ষা করেন না। কবিকে সর্বদা আত্মহারা হইতে হয়, আত্মসংবরণ করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য। কিন্তু কবির কবিত্ব নিজের আবেগের মধ্য হইতে তো প্রমাণ বাহির করিতে পারে না ; এজন্য তাঁহাকে উপমার ভাষা ব্যবহার করিতে হয়। সকল কথায় তাঁহাকে "যেন" যোগ করিয়া দিতে হয়।

বৈজ্ঞানিককে যে পথ অনুসরণ করিতে হয় তাহা একান্ত বন্ধুর, এবং পর্য-বেক্ষণ ও পরীক্ষণের কঠোর পথে তাঁহাকে সর্বদা আত্মসংবরণ করিয়া চলিতে হয়। সর্বদা তাঁহার ভাবনা পাছে নিজের মন নিজেকে ফাঁকি দেয়। এজন্য পদে পদে মনের কথাটা বাহিরের সংগে মিলাইয়া চলিতে হয়। দুই দিক হইতে যেখানে না মিলে সেখানে তিনি একদিকের কথা কোনোমতেই গ্রহণ করিতে পারেন না।"……

১৯১৪ সাল। মহামতি গোখেলের অনুপ্রেরণায় জগদীশচন্দ্র বিশ্ব-পর্যটনে যাওয়া ঠিক করেছেন বলে খবর কাগজে বেরুল। মাদ্রাজ থেকে Mrs.

Annie Besant তাঁর "The commonweal" কাগজে দুঃখ করে লিখলেন, "Two years ago when an Indian member of the syndicate of the Madras University proposed that Dr. J. C. Bose might be requested to give a series of lectures in Madras, his suggestion, we learnt at the time, was promptly opposed by the foreign 'Educationalists'……

বিশ্ব-পর্যটনের ভ্রমণসূচী লণ্ডন, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, প্যারিস, ভিয়েনা, জার্মানী, আমেরিকা ও জাপান। জগদীশচন্দ্র রওনা হলেন স্থলপথে। সাথে "রেজোনাণ্ট রেকর্ডার", "অসিলেটিং প্লেট ফাইটোগ্রাফ" ও "কম্পাউণ্ড লিভার ক্রেস্কোগ্রাফ যন্ত্র"। আর প্রয়োজনীয় গাছপালা (তারের খাঁচায় সবল দুটি লজ্জাবতী ও দুটি বনচাঁড়াল গাছ) লণ্ডনে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ছাত্র বশীশ্বর সেনকে।

বশীশ্বর বাবু "S. S. Egypt" জাহাজে রওনা হলেন। পরবর্তীকালে জাহাজের দীর্ঘ একমাস সমুদ্রযাত্রার কথা বলতে গিয়ে বশীশ্বর বাবু বলেছিলেন—"…… As long as the ship ploughed through the Indian Ocean the plants thrived as though they were in their own familiar soil. During the journey through the Red Sea they bathed in the sunshine and enjoyed the warmth. When we entered the Mediterranean there was a sudden chill and the plants became depressed and the leaves drooped. As we proceeded further west the weather became colder and colder, and when we reached the Gulf of Lyon's I was greatly discouraged by the fear that I might not be able to carry my charge alive to their destination. The Bay of Biscay, I was warned, would to be quite fatal. The only thing I could do was to wrap the cage with blankets and expose the plants only to the brief flashes of sunshine when they appeared.

যন্ত্রসহ জগদীশচন্দ্র উঠেছেন লণ্ডনের South Kensington-এ। পথে কুলিদের হাতে Crescograph যন্ত্রটি ভেঙ্গে গিয়েছিল। সৌভাগ্যবশতঃ জগদীশচন্দ্রের অন্য এক ছাত্র জ্যোতিপ্রকাশ সরকার তখন লণ্ডনে। তার

সহযোগিতায় কয়েকদিনের মধ্যেই যন্ত্রটি সারানো সম্ভব হলো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য; জ্যোতিপ্রকাশ সরকার ছিলেন ডাঃ নীলরতন সরকারের ভাইপো, M.D পাশকরা ডাক্তার। কিন্তু সারাজীবনে ডাক্তারী করেছিলেন কমই। যোগ দিয়েছিলেন জগদীশচন্দ্রের যন্ত্রপাতি নির্মাণের কাজে। পরবর্তীকালে বসু-বিজ্ঞানমন্দির স্থাপনার পর তিনি বিজ্ঞানমন্দিরের যন্ত্রাগারের অধ্যক্ষ হন ও বহু সুদক্ষ কারিগর সৃষ্টি করেন।

পরীক্ষার প্রয়োজনীয় গাছপালা "হট হাউজে" রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিলেন রয়্যাল বোটানিক্যাল গার্ডেনের অধ্যক্ষ Mr. Kelp। জগদীশচন্দ্র তাঁর অস্থায়ী গবেষনাগার গড়ে তুললেন "মেইডা ভেইলে"। ২০শে মে। অক্সফোর্ডে বক্তৃতা দিলেন। এর পরের বক্তৃতা ২৯ শে মে তারিখে। রয়্যাল ইনস্টিটিউশনে। Third Friday Evening Discourse। বক্তৃতার বিষয় "On Plant Autographs and their Revelations"। জগদীশচন্দ্রের চিরশুভাকাঙ্খী অধ্যাপক ভাইনস্ বললেন, রয়্যাল ইনস্টিটিউশনে একটার বেশী পরীক্ষা দেখাবার দরকার নেই। আর বক্তৃতাও অল্প সময়ের মধ্যেই শেষ করা ভাল। কারণ অনেক বিরোধী ভাবাপন্ন বিজ্ঞানী সেখানে উদ্দেশ্যমূলকভাবে উপস্থিত থাকবেন। কথাপ্রসঙ্গে আরও বললেন, একসময় John Tyndall-এর মত বিজ্ঞানীকেও রয়্যাল ইনস্টিটিউডশনে পরীক্ষা দেখাবার সময় সামান্য ভুলের জন্য নাকাল হতে হয়েছিল। বক্তৃতার দিন রয়্যাল ইনস্টিটিউশন গবেষনা-গারের প্রধান Mr. Heath আন্তরিকভাবে জগদীশচন্দ্রকে পরীক্ষা প্রদর্শনের ব্যাপারে সাহায্য করতে চাইলেন। জগদীশচন্দ্র মৃদু হাসলেন। তারপর বশীশ্বর বাবু ও জ্যোতিপ্রকাশ সরকারকে দেখিয়ে বললেন, সাহায্যের দরকার নেই।

মঞ্চে উঠে জগদীশচন্দ্র দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। পরীক্ষাও দেখালেন সব কটি। কারণ জগদীশচন্দ্র বিশ্বাস করতেন, কোন রকম আংশিক বা প্রান্তিক সমাধান দিয়ে মীমাংসায় আসা যায় না। নিজের মতকে স্থায়ীরূপ দিতে গেলে ঝুঁকি নিতেই হবে।

কয়েকদিনের মধ্যেই জগদীশচন্দ্র একটি চিঠি পেলেন। লিখেছেন রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি Sir William Crookes, "I was much impressed by the most ingenious and novel self recording instruments, where by you are able to make plants automatically record their response to electric and other stimulation and their

own movements when no outside stimulus affects them. The means of physiological investigation thereby afforded is of much importance. I will give a review of your researches in the "Chemical News" so that others may be able to read and understand the novel facts you have discovered.'

পরবর্তী বক্তৃতা ধার্য হল কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। ২রা জুন ১৯১৪ সাল। নিজের পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয়। ছাত্রজীবনে বেশ কয়েক বছর কাটিয়েছেন এখানে। বক্তৃতার আগে ঘুরে দেখলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত বিভাগ। দেখলেন প্রাণীতত্ত্ব বিভাগ সেই আগেরই মত রয়েছে। খাঁচায় একটি ভেড়া, দুটি ময়ুর ও কয়েকটি শেয়াল। কৌতুক অনুভব করলেন জগদীশচন্দ্র। দেখা হলো ডেমনস্ট্রেটর Mr. Oak ও চাপরাশী Mr. Shrub-এর সাথে। এরা দুজনেই জগদীশচন্দ্রকে বিশেষ চোখে দেখতেন। কারণ জগদীশচন্দ্র ছিলেন কেমব্রিজের প্রথম ভারতীয় যিনি বিজ্ঞান পড়েছেন। পরীক্ষা দেখাবার কয়েকদিন আগে থেকেই লণ্ডনের আবহাওয়া খারাপ যাচ্ছিল। কিন্তু কোন অসুবিধে হলো না। প্রয়োজনীয় গাছপালার দায়িত্ব স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে নিয়েছিলেন সেই বৃদ্ধ Shrub। শুধু পরীক্ষা দেখাবার ঘণ্টাদুই আগে "গ্যাস হিটিং চেম্বারে" গাছ এনে রাখতে হয়েছিল মাত্র। বক্তৃতা শুনতে কেমব্রিজে সেদিন অগণিত বিজ্ঞান পিপাসু মানুষের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন Sir Francis Darwin, Prof. Seward, Prof. Blackman এর মতন প্রতিথযশা বিজ্ঞানীরা। বক্তৃতা শেষে Sir Francis Darwin, উঠে বললেন, "......The results of Prof. Bose's researches not merely affect Physiological Botany but are also of the deepest importance in various other branches of science and much might be expected from the furtherance of his work.

এই বক্তৃতার পর সাড়া পড়ে গেল সর্বত্র। জানা যায় বশীশ্বর বাবুর লেখাতে। তিনি বলেছিলেন, My Master's researches evoked even keener interest on the continent, in Germany, in Austria and in France. The eminent botanist Prof. Pringshiem of Halle contributed a very appreciative review of Master's biological researches to the leading scientific review of Germany and

a very cordial invitation was sent to him stating that his fine work had been very highly appreciated and that the exhibition of his remarkable instruments would be of the greatest interest to the German biologists. কয়েক-দিনের মধ্যেই আবার খবর এলো জার্মানী থেকে। আগস্টমাসের মাঝামাঝি মিউনিক শহরে এক আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। গোটা একটা দিন রাখা হয়েছে জগদীশচন্দ্রের জন্য। আর পরীক্ষার উপযোগী গাছপালা রাখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মিউনিক বোটা-নিক্যাল গার্ডেনের অধ্যক্ষ অধ্যাপক Goebel-কে যিনি সমস্ত পৃথিবী বার তিনেক ঘুরে দুষ্প্রাপ্য গাছপালা সংগ্রহ করে মিউনিক বোটানিক্যাল গার্ডেনকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাগানে পরিণত করেছেন। আমন্ত্রণ এলো ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালর থেকেও। ফ্রান্সের "একাডেমী অব সায়েন্সের" সভাপতি M. Cornu লিখলেন,—You should try to revive the grand traditions of your race, which bore aloft the torchlight of science and art and was the leader of civilization two thousand years ago, we in France applaud you. দু এক দিনের মধ্যে আবার চিঠি এলো জার্মানী থেকে। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক P. Vander Wolks লিখলেন, "The results of your researches brought me a great deal nearer to the correct interpretation of plant reactions and I am continuing my investigations in your footpath." বন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Fitting লিখলেন, "It will be a special honour to be able to greet you in our University. I look forward very much to make your acquaintance and to be able to see the workings of your remarkable instruments. I followed your work with the greatest interest and expect to learn from you much that is highly interesting." অনুরূপ আরও একটি চিঠি এলো প্রখ্যাত অধ্যাপক Verworn-এর কাছ থেকে।

কার্যসূচী ঠিক হলো। প্রথমে ভিয়েনা, তারপর প্যারিস। প্যারিসের পালা সাঙ্গ করে যাবেন Strassburg, Leipzig, Halle, Berlin, Bonn ও শেষে মিউনিক শহরের আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক আলোচনাচক্রে।

জগদীশচন্দ্র ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুদিন যন্ত্রের পরীক্ষার মাধ্যমে বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেল। এই বক্তৃতার প্রতিক্রিয়া ও পরীক্ষা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বশীশ্বর বাবু বলেছিলেন, Their admiration knew no bounds. Prof. Molisch (Rector Vienna University) said that they now realised how crude had been the appliances which had hitherto been used and how incomplete had been their knowledge of the intricate life-reactions of the plants. আর পরীক্ষা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলেন, The success of our lecture next day even surpassed our expectations. Every one of the experiments, the demonstration of the universal sensitiveness of plants, the electric twitch in answer to blow the record of the speed of nervous impulse in plants and the rhythmic pulsations and their modifications under stimulants and narcotics, succeeded in remarkable manner. The excitement of the audience reached its climax when the plant, under the crisis of death showed for a moment, by means of its fluttering records.……

এবার প্যারিসের পালা। প্যারিস আগেও দুবার গেছেন। সেখানে প্রতিষ্ঠাবাণ পদার্থবিদ হিসেবে তিনি স্বীকৃত। পরিচয় আছে Poincare, Cornu, Mascart, Lippmann, Cailletet, Becquerel-এর মত প্রতিথযশা বিজ্ঞানীদের সাথে। অধ্যাপক Poincare তাঁর বিখ্যাত "Electric Radiation" গ্রন্থে জগদীশচন্দ্রের পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বক্তৃতার আগে প্রশংসা করে "Le Temp" কাগজ লিখল, বিখ্যাত পদার্থবিদ জগদীশচন্দ্র ও উদ্ভিদতাত্ত্বিক জগদীশচন্দ্র একই ব্যক্তি। ইত্যাদি, আরও অনেক কথা। তবুও প্যারিসের বক্তৃতায় কিছু অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটে গেল।

বক্তৃতা শেষে জগদীশচন্দ্র পরীক্ষা দেখাচ্ছেন। বিষয়বস্তু, বিষ প্রয়োগে "উদ্ভিদের মৃত্যু"। যন্ত্রে বনচাঁড়াল গাছের স্পন্দন লিপিবদ্ধ হচ্ছে। জগদীশচন্দ্র ফিরে তাকালেন বশীশ্বরবাবুর দিকে। বললেন, পরীক্ষাধীন

গাছটিকে "পটাশিয়াম সায়নাইড" প্রয়োগ করতে। তীব্র বিষ। এখুনি স্পন্দন চিরতরে থেমে যাবে; স্তব্ধ দর্শক বিজ্ঞানীগণ। কিন্তু একি! গাছ তো বিষক্রিয়ায় ঢলে পড়ছে না। পাতার চলন বন্ধ হচ্ছে না। মঞ্চে দাঁড়ানো নির্বাক জগদীশচন্দ্র ছাত্র বশীশ্বরকে বিষের মাত্রা বাড়িয়ে দিতে বললেন। মাত্রা বাড়ানো হ'ল। এবার ফল আরও বিস্ময়কর। পাতার চলন বেড়ে গেল। অন্যদিকে অবিশ্বাসের গুঞ্জন শুরু হয়েছে। ক্রমশঃ তীব্রতা বাড়ছে। চেচামেচি শুরু হয়ে গেল। খানিকটা চুপ করে কি যেন ভাবলেন জগদীশচন্দ্র। চারদিকে তাকালেন। দেখলেন দূরে টেবিলের ওপর রয়েছে একটি "ক্লোরোফর্মের" শিশি। সোজা এগিয়ে গেলেন। নিজ হাতে "ক্লোরোফর্ম" প্রয়োগ করলেন গাছটির ওপর। ফল হলো। পাতার চলন এবার ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল। এবার বক্তৃতা মঞ্চ থেকে নেমে ভাল করে নেড়েচেড়ে দেখলেন অবশিষ্ট পটাশিয়াম সায়ানাইডটুকু। সন্ধ্যের পর সবকিছু পরিস্কার হলো। কাণ্ডটি বাধিয়েছেন বশীশ্বরবাবুই। পরীক্ষা দেখবার কিছু আগে বশীশ্বরবাবু লক্ষ্য করেন বিভিন্ন জায়গায় পরীক্ষা দেখাতে গিয়ে পটাশিয়াম সায়ানাইড শেষ হয়ে গেছে। উপায়হীন বশীশ্বরবাবু তাড়াতাড়িতে নিজে না গিয়ে পরিচিতা এক মহিলাকে দোকানে পাঠিয়েছিলেন পটাশিয়াম সায়ানাইড কিনে আনতে। কিন্তু ভদ্রমহিলা উপযুক্ত প্রমাণপত্র সংগে নিয়ে যাননি। ওষুধের দোকানের বিক্রেতা মহিলার মুখের কথা বিশ্বাস করেন নি। নিছক একটি প্রাণরক্ষার তাগিদে কর্ত্তব্য পরায়ন হয়ে বিষের পরিবর্তে কিছুটা চিনিগুড়ো করে মহিলা খরিদ্দারকে সন্তুষ্ট করেছিল। এ বিষয়ে পরবর্ত্তীকালে বশীশ্বরবাবু তাঁর ভ্রমণ-স্মৃতিতে লিখেছিলেন,……The French are preverbially polite, and though he did not believe a single word of the extra-ordinary story she related, he made a profound bow and regarded it as the greatest privilege to be of any service to the Madmoiselle. What he really believed was that the young lady was determined to commit suicide, perhaps on account of some disappointment in love. So he supplied her with some white stuff, resembling cyanide, which was in reality nothing else but the harmless sugar! So our attempt at the plant murder was thwarted by the machination of a compassionate and sentemental Chemist's assistant!

এবার জার্মানী যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু হল। প্রস্তুতির শেষ পর্বে লণ্ডন থেকে "তার" এলো। "সেক্রেটারী অব ষ্টেট ফর ইণ্ডিয়া" Lord Crewe জগদীশচন্দ্রের পরীক্ষা দেখতে চান। উপায় নেই। পরাধীন দেশের নাগরিক। আসতেই হলো লণ্ডনে। "ইণ্ডিয়া হাউজে" পরীক্ষা দেখালেন। পরীক্ষা দেখবার পর তিনি জগদীশচন্দ্রের অস্থায়ী পরীক্ষাগার দেখতে চাইলেন। দিন স্থির হলো। পরীক্ষাগার দেখতে Lord Crewe-র সাথে গেলেন Sir Thomas Holderness। যিনি ভারত বিষয়ক স্থায়ী উপসচিব। যন্ত্রের পরীক্ষা এঁরা খুঁটিয়ে দেখলেন।

দু'একদিনের মধ্যেই জগদীশচন্দ্র যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি গুছিয়ে ফেললেন সবকিছু। রওনা হলেন জার্মানীর উদ্দেশ্যে। ৩রা আগষ্ট ১৯১৪ সাল। যন্ত্রপাতি নিয়ে ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে গেলেন জগদীশচন্দ্র। নির্ধারিত কামরায় উঠে বসলেন। কিন্তু ট্রেন ছাড়ল না। ষ্টেশনে ঘোষনা করা হল, আজ কোন ট্রেন ভিক্টোরিয়া ষ্টেশন থেকে ছাড়বে না। জগদীশচন্দ্র ফিরে এলেন। পরদিন শুরু হয়ে গেল প্রথম মহাযুদ্ধ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য; সময়ের ব্যবধানে দাঁড়িয়ে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয়, যুদ্ধ শুরু হওয়ার কথা বৃটিশ সরকার আগেই জানতে পেরেছিলেন। তাই তারা জগদীশচন্দ্রকে প্যারিস থেকে সোজা জার্মানী যেতে দেন নি।

জগদীশচন্দ্র এবার আমেরিকা যাওয়ার তোড়জোড় শুরু করলেন। হঠাৎ একদিন Maida Vale-র গবেষণাগারে হাজির হলেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী Sir Lauder Brunton, লণ্ডন রাজ পরিবারের চিকিৎসক Sir James Reid ও রয়্যাল সোসাইটি অব মেডিসিনের সভাপতি Sir Francis Champney। সবাই উদাত্তকণ্ঠে জগদীশচন্দ্রের কার্যাবলী প্রশংসা করলেন। পরদিন এক চিঠিতে Sir Lauder Brunton বললেন, ... Even since I began to study Botany in 1863 and still more since I made some experiments on the action of poison on plants in 1365, the movement of plants had a great attraction for me. For Mr. Darwin (great Darwin) I made some experiments on digestion in insectivorous plants in 1875. All the experiments I have yet seen are crude in comparison with yours......"

নভেম্বরের শেষভাগ, জগদীশচন্দ্র আমেরিকা গেলেন। কিন্তু সুস্থ মন নিয়ে

যাওয়া সম্ভব হলো না। কারণ জগদীশচন্দ্রের ভাগ্নে অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন বসু তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "ঘোষ ট্রাভেলিং ফেলোশিপ" নিয়ে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো করছেন। প্রসংগত উল্লেখ্য, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর দেবেন্দ্রমোহল জার্মাণীতে অন্তরীন হন। এই সময় তিনি প্ল্যাংক, আইনষ্টাইন, ডিবাই প্রমুখ বৈজ্ঞানিকের সংস্পর্শে আসতে সক্ষম হন। ১৯১৯ সালে, অধ্যাপক রেগনারের অধীনে দেবেন্দ্রমোহন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী পান। পরবর্তীকালে জগদীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর তিনি বসু বিজ্ঞান মন্দিরের কর্ণধার হয়েছিলেন।

প্রায় বর্ষব্যাপী আমেরিকার একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত জগদীশচন্দ্র বক্তৃতা করলেন। যন্ত্রের পরীক্ষাও দেখালেন সর্বত্র। সমস্ত আমেরিকায় জগদীশচন্দ্রের আবিস্কার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেল। পত্রপত্রিকায় জগদীশচন্দ্রের গবেষণার খুঁটিনাটি সবকিছু বিষদভাবে প্রকাশিত হল। সাধারণ জনমানসেও জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক আবিস্কারের প্রতিফলন হয়েছিল। আবিস্কারের ওপর (১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯১৪ তারিখে) নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় Shea Hoque নামে এক কবির কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতাটি জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠেছিল। দেশে ফেরার আগে জগদীশচন্দ্র টেলিফোনের আবিস্কারক গ্রাহাম বেলের সাথে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করেন। ফেরার পথে জগদীশচন্দ্র জাপান যান। সেখানেও তাঁর পরীক্ষা সমাদরে গৃহীত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জাপানের শিল্পোন্নতি জগদীশচন্দ্রকে আকৃষ্ট করে। তাছাড়া অবলাদেবীও জাপানের নারীশিক্ষা ব্যবস্থা দেখে মুগ্ধ হন। জানা যায় অবলা বসুর দিনলিপিতে। তিনি লিখেছিলেন, "আমি যখন ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে জাপান ভ্রমন করিতে যাই তখন সেখানে শিক্ষার বিস্তার দেখিয়া নিজের অজ্ঞতা স্মরণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখ হয়। তখনই আমার মনে নারীশিক্ষা সমিতি স্থাপন করিবার কল্পনা উদয় হয়। কলিকাতা ফিরিয়া আমি আমার সকল বন্ধুবান্ধবদের সহিত এই বিষয়ে আলোচনা করি। তাঁহাদের উৎসাহে ও সাহায্যে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে নারীশিক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম কাজ কলিকাতাতে আরম্ভ হয়। বন্ধুদের পূজার দালানে, কাহারও বাগান বাড়ীতে মেয়েদের জন্য অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত্ হয়। মেয়েদের মধ্যে এইরূপ প্রতিষ্ঠান এই প্রথম। এই স্কুলগুলি পরে স্থানীয় লোকদের সাহায্যে শ্যামবাজার বালিকা বিদ্যালয়, বালিগঞ্জ ও বেলতলা স্কুলরূপে এখন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে।......"

দেশে ফিরলেন জগদীশচন্দ্র। এবারের বৈজ্ঞানিক সফরের তাৎপর্য অন্যরকম। বিদেশ ভ্রমণ যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয়েছে। সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করা হল প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে। অনুষ্ঠিত সভায় অধ্যক্ষ James বললেন; জগদীশচন্দ্রের জন্য আমরা গর্বিত। তবে জগদীশচন্দ্র বিনাবাধায় গবেষণা করতে পারেননি। এটা অবশ্য সব বৈজ্ঞানিকের ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে। ইত্যাদি আরও অনেক কথা। সভায় প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রাক্তন ছাত্র জে. এন. মিত্র ও ড. শরৎচন্দ্র ব্যানার্জী দাবী করলেন; বেকার লেবরেটারীতে জগদীশচন্দ্রের প্রস্তর মূর্তি স্থাপিত হোক। সভাশেষে জগদীশচন্দ্রকে হাজার বাতির একটি বাতিদান উপহার দেওয়া হলো। প্রেসিডেন্সী কলেজের পরিচালন সমিতি এক সভায় কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিলেন। বলা হলো, জগদীশচন্দ্রের জন্য আমরা গর্বিত। তাঁর কার্যকাল ৩০শে নভেম্বর ১৯১৫ সালে শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমরা তাঁকে Emeritus Professor হিসাবে কার্যকালের মেয়াদ পাঁচ বছরের জন্য বাড়াচ্ছি। তাছাড়া তাঁর গবেষণার জন্য অর্থ সাহায্যও বাড়ানো হলো। বাৎসরিক ১৮,০০০ থেকে ২৫,০০০ টাকা।"

বিশ্বজয়ের পরিপ্রেক্ষিতে এসময় রামমোহন লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও বিক্রমপুর সম্মিলনের পক্ষ থেকে জগদীশচন্দ্রকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জানানোর ব্যবস্থা হয়। অবশ্য এ ধরণের গণ-সম্বর্ধনা জগদীশচন্দ্রের পক্ষে এই প্রথম নয়। দেশবাসীর তরফ থেকে জগদীশচন্দ্রকে প্রথম সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন কলকাতার ভারত সঙ্গীত সমাজ। ১৯০৩ সালের গোড়ায়। ব্যাপারটা একটু খুলেই বলি। ১৯০২ সালের শেষে ইয়োরোপের বৈজ্ঞানিক সফর সমাপ্ত করে জগদীশচন্দ্র দেশে ফিরে দেখলেন; চক্রান্তকারীদের তৎপরতায় গবেষণার পথ রুদ্ধপ্রায়। তখন জগদীশচন্দ্রের পক্ষে জনমত তৈরীর চেষ্টায় ভারত সংগীত সমাজ এই সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেন। আয়োজিত সভার সভাপতি ছিলেন কোচবিহারের মহারাজা। সম্বর্ধনা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ "জয় তব হোক জয়" গানটি রচনা করেন। আর সম্বর্ধনা কমিটির অন্যতম সদস্যা সরলাদেবী রচনা করেন, "বন্দি তোমার ভারতজননি বিদ্যামুকুট ধারিনি" গানটি। তাছাড়া সংস্কৃত ও বাংলায় জগদীশপ্রশস্তি প্রকাশিত হয়। বাংলা প্রশস্তিটির অংশ বিশেষ পাঠকদের উদ্দেশ্যে তুলে ধরছি—

"......হে সৌম্য জগদীশচন্দ্র! আজি তোমার উদয়ে জননী ভারতভূমির মস্তক আবার উন্নত হইতেছে। ......ভারত সন্তানগণের প্রতিভা নাই; উঁহারা বৈজ্ঞানিক-তত্ত্বের উদ্ভাবনে অক্ষম—নিজ জন্ম ভূমির এ কলঙ্ক মোচন করিয়া তুমি আজি আমাদের গৃহদেবতা হইয়াছ।

বিদ্যা, বিনয়, প্রতিভা ও সাত্ত্বিকতাদি গুনে তুমি শিক্ষিতগণের শীর্ষ-স্থানীয়। এদেশের বিদ্যার্থিগণ তোমার বিশ্বজনীন পদবী অনুসরণ করিয়া কৃতার্থ হউক।...... গিরিরাজ সুমেরু যেমন নিবিড় জলদজাল ভেদ করিয়া উচ্চতম স্থানে উত্থিত, তুমিও তেমনি পথের অশেষ বিঘ্নরাশি ভেদ করিয়া চরমোন্নতি লাভ কর।......

হে ধীমন্! আজি শুভ শ্রীপঞ্চমীর বাসরে কৃতজ্ঞ ভারত সংগীত সমাজ কর্তৃক প্রদত্ত, প্রীতি সুধাসিক্ত এই শ্লোকময় উপহার-মাল্য তুমি গ্রহণ কর।"

রামমোহন লাইব্রেরীর সম্বর্ধনার উদ্যোক্তাদের প্রধান ছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও অধ্যাপক ব্রজেন শীল। সম্বর্ধনা উপলক্ষে কবি করুণানিধান বন্দোপাধ্যায় ও কবি হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দুটি কবিতা রচনা করেন। রঙ্গীন কাগজে ছাপা কবিতা দুটি উপস্থিত সকলকে বিলি করা হয়। কবিতা দুটি আজ প্রায় অনেকেরই অজানা। তাই পাঠকদের উদ্দেশ্যে নির্বাচিত অংশবিশেষ উপস্থিত করছি।

বিজ্ঞানাচার্য

সার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের অভিনন্দন উপলক্ষে

—শ্রীকরুণানিধান বন্দোপাধ্যায়।

হে বিনয়ী বরপুত্র বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর,
দেশে দেশে আজি তব যশের মন্দির,
হে বিজয়ী বীর।
হে গুণী, বরেণ্য, বুধ, পূর্ব আশা ভরি'
ঢালিয়াছ সঞ্জীবন আলোর লহরী,
তমঃ পুঞ্জ হরি'।

* * * *

জ্ঞানামৃত—রত্নাকর করিয়া মন্থন
দেখাইলে জীবে জড়ে অনন্ত জীবন,
প্রাণের স্পন্দন।

*　　*　　*　　*

লহ আজি আশীর্বাদ দেশ-জননীর,
অধর করেছে যাঁর স্তণক্ষীর,
স্নেহ—সুগভীর।

আজি,
গুনমুগ্ধ স্বজাতির পরম শ্রদ্ধার
চন্দন-সুরভী এই পূত পুষ্পহার
লহ উপহার।

*　　*　　*　　*

ঋষি-প্রতিম বিজ্ঞানাচার্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের অভিনন্দন উপলক্ষে—

শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কবিরত্ন বিরচিত।

নিঃস্ব আমরা নহিতো বিশ্বে, নহিরে আমরা হীন,
জ্ঞানে বিজ্ঞানে কাব্যে শিল্পে চিহ্নিত চিরদিন।
জগদীশের এ জীবন-যজ্ঞে নবীন অভ্যুদয়
বাজাও ডঙ্কা, উড়াও নিশান, গাহো আজি জয়জয়।
মহা সাধনায় সিদ্ধ পূজারি বিশ্ববাণীর মন্দিরে
পেয়েছে মন্ত্র আশার আশীষ জীবন মরণ—সন্ধিরে!
আদি জগতের আর্যঋষির ধ্যানের লব্ধজ্ঞান।
সাধনে তাঁহার ভিতরে বাহিরে হয়েছে মূর্ত্তিমান।
নহে শুধু "শ্রুতি" নহে গো "স্মৃতি" দবশে পরশে আজি
আকার লভিয়া উঠেছে দিব্য নবীন সাজেতে সাজি।

*　　*　　*　　*

সাহিত্য পরিষদের সম্বর্ধনা সভায় প্রথমে জগদীশচন্দ্রের প্রাক্তন ছাত্র হীরেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা আচার্য প্রশস্তি পাঠ করা হয়। লেখাটি আন্তরিকতা-পূর্ণ ও সুন্দর। তিনি লিখেছিলেন, "আচার্য জগদীশচন্দ্র যখন স্বদেশে

ফিরিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রথম অধ্যাপনা কার্যে ব্রতী হয়েন; তখন যে সকল ছাত্র তাঁহার পদমূলে উপবিষ্ট হইয়া বিজ্ঞানের ক খ শিখিয়াছিল, আমি তাহাদের অন্যতম। বিজ্ঞানক্ষেত্রে আচার্য মহাশয় যে অপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, যেজন্য ভারতবাসীর নাম জগতে এখন ঘোষিত হইতেছে, তজ্জন্য তাঁহার স্বদেশ-বাসীমাত্রেই গৌরব অনুভব করিতেছে। বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে দুই শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক আছেন। প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা পরীক্ষা করিয়া facts সংগ্রহ করেন, সজ্জিত করেন, ব্যাপার লিপিবদ্ধ করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক এই সকল facts ও ব্যাপার হইতে অদ্ভুত মনীষাবলে সত্যের আবিষ্কার করেন। নিয়মের প্রতিষ্ঠা করেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র এই শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক। প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানবিদ্‌কে যদি বৈজ্ঞানিক বলা হয়। তবে দ্বিতীয় শ্রেণীর বৈজ্ঞানিককে প্রাজ্ঞানিক বলা উচিত। বিজ্ঞানের উপর প্রজ্ঞান; সেই প্রজ্ঞান দ্বারা তাহারা তত্ত্বের আবিষ্ক্রিয়া করেন। এই প্রজ্ঞানকে পাশ্চাত্যগণ Scientific imagination আখ্যা দিয়াছেন।......"

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই সম্বর্ধনা উপলক্ষে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত "মনীষী মঙ্গল" নামে একটি কবিতা লেখেন। কবিতাটি ১৩২২ সালের পৌষ সংখ্যা "সবুজ পত্র" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

বিক্রমপুর জগদীশচন্দ্রের পিতৃভূমি। তাই বিক্রমপুর সম্মিলনের পক্ষ থেকে উদ্যোক্তারা জগদীশচন্দ্রকেই অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে মনোনীত করেন। অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে "কুন্তলীন প্রেস" থেকে জগদীশচন্দ্রের উদ্দেশ্যে "বিক্রম-পুরের প্রীতি উপহার" নামে ছোট্ট একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। পুস্তিকায় প্রকাশিত কবিতা ও সঙ্গীতের অংশবিশেষ পাঠকদের উদ্দেশ্যে তুলে ধরছি।

"তোমারি গরবে গরবী আমরা তোমারি মানে মানী,
মেঘনার কল-কল্লোল-নাদে তোমারি কীর্ত্তিবাণী।

* * * *

কণ্ঠে জয় মাল্য সৌরভ-বিভোর (ওহে) স্বদেশ ভূষণ-মনি
মিলিয়াছি আমি আমরা হেথায়,
প্রীতি পুষ্পাঞ্জলি অর্পিতে তোমায়
তুমি আমাদের—আমরা তোমার—অতুল গৌরব মনি!
জয় জগদীশ! রাখ জগদীশে,
সুখে স্বাস্থ্যে সদা স্বদেশে বিদেশে।

'সঙ্গীত'

"মোদের জননী নদী মেখলা রম্যা বিক্রমপুর !
প্রকৃতির যেন দুলালী মেয়ে কণ্ঠে মধুর সুর,
চিরশ্যামল বিটপী তাহার হরিত তাহার মাঠ,
রতনে-কাঞ্চনে জড়িত যেন সে রাজার বিপুল ঠাট।
গৃহে শোভে তার মাতৃ প্রতিমা রমনীর সেরা যত,
কোমলে করুনে সবলে মধুরে কে আর তাদের মত।

* * * *

হিন্দু মোসলেম প্রীতিতে জড়িত প্রতি ভূমিখণ্ড যার,
মোদের জননী জন্মভূমির পায়ে শত নমস্কার।"

কবিতা ও সংগীতটি সভায় পরিবেশনের পর সভাপতির ভাষণে জগদীশচন্দ্র বললেন, "……জীবন সংগ্রামে যে কেবল শক্তিমানই জীবিত থাকে, দুর্বল নির্মূল হয়, একথা কেবল নিম্ন জীবের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য মনে করিতাম। কিন্তু পৃথিবী ভ্রমনের ফলে এ ভ্রান্তি দূর হইয়াছে। এখন দেখিতেছি, বিশ্ব-ব্যাপী আহবে দুর্বল উচ্ছিন্ন হইবে এবং সবল প্রতিষ্ঠিত হইবে। মনে করিবেন না যে, আমরা এখনও দূরে আছি বলিয়া এই খাণ্ডবদাহ আমাদিগকে স্পর্শ করিবে না।

অহিফেন সেবনে অতি সহজেই নানা কষ্ট হইতে নিজেকে উদ্ধার করিতে পারা যায়। সুতরাং অতীত গৌরব স্মরণই আমাদের পক্ষে বর্ত্তমান দুরবস্থা ভুলিবার প্রকৃষ্ট উপায়। আর এই যে সম্মুখে ম্যালেরিয়াতে জনপদ নির্মূল হইতেছে, দেশী শিল্প জাপানের প্রতিযোগীতায় উচ্ছিন্ন হইতেছে, এসব কথা ভাবিতে নাই। আমাদের জড়তা সম্বন্ধে যদি আমি কোন তীব্র ভাষা ব্যবহার করি তাহা হইলে ক্ষমা করিবেন। আমার জীবনে যদি কোন সফলতা দেখিয়া থাকেন তবে জানিবেন, তাহা সর্বদা নিজেকে আঘাত করিয়া জাগ্রত রাখিবার ফলে।

……তুমি ও আমি যে শিক্ষালাভ করিয়া নিজেকে উন্নত করিতে পারিয়াছি এবং দেশের জন্য ভাবিবার অবকাশ পাইয়াছি, ইহা কাহার অনুগ্রহে ? এই বিস্তৃত রাজ্য রক্ষার ভার প্রকৃত পক্ষে কে বহন করিতেছে ? তাহা জানিতে সমৃদ্ধিশালী নগর হইতে তোমাদের দৃষ্টি অপসারিত করিয়া দুঃস্থ পল্লীগ্রামে স্থাপন করো। সেখানে দেখিতে পাইবে পঙ্কে অর্ধনিমজ্জিত, অনশনক্লিষ্ঠ, রোগে শীর্ন, অস্থি-

চর্মসার এই "পতিত" শ্রেণীরাই ধন-ধান্য দ্বারা সমগ্র জাতিকে পোষণ করিতেছে। অস্থিচূর্ণ দ্বারা নাকি ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায় অস্থিচূর্ণের বোধশক্তি নাই ; কিন্তু যে জীবন্ত অস্থির কথা বলিলাম, তাহার মজ্জায় চির-বেদনা নিহিত আছে।…

……কেহ কেহ মনে করেন যে, সরকারী একজন ডিরেক্টার নিযুক্ত হইলেই আমাদের দেশের শিল্পোদ্ধার হইবে। ডিরেক্টার মহোদয় সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান নহেন। এই সমস্ত গুণের সমন্বয়েও বিধাতা পুরুষ আমাদের দুর্গতি দূর করিতে পারেন নাই। ইহা হইতে মনে হয়, আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে যাহাতে আমরা একান্ত বিমুখ। জাপানে অবস্থানের কালে দেখিলাম যে, ভারতীয় ছাত্রগণ তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উচ্চতম স্থান অধিকার করিয়াছে। অথচ কার্যক্ষেত্রে ভারতবাসীর কোন স্থান নাই। জাপানী কিন্তু ঐ অবস্থাতেই সিদ্ধ মনোরথ না হইয়া ক্ষান্ত হয় না। সে নিজের নিস্ফলতার কারণ অন্যের উপর ন্যস্ত করে না। আমাদের দুরবস্থার প্রকৃত কারণ কি? কারণ এই যে, চরিত্রে আমাদের বল নাই, "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" একথা আমরা মুখেই বলিয়া থাকি।……

……যখন নিশির অন্ধকার সর্বাপেক্ষা ঘোরতম তখন হইতেই প্রভাতের সূচনা। আঁধারের আবরণ ভাঙিলেই আলো। কোন্ আবরণে আমাদের জীবন আঁধারময় ও ব্যর্থ করিয়াছে? আলস্যে, স্বার্থপরতায় এবং পরশ্রীকাতরতায়! ভাঙিয়া দাও এসব অন্ধকারের আবরণ! তোমাদের অন্তর্নিহিত আলোকরাশি উচ্ছ্বসিত হইয়া দিগদিগন্ত উজ্জ্বল করুক।"

প্রসংগত উল্লেখ্য, এই বক্তৃতায় নিম্নবিত্ত ভারতীয় চাষীদের প্রতি জগদীশচন্দ্রের গভীর মর্মবেদনার চিত্র দেখা যায়। মধ্যবিত্ত সমাজ ও তার মানসিকতা সম্পর্কেও জগদীশচন্দ্র উদাসীন ছিলেন না। তাঁর মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথকে লেখা অনেক আগের এক চিঠিতে। চিঠিটি ২৫এ এপ্রিল ১৮৯৯ সালের। ৮৫নং আপার সার্কুলার রোড থেকে জগদীশচন্দ্র লিখেছিলেন "সুহৃদ্বরেষু এ কয়দিন ডাক্তারের অনুসন্ধানে ছিলাম। এজন্য ইতিপূর্বে উত্তর দিতে পারি নাই। নীলরতন বাবুর নিকট এজন্য কয়বার গিয়াছিলাম, কিন্তু সাক্ষাৎ হয় নাই। প্লেগের ধুমধামে তিনি বড় ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহার কোন আত্মীয় তাঁহার অজ্ঞাতসারে এক প্লেগ রোগী (মৃত) সৎকার করিতে লইয়া যান। সৎকার করিয়া গৃহে প্রবেশ করিবার পথে তাঁহার জন্য বিশেষ অভ্যর্থনার আয়োজন ছিল। প্রথমে করোসিব সাব্লিমেট জলে তাঁহাকে আপাদমস্তক স্নান

করান হয়, তারপর সমস্ত বহিরাবরণ (জুতা পর্যন্ত) রাজপথে কেরোসিন তৈলে দাহ করা হইয়াছিল। পৃথিবীতে মোটামুটি একটা সামঞ্জস্যের নিয়ম আছে। এদিকে এত সাবধানতা, অন্য দিকে মৃত রোগীর আত্মীয়েরা মৃত ব্যক্তির জিনিষপত্র অন্ধ আতুরদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়াছেন !......"

জগদীশচন্দ্র তাঁর এই বিশ্বভ্রমণ সম্পর্কে পরবর্তীকালেও সুন্দর একটি মন্তব্য করেছিলেন। বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা উৎসব উপলক্ষে। জীবন দিয়ে ঘটনাকে জানার সাথে সাথে অভিজ্ঞতার পরিসর স্বাভাবিক কারণেই বেড়ে যায়। জগদীশচন্দ্রের মন্তব্যে তা পরিস্ফুট। তিনি বলেছিলেন,"ভারতগভর্ণমেন্ট ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে আমাকে পৃথিবী পর্যটনে প্রেরণ করেন। সেই উপলক্ষে লণ্ডন, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, প্যারিস, ভিয়েনা, হার্ভার্ড, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, ফিলাডেলফিয়া, শিকাগো, কালিফোর্ণিয়া, টোকিও ইত্যাদি স্থানে আমার পরীক্ষা প্রদর্শিত হয়। এই সকল স্থানে জয়মাল্য লইয়া কেহ আমার প্রতীক্ষা করে নাই, বরং আমার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিগণ আমার ত্রুটি দেখাইবার জন্যই দলবদ্ধ হইয়া উপস্থিত ছিলেন। তখন আমি সম্পূর্ণ একাকী ;* অদৃশ্যে কেবল সহায় ছিলেন ভারতের ভাগ্যলক্ষ্মী।

এই অসম সংগ্রামে ভারতেরই জয় হইল এবং যাঁহারা আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তাঁহারা পরে আমার পরম বান্ধব হইলেন।......

পৃথিবী পর্যটন ও স্বীয় জীবনের পরীক্ষার দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছি যে, নূতন সত্য আবিষ্কার করিবার জন্য সমস্ত জীবনপণ ও সাধনার আবশ্যক।

---

*১৯১১ সালে বশীশ্বর সেন জগদীশচন্দ্রের ছাত্র হিসেবে যোগ দেন। পরবর্তীকালে জগদীশচন্দ্রের একক বিজ্ঞান সমরের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন : We were impatient at the world's slow recognition of his work. If others could only see as we did ! The Master was amused at our impatience. To him it had become almost indifferent whether he won recognition or not. The only thing that did matter was whether he pursued truth to the utmost. Our impatience, however, must have slowly influenced him, for one day he said, "I will have to do it, but that would mean long conflict of practically one man against the world."

জগতে তাহার প্রচার আরও দুরূহ। ইহাতে আমার পূর্বসংকল্প দৃঢ়তর হইয়াছে। বহুদিন সংগ্রামের পর ভারত বিজ্ঞানক্ষেত্রে যে স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহা যেন চিরস্থায়ী হয়,……" আর জার্মান 'বিজ্ঞানী ফেফার সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়ে বলেছিলেন, "বর্তমান উদ্ভিদবিদ্যার অসীম উন্নতি লাইপজিগের জার্মান অধ্যাপক ফেফারের অর্ধ শতাব্দীর অসাধারণ কৃতিত্বের ফল। আমার কোনো কোনো আবিষ্কিয়া ফেফারের কয়েকটি মতের বিরুদ্ধে।……

ফেফার তাঁহার সহযোগী অধ্যাপককে আমায় নিমন্ত্রণ করিবার জন্য প্রেরণ করেন। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যে, আমার প্রতিষ্ঠিত নূতন তত্ত্বগুলি জীবনের সন্ধার সময় তাঁহার নিকট পেঁছিয়াছে; তাঁহার দুঃখ রহিল যে এই সকল সত্যের পরিণতি তিনি এজীবনে দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। যাহার বৈরীভাব আশঙ্কা করিয়াছিলাম, তিনিই মিত্ররূপে আমাকে গ্রহণ করিলেন। ইহাইতো চিরন্তন বীরনীতি, যাহা আপনার পরাভবের মধ্যেও সত্যের জয় দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হয়।……"

পৃথিবী ভ্রমণ থেকে ফেরবার পর জগদীশচন্দ্র অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ডাঃ নীলরতন সরকার বললেন, অতিরিক্ত পরিশ্রমই এর কারণ। তিনি নির্দেশ দিলেন, আপাতত কিছুদিন কোন কাজ করা চলবে না। জগীশচন্দ্রকে শারীরিক কারণে দার্জিলিং যেতে হবে। নীলরতনবাবুর অনুরোধে জগদীশচন্দ্র দার্জিলিং গেলেন। উঠলেন নীলরতন সরকারের বাড়ী Glen Eden-এ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই বাড়ীতে বসেই জগদীশচন্দ্র শৈল গবেষণাকেন্দ্র তৈরীর পরিকল্পনা করেন। এর পর থেকে প্রতি গ্রীষ্মে জগদীশচন্দ্রকে দেখা যেত দার্জিলিং শহরে। সে সময় শুধু জগদীশচন্দ্রই নন, বহু বিখ্যাত ব্যক্তিরাও নিয়মিত দার্জিলিং যেতেন। তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নীলরতন সরকার, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রভাসচন্দ্র মিত্র, ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত, ব্রজেন শীল, অধ্যাপক মনমোহন ঘোষ, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্যতম। এরা প্রায়ই মিলিত হতেন। নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। নানা শিক্ষামূলক বক্তৃতারও বন্দোবস্ত হতো। সেইসব আলোচনার চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে অধ্যাপকদেবেন্দ্রমোহন বসু (জগদীশচন্দ্রের ভাগিনেয়) পরবর্তীকালে বলেছিলেন, "১৯১৯ সালে ইয়োরোপ থেকে ফিরে এসে আমি দার্জিলিংয়ে এই দলের কার্যকলাপ দেখেছিলাম। দুটি স্মৃতি আজও আমার মনকে উদ্বেলিত করে।

প্রথমটি একটি বক্তৃতা। বক্তৃতা মহেঞ্জোদারো আবিষ্কারের ওপর। বক্তৃতা দিয়েছিলেন মহেঞ্জোদারোর আবিষ্কারক আমার কলেজের সহপাঠী রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়। সেই নির্বাচিত সমাবেশে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশও জগদীশচন্দ্রের বৈঠকখানায় বক্তৃতা শুনতে এসেছিলেন। জগদীশচন্দ্রের সেই প্রাকঐতিহাসিক ভারতীয় সভ্যতা নিদর্শনের স্থানে যাবার পরিকল্পনা সার্থক হয়েছিল চার বছর পরে। যখন তিনি ১৯২৭ সালে লাহোরে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন। সেই সময় প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের ডেপুটি ডাইরেকটার জেনারেল রায়বাহাদুর দয়ারাম সাহানি হরপ্পা পর্যটনেরও ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই দলে জগদীশচন্দ্র ও অবলাদেবীর সঙ্গী ছিলেন অধ্যাপিকা মিসেস কমপটন, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা এবং আমি।

কিছুকাল পরে রাশিয়ার বাল্টিক স্টেট থেকে বিখ্যাত শিল্পী অধ্যাপক নিকোলা রোরিখ জগদীশচন্দ্রের গৃহে অতিথি এসে এসেছিলেন। সেই দলে তাঁর স্ত্রী এবং দুই পুত্র দার্জিলিংয়ের লেবঙে অবস্থিত "হারমিটেজ কুটীরে" কয়েকমাস অতিবাহিত করেন। দলটি মঙ্গোলিয়া এবং তিব্বতের মালভূমির মধ্য দিয়ে ভারতে এসেছিলেন। তারা যখন জগদীশচন্দ্রের সাথে দেখা করতে আসেন তখন তাদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তারা এসেছিলেন ঘোড়ায় চেপে পায়ে ছিল বুট জুতো। দেখে মনে হলো ছবির মতো। আমাকে যখন তারা নেমন্তন্ন করলেন, আমি খুশী হলাম। যখন দেখা করতে গেলাম, অধ্যাপক রোরিখ তাঁর সবেমাত্র শেষ করা কতগুলি চিত্রশিল্প দেখিয়েছিলেন যার মধ্যে ছিল অনেকগুলি চিত্তাকর্ষক মঙ্গোলিয়ান ক্যাম্পের রাত্রিকালীন দৃশ্য। যেখানে প্রতি চিত্রে একটি সাদা ঘোড়া হেঁটে যাওয়ার দৃশ্য ছিল। এটি মঙ্গোলিয়ান পৌরানিক উপাখ্যানে গৌতম বুদ্ধের দ্বিতীয়বার আগমনের চিত্র।" প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অধ্যাপক রোরিখ ১৯২৩ সালে নিউইয়র্ক শহরে Roerich Museum প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৮ সালে জগদীশচন্দ্রের ৭০ তম জন্মদিন উপলক্ষে হিমালয়ের ওপর তাঁর নিজের আঁকা ছবির একটি বই উপহার হিসেবে পাঠান। বইটির প্রথম পাতায় তিনি লেখেন :

To Sir Jagadis Bose
in the name of great
knowledge and Beauty

N. Roerich
26, October 1928

বইটির মুখবন্ধ হিসেবে এক চিঠিতে বলেন,

Dear Sir Jagadis,

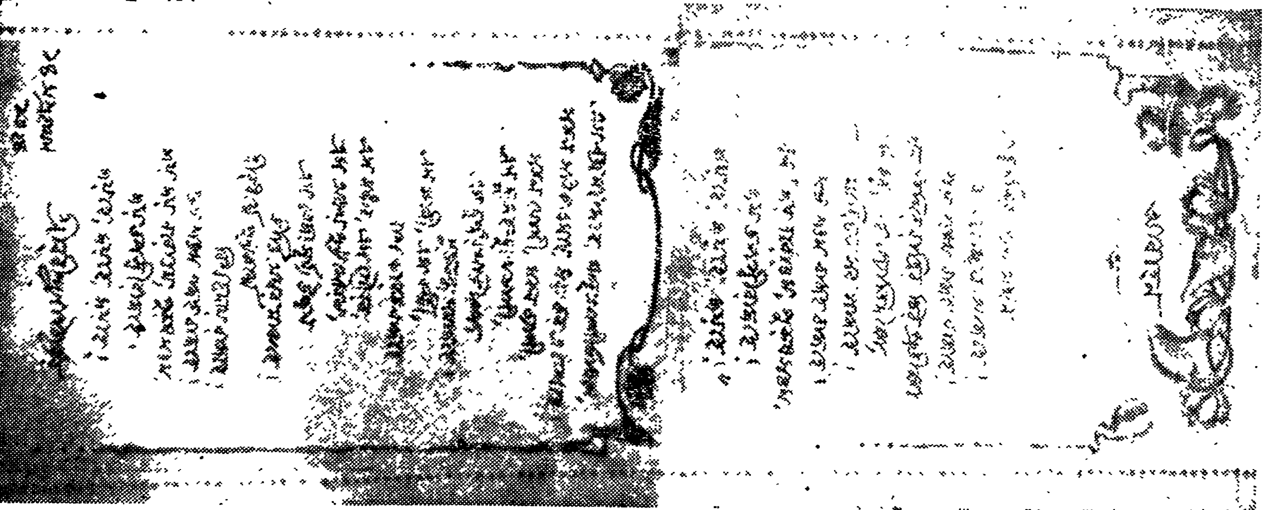
Several times in my books I mentioned your honored name as an example of lofty achievement......... Let this painting ever remind you of my sincere feelings and my admiration of your works.

Most cordially yours

N. Roerich

জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞান মন্দিরের স্বপ্ন দেখেছিলেন বহু বছর আগে। ১৮৯৭ সালের জানুয়ারী মাসে প্রথম রয়্যাল সোসাইটিতে বক্তৃতা দেওয়ার সময়। সাধারণত দেখা যায় অতীত সংকল্প যখন বাস্তবের মুখোমুখি হয় তখন সংকল্পের সামর্থে ঘাটতি পড়ে। কিন্তু জগদীশচন্দ্রের কাছে তা হ'ল বিপরীত। তিনি সমস্ত জীবনের কষ্টার্জিত সঞ্চয়কে একত্রিত করে বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠার কাজে হাত দিলেন। আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা চেয়ে চিঠি পাঠালেন শুভানুধ্যায়ীদের। অধ্যাপক ভাইনস্‌কে বললেন, দেশের ভাবীকালের অনাগত বিজ্ঞান কর্মীরা যেন তাঁর মত অসহায় অবস্থার সম্মুখীন না হয়, সেই লক্ষ্য সামনে রেখেই তিনি বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে চলেছেন। তিনি আরও বললেন, "আমার স্ত্রী ও আমি এই গবেষনাগারের জন্য সর্বস্ব দান করছি।"

প্রস্তুতি পর্বের শেষলগ্নে বন্ধু রবীন্দ্রনাথকে আমেরিকা যেতে হয়। তিনি সেখান থেকে জগদীশচন্দ্রকে লিখলেন, "তোমার বিজ্ঞান-মন্দিরে প্রথম সভা উদ্বোধনের দিনে আমি যদি থাকতে পারতুম তা' হ'লে আমার খুব আনন্দ হ'ত। বিধাতা যদি দেশে ফিরিয়ে আনেন তা' হ'লে তোমার এই বিজ্ঞান-যজ্ঞশালায় একদিন তোমার সঙ্গে মিলনের উৎসব হবে একথা মনে রইল। এতদিন যা তোমার সংকল্পের মধ্যে ছিল আজকে তার সৃষ্টির দিন এসেচে। কিন্তু এ ত তোমার একলার সংকল্প নয়, এ আমাদের সমস্ত দেশের সঙ্কল্প, তোমার জীবনের মধ্যে দিয়ে এর বিকাশ হ'তে চলল। জীবনের ভিতর দিয়েই জীবনের উদ্বোধন হয়—তোমার প্রাণের সামগ্রীকে তুমি আমাদের দেশের প্রাণের সামগ্রী ক'রে দিয়ে যাবে—তারপর থেকে সেই চিরন্তন প্রাণের প্রবাহে আপনিই সে এগিয়ে চল্‌তে থাকবে।.........তুমি যে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির মত তোমার মন্ত্রকে



বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠা উৎসবে ছোট্ট একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। ওপরের চিত্রটি পুস্তিকার দ্বিতীয় পাতার ছবি। তাতে বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ রচিত সঙ্গীতটি প্রকাশিত হয়।

অন্তরে প্রত্যক্ষ দেখতে পেয়েছ, এর জন্য বাইরে তাকে প্রকাশ করবার পূর্ণ অধিকার ঈশ্বর তোমাকে দিয়েচেন। সেই অধিকারের জোরে আজ তুমি একলা দাঁড়িয়ে তোমার মানস পদ্মের উপরে বিজ্ঞান-স্বরস্বতীকে দেশের হৃদয় পদ্মের উপরে প্রতিষ্ঠিতা করচ। তোমার মন্ত্রের গুনে, তোমার তপস্যার বলে দেবী সেই আসনে অচলা হবেন......... ।

১৯১৭ সাল। নিজের জন্মদিন ৩০ শে নভেম্বর তারিখে ঐতিহাসিক বসু বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠার উৎসব শুরু হল। বিজ্ঞান মন্দিরের সদ্য নির্মিত বক্তৃতাশালায়। অনুষ্ঠান শুরুতে বক্তৃতা মঞ্চের নীচে দাঁড়িয়ে সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল বসু বিজ্ঞান মন্দিরের জন্য রবীন্দ্রনাথ রচিত সংগীতটি—

"মাতৃ মন্দির—পুণ্য—অঙ্গন
কর মহোজ্জ্বল আজ হে !
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজহে...... ।"

মঞ্চটির ডান পাশে তাম্রফলকে জগদীশচন্দ্রের হস্তাক্ষর অনুসরনে লেখা—

"ভারতের গৌরব ও জগতের
কল্যাণ কামনায়
এই বিজ্ঞান মন্দির
দেবচরণে নিবেদন করিলাম"

শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু

১৪ই অগ্রহায়ণ,
সংবৎ ১৯৭৪

ঠিক সন্ধ্যে ছ'টা। জগদীশচন্দ্র তাঁর ভাষণে বললেন, "বাইশ বৎসর পূর্বে যে স্মরণীয় ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহাতে সেদিন দেবতার করুণা জীবনে বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলাম। সেদিন যে মানস করিয়াছিলাম তাহা এতদিন পরে দেবচরণে নিবেদন করিতেছি। আজ যাহা প্রতিষ্ঠা করিলাম তাহা মন্দির; কেবলমাত্র পরীক্ষাগার নহে।.........কি সেই মহাসত্য যাহার জন্য এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল? তাহা এই যে, মানুষ যখন তাহার জীবন ও আরাধনা কোনো উদ্দেশ্যে নিবেদন করে, সেই উদ্দেশ্য কখনও বিফল হয় না; তখন অসম্ভবও সম্ভব হইয়া থাকে। সাধারণের সাধুবাদ শ্রবণ আজ আমার উদ্দেশ্য নহে; কিন্তু যাহারা কর্মসাগরে ঝাঁপ দিয়াছেন এবং প্রতিকূল তরঙ্গাঘাতে মৃতকল্প হইয়া অদৃষ্টের নিকট

পরাজয় স্বীকার করিতে উদ্যত হইয়াছেন, আমার কথা বিশেষভাবে কেবল তাঁহাদেরই জন্য………।"

"বিলাতের ন্যায় এদেশে পরীক্ষাগার নাই, সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্মাণও এদেশে কোনদিন হইতে পারে না, তাহাও কতবার শুনিয়াছি। তখন মনে হইল, যে ব্যক্তি পৌরুষ হারাইয়াছে কেবল সে-ই বৃথা পরিতাপ করে। অবসাদ দূর করিতে হইবে, দুর্বলতা ত্যাগ করিতে হইবে। ভারতই আমাদের কর্মভূমি, সহজ পন্থা আমাদের জন্য নহে। তেইশ বৎসর পূর্বে অদ্যকার দিনে এই সকল কথা স্মরণ করিয়া একজন তাহার সমগ্র মন, সমগ্র প্রাণ ও সাধনা ভবিষ্যতের জন্য নিবেদন করিয়াছিল। তাহার ধনবল কিছুই ছিল না, তাহার পথ-প্রদর্শকও কেহ ছিল না। বহু বৎসর ধরিয়া একাকী প্রতিদিন প্রতিকূল অবস্থার সহিত যুঝিতে হইয়াছিল। এতদিন পরে তাহার নিবেদন সার্থক হইয়াছে।"

"……যে-সকল আশা ও বিশ্বাস লইয়া আমি এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলাম তাহা কি একজনের জীবনের সঙ্গেই সমাপ্ত হইবে? একটিমাত্র বিষয়ের জন্য বীক্ষণাগার নির্মাণে অপরিমিত ধনের আবশ্যক হয়; আর এইরূপ অতি বিস্তৃত এবং বহুমুখী জ্ঞানের বিস্তার যে আমাদের দেশের পক্ষে অসম্ভব, একথা বিজ্ঞজনমাত্রেই বলিবেন। কিন্তু আমি অসম্ভাব্য বিষয়ের উপলক্ষে কেবলমাত্র বিশ্বাসের বলেই চিরজীবন চলিয়াছি; ইহা তাহারই মধ্যে অন্যতম। "হইতে পারে না" বলিয়া কোনদিন পরাম্মুখ হই নাই; এখনও হইব না। আমার যাহা নিজস্ব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম তাহা এই কার্যেই নিয়োগ করিব। রিক্ত হস্তে আসিয়াছিলাম, রিক্ত হস্তেই ফিরিয়া যাইব।*……"

অনুষ্ঠান শেষে সমবেত সুধীমণ্ডলী উঠে দাঁড়ালেন। হাজার কণ্ঠে গাওয়া হলো, "জনগন মন—অধিনায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা" সঙ্গীত। সভা শেষ হলো "বন্দেমাতরম" ধ্বনির মাধ্যমে।

কিছুদিনের মধ্যেই বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে জগদীশচন্দ্র এক ভাষণে বললেন, "……জীবন সম্বন্ধে একটি মহাসত্য এই যে, যেদিন হইতে আমাদের বাড়িবার ইচ্ছা স্থগিত হয় সেইদিন হইতেই জীবনের উপর মৃত্যুর ছায়া পড়ে। জাতীয় জীবন সম্বন্ধে একই কথা। যেদিন হইতে আমাদের

*জগদীশচন্দ্রের এই বক্তৃতার ইংরেজী রূপটি "The Voice of Life" শীর্ষক বক্তৃতারূপে খ্যাত হয়।

বড়ো হইবার ইচ্ছা থামিয়াছে সেদিন হইতেই আমাদের পতনের সূত্রপাত হইয়াছে। আমাদিগকে বাঁচিতে হইবে, সঞ্চয় করিতে হইবে এবং বাড়িতে হইবে। তাহার জন্য কি করিয়া প্রকৃত ঐশ্বর্য লাভ হইতে পারে একাগ্রচিত্তে সেই দিকে লক্ষ রাখিবে।......"

"......এজন্য কেবল অল্প কয়েকজনকে আহ্বান করিতেছি, দুই-এক বৎসরের জন্য নহে ; সমস্ত জীবনব্যাপী সাধনার জন্য। ...মানসিক শক্তিতেই জীবনের চরমোচ্ছ্বাস। দেখ, তাহারই বলে এই পুণ্য দেশ সঞ্জীবিত রহিয়াছে। সেবা দ্বারা, ভক্তি দ্বারা, জ্ঞান দ্বারা মানুষ একই স্থানে উপনীত হয়। তোমরাও তাহার একটি পথ গ্রহণ করো।......"

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রথম ছাত্ররা ছিলেন, গুরুপ্রসন্ন দাস, সুরেন্দ্রচন্দ্র দাস, নরেন্দ্রনাথ নিয়োগী, বশীশ্বর সেন, জ্যোতিপ্রকাশ সরকার, নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, সত্যেন্দ্রচন্দ্র দে, ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় ও সত্যেন্দ্রচন্দ্র গুহ।

কোন কিছু প্রতিষ্ঠা করা কঠিন। কিন্তু তার সবল স্থায়িত্ব রক্ষা অতি দুরূহ ব্যাপার। বিশেষতঃ যেখানে কোন পরাধীন দেশের নাগরিক দাবী করে বসেন, প্রতিষ্ঠানের পরিচালন সমিতির সদস্য হতে প্রাথমিক যোগ্যতা হল সদস্যকে দেশের সন্তান হতে হবে। জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠা করেই প্রথমে একটি তত্ত্বাবধায়ক সমিতি গঠন করলেন। সমিতির সদস্য হলেন; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভুপেন্দ্রনাথ বসু, সুধাংশুমোহন বসু, সতীশরঞ্জন দাশ (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ভ্রাতা) ও জগদীশচন্দ্র নিজে। কিছুদিনের মধ্যেই বিজ্ঞান মন্দিরের কর্মধারাকে বিধিসম্মত করার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সমিতি একটি নিয়ামকমণ্ডলী গঠন করলেন। এই নিয়ামক মণ্ডলীর সদস্যরা হলেন জগদীশচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবলা বসু, নীলরতন সরকার, সুধাংশুমোহন বসু, সতীশরঞ্জন দাশ, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, বনোয়ারীলাল চৌধুরী। কোন ইংরেজ প্রতিনিধি নিয়ামকমণ্ডলীতে নেওয়া হলো না। বরং ঘোষণা করা হলো, বিজ্ঞান মন্দিরের কোন ব্যাপারে সরকারের কোন কর্তৃত্ব থাকবে না। এছাড়াও জগদীশচন্দ্র এক অছি পরিষদ গঠন করে বললেন—

"In founding the Institute I contributed about 5 lakhs for land, building and equipment ; I also made over to the Institute one lakh of Rupees in G. P. Notes for Endowment.

My residuary property, worth about 6 lakhs, will under my will be subsequently made over to the Institute. My total contribution will therefore be about 12 lakhs of Rupees. Donations have also been received from the public.

বিজ্ঞান মন্দিরের কাজকর্ম চালাতে আরোও অনেক অর্থের প্রয়োজন। সরকারের তরফ থেকে ভারতসচিব এক চিঠিতে জানালেন, কিছু অর্থ সাহায্য হয়তো বিজ্ঞানমন্দিরকে দেওয়া যেতে পারে ; তবে তা দেওয়া হবে, জনগণের তরফ থেকে কি পরিমাণ সমর্থন ও আর্থিক সাহায্য আসে তার ভিত্তিতে। জগদীশচন্দ্র আবেদন জানালেন দেশবাসীর উদ্দেশ্যে। বললেন, "আমার স্বোপার্জিত অর্থে পরিকল্পনার প্রাথমিক পর্ব শুরু হয়েছে মাত্র। এই মন্দিরের বৈজ্ঞানিক কর্মধারাকে আমি বহুদূর প্রসারিত করতে চাই, তারজন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন।"

অর্থ সাহায্যে সামিল হলেন দেশের সকল শ্রেণীর মানুষ। রাজামহারাজা ব্যবসায়ী; সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে দীনদরিদ্র কেউ বাদ গেলেন না। এদের মধ্যে কাশিমবাজারের মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, মহারাজা গায়কোয়াড়, বোমনজী, মুলরাজ খাটাউ-এর ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া এগিয়ে এলেন মহাত্মাগান্ধী ও জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা। জগদীশচন্দ্রও থেমে রইলেন না। অর্থসংগ্রহের জন্য জানুয়ারী ১৯১৮ সাল থেকে শুরু করলেন ধারাবাহিক বক্তৃতাদানের ব্যবস্থা। সেই সাথে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা প্রদর্শনের ব্যবস্থাও। টিকিটের মান ধার্য হল ২৪ টাকা, ১২ টাকা, ৮ টাকা ও ৪ টাকা। আর একটা বক্তৃতা শোনার জন্য দু' টাকা ও এক টাকা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য; আজকের এই অপসংস্কৃতির যুগে অবাক লাগে বিজ্ঞানের বক্তৃতা ও পরীক্ষা দেখবার কোন টিকিটই পড়ে থাকতো না। বিজ্ঞানমন্দিরের বক্তৃতাকক্ষে বক্তৃতা শুরুর অনেক আগেই বসু বিজ্ঞান মন্দিরের সামনের রাস্তা পরিপূর্ণ হয়ে যেত। দেখা যেত শুধু মানুষের ভীড়। ভীড় সামলাবার জন্য বিপ্লবী পুলিন দাস ও তাঁর সহযোগীরা হিমসিম খেতেন। এই ধারাবাহিক বক্তৃতাগুলির মধ্যে "Life Unvoiced," "Invisible Light," Universal sensitiveness of Matter," "Photo Dynamics" ও "The Electric Response of plants" আজ অমর বক্তৃতাগুচ্ছে পরিণত হয়েছে। এই বক্তৃতামালা ছাড়াও জগদীশচন্দ্র অর্থসংগ্রহের জন্য অন্য একটি ব্যবস্থা করলেন।

I dedicate this day this Institute which
I regard not merely as an experimental laboratory but a [illegible]
[illegible]

The power of our experimental methods extend
to what can be perceived by our senses, but
there [illegible] that vast extension
which conferred by artificial organs which we
may succeed in inventing. When the note of the audible
reaches the unheard, even then it is possible
to gather [illegible]. Of the innumerable
octaves of light there is a single octave which is all
that we can see. In the midst of a luminous
ocean we stand almost blind. The little
we can see is as nothing compared with the
vastness of that which we can not. But out
of the very imperfection of his
senses man has dared to build himself
a raft of thought by which to make daring
adventures on the great seas of the unknown.

I have however another [illegible] and greater
[illegible] There are however still higher truths
which are beyond our physical methods of [illegible]

দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বসু বিজ্ঞান মন্দির দানের ঐতিহাসিক বক্তৃতার পাণ্ডুলিপি।

বললেন, বিজ্ঞান মন্দিরের আজীবন সদস্য হিসেবে এককালীন ৫০০ টাকা ও "Life Associate" হিসেবে ২৫০ টাকা বিজ্ঞানমন্দিরকে দান করলে আজীবন বসুবিজ্ঞান মন্দিরের সমস্ত অনুষ্ঠানে দুটি আমন্ত্রণপত্র ও বিজ্ঞান মন্দির থেকে গবেষণা পত্রিকা প্রকাশিত হলে একটি করে পত্রিকা পাওয়া যাবে। দেখা গেল, এতেও বেশ কিছু অর্থসংগ্রহ হলো।

এরই মধ্যে জগদীশচন্দ্র রওনা হলেন বোম্বাই ও পুনা শহরে। উদ্দেশ্য, বিজ্ঞান মন্দিরের জন্য কিছু অর্থসংগ্রহ। সঙ্গে নিলেন বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার যন্ত্রপাতি।

এই উপলক্ষে মহাত্মা গান্ধী "Young India" কাগজে লিখলেন, "All Indians are proud to claim *Sir Jagadish as a countryman because he is not only one of the greatest Scientists of the World but a time will come when his discoveries will revolutionise the industries of the World. The Bose Institute of Calcutta is destined to fill a great place in the World. Now it is for the Citizens of this great city to give the Indian Scientist who has carried the fame of India all over the World such a welcome as will redound to the honour and glory of Bombay."

নাগপুর মেল এসে থামলো বোম্বাই শহরের ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস স্টেশনে। জগদীশচন্দ্র ও পত্নী অবলাদেবীকে স্বাগত জানাতে অগণিত ছাত্র-শিক্ষক ও সাধারণ মানুষ আগে থেকেই স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। ২১শে জানুয়ারী ১৯১৮ তারিখে বক্তৃতার দিন ধার্য হল। রয়্যাল অপেরা হাউজে। বক্তৃতা শুরুর আগে শ্রোতাদের সাথে জগদীশচন্দ্রকে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বাল গঙ্গাধর তিলক বললেন, জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপের জন্য শুধু আমরা ভারতবাসীরা গর্বিত নই, সমস্ত পৃথিবী তাঁর জন্য গর্বিত। জগদীশচন্দ্র "Invisible Light" শীর্ষক বক্তৃতাটি পরীক্ষা সহযোগে শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরলেন। বক্তৃতা সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে গিয়ে ২৫শে জানুয়ারী "The Bombay Chronicle" কাগজ লিখল, "......In his Institution they were ready to pursue in the immediate future

*এ বছরই জগদীশচন্দ্রকে Sir উপাধি দেওয়া হয়।

six different lines of investigation. Large sums of money were needed to enable them to carryout the work so as to be beneficial to their country and their industries……" প্রসংগত উল্লেখ্য; এই বক্তৃতা উপলক্ষে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের জন্য উঠেছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা। এই অভাবনীয় সাড়ায় তৎকালীন "Hindi Punch" পত্রিকা বসু বিজ্ঞান মন্দিরের চিত্র সহযোগে "Well of Knowledge" নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে। তাতে তাঁরা লেখেন; "The people of Bombay—men, women and children—have lost their heart at advent of Sir J. C. Bose and Lady Bose. Thou powerful alchemist ! to coin Rs. 50,000 at one lecture ! we knew him as a wizard in science, but did not realise the witchery of his tongue ! Such wild enthusiasm has never been recorded. Bravo Sir Jagadish, bravo the Bombay worshippers of knowledge, bravo the Bose Research Institute !……"

এরপর জগদীশচন্দ্র বক্তৃতা দিলেন Bombay University-তে। বক্তৃতার বিষয় ছিল "Unity of Life", এই বক্তৃতায়ও অনেক টাকা উঠল। জগদীশ-চন্দ্রের এই বোম্বাই সফর সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে পয়লা ফেব্রুয়ারী Associated Press of India-র প্রতিনিধি লিখলেন, "Sir J. C. Bose's visit has evoked considerable enthusiasm among the educated businessmen of Bombay and a number of people are daily visiting him……"

২৮শে জানুয়ারী পুনা শহরের ছাত্রসমাজ জগদীশচন্দ্রকে সম্বর্ধনা জানালেন। সম্বর্ধনা উপলক্ষে কারুকার্য মণ্ডিত রৌপ্য আধারে সিল্কের কাপড়ে মুদ্রিত আচার্যবন্দনা জগদীশচন্দ্রকে উপহার দেওয়া হয়। উপহার পত্রটির মুদ্রনের ভার নিয়েছিলেন পুনা শহরের "আর্যভূষণ প্রেস"। উপহারটি আজও জগদীশচন্দ্রের যন্ত্রাগারে রক্ষিত আছে। তাতে লেখা,

To

Dr. Sir Jagadish Chandra Bose KT., D.Sc.

Honoured Sir,

You have placed us a deep debt of gratitude by coming

amongst us this evening in response to our humble request. We are aware of the innumerable demands on your precious time, and the knowledge heightens our sense of obligation. Reverent and devout worship of the Guru being a sacred duty with Indian students, we take the opportunity of paying our respects to you......your intense patriotism has done as much to endear your name to us as your greatness in the realm of Science. To have dedicated the hard-earned savings of a life-time to the inauguration of a great national project is a sacrifice worthy of a hero. You have vindicated also the deep spirituality of the Indian mind, its unconcern about worldly gain by proclaiming at the opening ceremony of the Research Institute that the discoveries made at the Institute would at once become the property of the world. May we take the liberty of modestly expressing the hope that although your institution is in far off Calcutta, any students from Poona, who are capable of profiting from it, will also receive welcome from you and that at least a few among us will sit at your feet as their beloved Guru and receive inspiration at your hands ?

In conclusion, we fervently pray to the Almighty to grant you long life to enable you to fully realise all your ideas about your Institution, and make it the centre of research, and thus gain for our country once more the position it formerly held as the teacher of the World.

We are

Sir

Your loving and respectful
students of Poona Colleges

Poona
28th January
1918

এবার কলকাতা ফেরার পালা। ফেরার আগে জগদীশচন্দ্র তাঁর এই সফর সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বললেন; "আমার এই স্বল্পকালীন ভ্রমণের সময় পশ্চিম প্রদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনগণ আমার প্রতি যে প্রভূত পরিমাণ দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করেছেন তার জন্য উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমার পক্ষে কঠিন। আমি অচেনা অতিথি হিসেবে এসেছিলাম, কিন্তু বিদায়লগ্নে আমার মন একান্ত আপন পুরোনো বন্ধুবিচ্ছেদ বেদনার অনুভূতিতে আচ্ছন্ন। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে এবং এমনকি ছাত্রসমাজও আমার বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতি খুবই উদার সমর্থন জানিয়েছেন। আমার জীবনের কর্মপ্রয়াসের মূলে ভরসা হ'ল বিশ্বাস ও আশা। বোম্বাই প্রদেশে ভ্রমণের ফলে এই দুটির ওপর আস্থা আরো অনেক বেড়ে গেল।"

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য; বোম্বের রয়্যাল অপেরা হাউজে ও ধারাবাহিক বক্তৃতা মারফৎ প্রাপ্ত টাকা ছাড়াও বসু বিজ্ঞান মন্দির স্থাপনার উদ্যোগ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত জগদীশচন্দ্র বিপুল অর্থসংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। এই অর্থ সংগ্রহের তালিকা তিনি নিজে প্রস্তুত করেছিলেন। তালিকাটি জগদীশচন্দ্রের ব্যক্তিচরিত্রের দিক থেকেও অনুধাবনযোগ্য। দানের অংক দু'লাখ টাকা থেকে একটাকা পর্যন্ত ছিল। কিন্তু তিনি কোন দাতাকেই অবহেলা করেননি। তালিকাটি প্রস্তুত করেছিলেন টাকার অংকের ভিত্তিতে নয়। প্রাপ্ত তারিখের ভিত্তিতে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য; জনসাধারণের দানের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন; A note that touched me deeply came from some girl students of the Western Province, enclosing their little contribution for the service of our common motherland."

: ১৯১৮ সাল পর্যন্ত প্রাপ্ত দানের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র :

১. এস্. আর. বোমনজী — এক লক্ষ টাকা।

২. মুলরাজ খাটাউ (মুলরাজ খাটাউ জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান মন্দিরের জন্য অন্যত্র টাকা লগ্নী করেছিলেন। শর্ত ছিল; লগ্নীকৃত টাকার শতকরা ৬ টাকা হারে সুদ বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রাপ্য) — ১২ হাজার ২২১ টাকা ১২ আনা ৯ পয়সা [তখনকার পয়সার হিসেবে]

৩.	মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী	দুই লক্ষ টাকা।
৪.	মহারাজা গায়কোয়াড়	৬,২৫০ টাকা (নিয়মিত বার্ষিক)
৫.	জনগণ ও ছাত্র সমাজের দান (বিজ্ঞান মন্দিরের প্রথম মুখপত্রে প্রত্যেক দাতার নাম ও আর্থিক সাহায্যের পরিমান মুদ্রিত আছে)	২১,১৮৯ টাকা
৬.	বোম্বাই সফরের সময় জনগণ ও ছাত্র সমাজের দান। (বিজ্ঞান মন্দিরের প্রথম মুখপত্রে দাতার নাম ও আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ মুদ্রিত আছে)	৪৩,৪৩৫ টাকা

এইসব দান ছাড়াও দান হিসেবে তিনটি নিয়মিত ছাত্রবৃত্তির উল্লেখ রয়েছে মূল দানের তালিকায়।

ইতিমধ্যে জনগণের অভূতপূর্ব সাড়ার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কিছুটা সহানুভূতি-সম্পন্ন হয়েছিলেন। এবার বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রসারণের জন্য সরকার গবেষণাগার সংলগ্ন আরও কিছু জমির ব্যবস্থা করে দিলেন। সেই সঙ্গে ফলিত গবেষণার জন্য সিজবেড়িয়াতে কিছু জমি। ছ'টি ছাত্রবৃত্তিও সরকারের তরফ থেকে দেওয়া হলো। কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র মিঃ প্াইন ঘোষণা করলেন, বসু বিজ্ঞান মন্দিরকে কোনদিন পৌরকর দিতে হবে না। এবার জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞান মন্দিরের মুখপত্র প্রকাশের কাজে হাত দিলেন। বললেন, বিজ্ঞান মন্দিরের নিজস্ব প্রথম মুখপত্র শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। বছরে দুবার। আর তার মানও রয়্যাল সোসাইটির প্রকাশিত মুখপত্রের সমগোত্রীয় হবে। জগদীশচন্দ্রের অনুরোধে মুখপত্র প্রকাশনার দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে ভারত সরকার জগদীশচন্দ্রকে জানালেন; এর পরবর্তী আর্থিক সাহায্য অবশ্যই নির্ভর করবে জনগণের তরফ থেকে বিজ্ঞান মন্দির আরও কত পরিমাণ আর্থিক সাহায্য পাবে তার ওপর।

বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠার পর থেকে জগদীশচন্দ্রের বাকি জীবনে মাঝে কখনও কম, কখনও কিছু বেশী সরকারী সাহায্য এসেছিল। তাতে বিজ্ঞান মন্দিরের কর্মধারা ব্যাহত হয়নি। তবে দেশের জনগণ ও বিজ্ঞানী সমাজের

অকুণ্ঠ সমর্থন বরাবর একই রকম ছিল। জানা যায় তখনকার পত্র-পত্রিকায় ও চিঠিপত্রে। ১৯২৪ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখের "Nature" পত্রিকায় বসু বিজ্ঞান মন্দিরের কার্য-বিবরণী বর্ণনা প্রসঙ্গে পত্রিকা সম্পাদক লিখেছিলেন; The Prime Mtnister paid a tribute to Sir J. C. Bose's achivements as a Scientific worker. The growth of the Bose Institute, proves also that India possesses men of great public spirit......" ১৯২৬ সালের আগষ্ট মাসে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের সরকারী অর্থ সাহায্য বাড়িয়ে দেবার জন্য লণ্ডনের বিজ্ঞানী সমাজ ভারতের গভর্নর জেনারেলকে এক চিঠিতে বলেছিলেন,.........We venture, therefore, to express the opinion that the Government of India will be well-advised to continue and extend its assistance for the expansion of the Institute...... । স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে Sir Charles Sherrington (President of Royal Society), E. F. Starling (Professor of Royal Society), Sir James Frazer F. R. S., Lord Rayleigh F. R. S., Sir Oliver Lodge F. R. S., Sir St. Clair Thomson (President, Royal Socicty of Madicine) ছাড়াও আরো অনেক প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানীরা ছিলেন। এ সব চিঠিপত্র ও সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে সে সময় সরকারী অর্থসাহায্য বাড়েনি। যদিও ১৯২১ সালে বসু বিজ্ঞান মন্দিরকে বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা অনুদান মঞ্জুর করে তদানীন্তন ভারত সরকারের তরফ থেকে বলা হয়েছিল, ভবিষ্যতে অর্থ সাহায্য বাড়ানো হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই এক লক্ষ টাকা অনুদান মঞ্জুর ও ভবিষ্যতে আরও অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতির কারণ সম্পূর্ণভাবেই ছিল সে সময়ের প্রচণ্ড জনমত। জানা যায় ১লা আগষ্ট ১৯২৯ সালে Prof. Vinesকে লেখা জগদীশচন্দ্রের এক চিঠি থেকে। তিনি লিখেছিলেন, "......My lecture at the India office (1920) under the Presidency of Lord Balfour was so great a success, that the then Secretary of state and his Council unanimously agreed in guaranteeing a permanent annual Imperial grant without any condition......" ।

বছর কয়েক বাদে ১৯৩১ সালে ভারত সরকার এক চিঠি পাঠিয়েছিলেন জগদীশচন্দ্রকে। চিঠিতে বলেছিলেন, অনিবার্য কারণে বিজ্ঞান মন্দিরের

আর্থিক সাহায্য কমানো হবে। সংবাদ খবরের কাগজেও বেরিয়েছিল। প্রতিবেদনটির শিরোনাম ছিল, "NO GRANT TO BOSE INSTITUTE"। জগদীশচন্দ্র দুঃখ করে রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন,

১০ই অক্টবর ১৯৩১; বন্ধু,............ আমি নানা কারণে ম্রিয়মান আছি। সরকার হইতে খবর আসিয়াছে যে জ্ঞান বিস্তারের জন্য যাহা প্রাপ্য ছিল তাহা কাটা যাইবে।—কারণ তাহা সখের ব্যাপার মাত্র। আমার অনেক করিবার ছিল তাহা এখন অসম্ভব হইল।"

সেদিন এই সমস্যা মোকাবিলায় প্রথম এগিয়ে এসেছিলেন বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ছাত্র ও কর্মীরা। তাঁদের প্রতিনিধি হিসেবে শ্রীগুরুপ্রসন্ন দাস ও শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র দাস এক চিঠিতে জগদীশচন্দ্রকে লিখেছিলেন,

১১ই আগষ্ট ১৯৩১, স্যার, বসু বিজ্ঞান মন্দিরের গবেষক ছাত্ররা সরকারের অনুদান বন্ধের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সচেতন আছে। এই অবস্থা থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য তারাও চিন্তিত এবং আপনার সহিত সহযোগীতা করিতে বদ্ধপরিকর। তাঁহারা এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যে কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত এবং এ বিষয়ে সর্বদা আপনার সহানুভূতি ও উৎসাহ প্রার্থী। আমরা আপনাকে আরও নিশ্চিত আশ্বাস দান করিতেছি, বসু বিজ্ঞান মন্দিরের গৌরব রক্ষা করিবার জন্য আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।"

বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতি বৃটিশ সরকারের এই অনুদার নীতির কারণ সম্ভবত একটিই। জগদীশচন্দ্র কোন অবস্থাতেই বসু বিজ্ঞান মন্দিরের পরিচালন সমিতিতে সরকারী বা কোন ইংরেজ প্রতিনিধিকে অনুপ্রবেশ করতে দেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন, পরাধীন দেশে বিজ্ঞানের গবেষণা স্বায়ত্বশাসনের ভিত্তিতে করা উচিত। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আর আমলাতন্ত্রের লালফিতার ফাঁস এক সাথে চলা সম্ভব নয়।

জগদীশচন্দ্রের এই বিশ্বাস তাঁর বিভিন্ন সময়ের চিঠিপত্রে পরিস্ফুট। ৫ই মে, ১৯২২ তারিখে শিল্পপতি মুলরাজ খাটাউয়ের এক চিঠির উত্তরে জগদীশচন্দ্র লিখেছিলেন, "আপনি সহজেই অনুধাবন করিতে পারিবেন যে আমি বিজ্ঞান মন্দিরের জন্য কতটা চিন্তিত। কারণ দেশবাসীর ইচ্ছা বিজ্ঞান মন্দির যেন চিরকাল সরকারের নিয়ন্ত্রাধীন না থাকিয়া স্বাধীনভাবে জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে পারে। যদি ইহাকে আমাদের চেষ্টায় চিরস্থায়ী না করিতে সক্ষম হই তবে খুবই অসম্মানজনক হইবে।......"

তদানীন্তন কংগ্রেস ওয়ারকিং কমিটির কোষাধ্যক্ষ শ্রীযমুনালাল বাজাজের লেখা চিঠি সম্পর্কে একটি মন্তব্য করতে গিয়ে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের পরিচালন সমিতিকে জগদীশচন্দ্র বলেছিলেন; "এই মন্দিরটি আমি প্রতিষ্ঠা করিয়াছি এই উদ্দেশ্যে যে ভারতীয়রা বিশ্বের বিজ্ঞানের উন্নতিতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিবে এবং নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইবে। আমি বিশ্বাস করি এই বিজ্ঞান মন্দিরের সত্যিকার উন্নতি সাধন সম্ভব হইবে যদি ইহার পরিচালন ব্যবস্থা ভারতীয়দের দ্বারা হয়। সরকারী নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আবদ্ধ হইলে ইহার গবেষণার উন্নতিতে ব্যাঘাত ঘটিবে। অধিকাংশ দাতারা বিশেষভাবে এই মতে বিশ্বাসী। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত দাতাদের শর্তই ছিল—বসু বিজ্ঞান মন্দিরের পরিচালন ব্যবস্থায় কোন সরকারী নিয়ন্ত্রণ থাকিবে না। রাজ্যের সচিব এবং তাঁর পারিষদরা যখন এই বিজ্ঞান মন্দিরের জন্য "ইম্পিরিয়াল গ্রান্ট" অনুমোদন করিয়াছিলেন তখন তাঁহারা ইহার পরিচালন ব্যবস্থায় স্বায়ত্ত শাসন মেনে নিয়েছিলেন। আমি বিজ্ঞান মন্দিরের পরিচালন সমিতিতে এই নীতি রক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।"

১৯২৭ সালে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুকে লিখেছিলেন,—

"You were kind enough to ask me to visit Delhi; I shall be glad to do so, if you will kindly let me know the best time to come.

You have seen my Institute and realised my ambition to make it a great international centre of Science, entirely under Indian initiative and under Indian administration……"

১৯১৪ সালের বিশ্বপর্যটন শেষে ফেরার পর বসু বিজ্ঞান মন্দিরের জন্য অর্থসংগ্রহ, প্রতিষ্ঠা ও নানা অফুরন্ত কাজে আমরা জগদীশচন্দ্রকে ব্যস্ত থাকতে দেখেছি। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে অতিরিক্ত ব্যস্ততায় কি মহাবিজ্ঞানীর গবেষণা সাময়িক রুদ্ধ হয়েছিল? ভাবলে অবাক হতে হয় ১৯১৮ সালের শেষে বিজ্ঞান মন্দিরের প্রথম মুখপত্র Transactions of the Bose Research Institute প্রকাশিত হওয়ার পর দেখা গেল, তাতে মোট একুশটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে উনিশটি তাঁর পূর্ব গবেষণার সম্প্রসারণ। প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিতে জগদীশচন্দ্র সাহায্যকারী হিসেবে ছাত্রদের নাম উল্লেখ করেছিলেন, যাতে ছাত্ররা বিজ্ঞান মন্দিরের কার্যধারার ধারক হিসেবে নিজেদের চিহ্নিত

করতে উৎসাহী হয়। বাকি কাজ দুটির মধ্যে একটিতে রয়েছে বিস্ময়কর এক আবিষ্কার ও তার বর্ণনা। আমাদের পূর্ববর্ণিত Magnetic Crescograph। অন্যটি জগদীশচন্দ্রের কাজের একটি কৌতুহলদ্দীপক সংযোজন। ফরিদপুরের (অধুনা বাংলাদেশ) "উপাসনারত খেজুর" গাছ। গাছটি লম্বায় ৫ মিটার ও চওড়ায় ২৫ সেঃ মিঃ। খুব সম্ভবত ঝড়ে মাটির সঙ্গে ৬০° ডিগ্রি কৌণিকভাবে গাছটি দাঁড়িয়ে ছিল। ঘটনাচক্রে গাছটির অবস্থান ছিল একটি মন্দির প্রাঙ্গণে। সন্ধ্যায় নিয়মিত মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনির সাথে দেখা যেত গাছটি ক্রমশ মাটির দিকে নীচু হতে শুরু করেছে। যেন নতমস্তকে মন্দিরের বিগ্রহকে প্রণাম জানাচ্ছে। আবার ভোরে দেখা যেত গাছটি আগের অবস্থায় ফিরে গেছে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বহুলোক ব্যাপারটি দেখতে আসতেন। কেউবা আসতেন কৌতুহলী হয়ে। আবার অনেকে আসতেন পুজোর উপাচার নিয়ে, দেবমাহাত্মকে শ্রদ্ধা জানাতে ও মৃত্যুপথযাত্রী রোগীর আরোগ্য কামনা করে। এতে তাঁদের মনস্কাম কতটা সফল হতো জানা নেই, তবে মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক পুরোহিতের আয় মন্দ হতো না। জনরবে 'ধার্মিক' গছটির খ্যাতি যখন খ্যাতির উচ্চ শিখরে, ভীড় সামলান শ্রমসাধ্য ব্যাপারে পর্যবসিত হয়েছে তখন ঘটনাটি জগদীশচন্দ্রের গোচরে এলো। তিনি এই অলৌকিক ঘটনার বৈজ্ঞানিক সত্য নির্ণয়ে এগিয়ে এলেন। অনেক চেষ্টার পর জগদীশচন্দ্র মন্দিরের মালিককে এ ব্যাপারে রাজী করাতে সক্ষম হলেন। তবে গাছটির এই অদ্ভুত আচরণের বৈজ্ঞানিক কারণ প্রমাণের আগে তাঁকে প্রমাণ করতে হলো, এই গবেষণার যন্ত্র ও যন্ত্রী কেউ "ম্লেচ্ছ" নয়। আর তাছাড়া যাকে দিয়ে যন্ত্রটি "ধার্মিক" গাছটির সঙ্গে লাগানো হবে তিনি একজন ব্রাহ্মণ সন্তান।

পরীক্ষায় অনেক অজানা তথ্য জানা গেল। বেরিয়ে এলো এক আশ্চর্য তথ্য। জগদীশচন্দ্র বললেন গাছটি কোন সময়েই "নিশ্চল" হয়ে নেই। হয় নীচু হচ্ছে না হয়ত উঁচু হচ্ছে। সর্বোচ্চ উচ্চতার সময় সকাল সাতটা। তারপর গাছটি ক্রমশ ধীরে ধীরে নীচু হতে থাকে। বিকেল ৩-১৫ মিনিটে সবচেয়ে নীচু হয়। তারপর আবার ধীরে ধীরে উঁচু হতে থাকে। জগদীশচন্দ্র এই বিচিত্র ঘটনাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করতে নানা পরীক্ষা শুরু করলেন। এই অনুসন্ধানের প্রাথমিক প্রয়াস হিসেবে তিনি খেঁজুর গাছটির এই উত্থান পতন বা চলন অন্য গাছেও হয় কিনা খুঁজে দেখলেন। দেখা গেল ফরিদপুর থেকে দু'শো মাইল দূরে হাওড়া জেলার সিজবেড়িয়া গ্রামের একটি খেঁজুর গাছেও

ঠিক এই ধরনের ঘটনা ঘটে। কিন্তু কাছাকাছি কোন মন্দির না থাকায় এর দেবমাহাত্ম্য প্রচার হয়নি। জগদীশচন্দ্র বুঝলেন ফরিদপুরের খেজুর গাছটির ঘটনা অনন্য নয়। উপলব্ধি করলেন গাছের এই প্রাত্যহিক চলন পরিবেশের কোন কিছুর নিয়মিত পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। বেশ কিছু পরীক্ষার পর তিনি বললেন এই নিয়মিত পরিবর্তনটির কারণ হলো পরিবেশে তাপের নিয়মিত হ্রাস-বৃদ্ধি। ক্রমবর্ধমান তাপের সংগে সমতা রেখে গাছটি নীচু হতে থাকে ও তাপমাত্রা কমতে থাকলে গাছটির মাথাও আস্তে আস্তে উঁচু হতে থাকে। তিনি বললেন, গাছের এই চলন গাছটির শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার উপর তাপের প্রভাবের ফল। গাছের মূল মাটির নীচে চলে (positively geotropic), কাণ্ড আকাশের দিকে যায় (negatively geotropic)। গাছটি ছিল বেশ হেলানো। তাই নিয়ম অনুসারে গাছটি তার মাথাকে অর্থাৎ কাণ্ডের অগ্রভাগকে ক্রমাগত উঁচু করার চেষ্টা করবে। কিন্তু এক্ষেত্রে পরিবেশের তাপবৃদ্ধি গাছের কাণ্ডের, মাথা উঁচু করার প্রবণতাকে বাধা দেয়। ফলে গাছের মাথা নীচু হয়।

উদ্ভিদের ওপর তাপমাত্রার প্রভাব সম্পর্কে জগদীশচন্দ্র আরও বেশ কিছু গবেষণা করেছিলেন। তারমধ্যে দুটি গবেষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম গবেষণাটি ফুল ও গাছের বৃদ্ধি সংক্রান্ত। অন্যটি সমাজের আর একটি কুসংস্কার দূরীকরণের প্রশ্নে।

শাপলাফুল রাত্রে ফোটে। দিনে ফোটে না। "কুমুদিনীর এই নিশি-জাগরণের" কারণ সম্পর্কে তখনকার বিজ্ঞানীদের কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিলনা। তাঁদের ধারণা সম্পর্কে জগদীশচন্দ্রের মন্তব্য বড় কৌতূহলোদ্দীপক। জগদীশচন্দ্র এক ভাষণে কৌতুক করে বলেছিলেন, "উদ্ভিদের নিদ্রা ও জাগরণ সম্বন্ধে গত অর্ধশতাব্দী ধরিয়া বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের অনেকে মনে করেন যে ঘুমান বা জাগা উদ্ভিদের সম্পূর্ণ খেয়ালমাত্র।

কুমুদ রাত্রে ফোটে এবং দিনে বন্ধ হয়—কারণ সে এইরূপই করিয়া থাকে; আর পদ্ম দিনে ফোটে রাত্রে মুদিয়া যায়, কারণ পদ্ম এ বিষয়ে কুমুদের ঠিক উল্টা করে। একবার এক প্রশ্ন উঠিয়াছিল—

তিলঞ্চ সরিষা চৈব উভয়ে তৈলদায়িকে।
তর্পণে তিল দরকারং সরিষা নাস্তি কি কারণে॥

তাহার উত্তর আসিয়াছিল—

ঢাকশু ঢোলকশ্চৈব
উভয়ে বাদ্যদায়িকে।
গাজনে ঢাক দরকারং
ঢোল নাস্তি যে কারণে॥

কুমুদ ও পদ্মের ফোটা না-ফোটা সম্বন্ধে অনেকটা এই রকমের কৈফিয়ৎ মিলিত।"

এই ফুল ফোটার কারণ অনুসন্ধানের প্রশ্নে প্রথমেই একটি চিন্তা জগদীশ-চন্দ্রের মনে এসেছিল। শাপলার এই পাপড়ি খোলা ও বন্ধ হওয়া পৃথিবীর আকর্ষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ফলে ঘটছে কিনা? স্বাভাবিকভাবে ফোটা ফুলের পাপড়িগুলো যদি ওপরের দিকে যায় তবে ফুলটি বন্ধ হয়ে যাবে। আর যদি নীচের দিকে নামে তবে ফুলটি আরও প্রস্ফুটিত হবে। মাধ্যাকর্ষণের উত্তেজনায় যদি ফুলের ফোটা নির্ভর করে তবে ফুলটির মাথা নীচের দিকে রাখলেই বিপরীতক্রিয়া দেখা যাবে। কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গেল, শাপলাফুল সোজাভাবেই থাক আর উল্টোভাবেই থাক তাতে ফুল ফোটার সময়ের কোন হেরফের হয় না। অন্য আর একটি পরীক্ষায় দেখলেন, আলোর ক্রিয়ার ওপরও ফুলফোটা নির্ভর করে না। এবার জগদীশচন্দ্র তাঁর Diurnal phytogragh যন্ত্রকে এই পরীক্ষার উপযোগী করে শাপলাফুলের পাপড়ির ধারাবাহিক লিপি-চিত্র নিলেন। সেই সাথে একই যান্ত্রিক ব্যবস্থায় ধারাবাহিক তাপমাত্রা পরি-বর্ত্তনের লিপিও। দেখা গেল শাপলা ফুলের ফোটা ও বন্ধ হওয়া একমাত্র তাপের প্রভাবেই হয়। পরীক্ষায় প্রমাণ করে দেখালেন, দিনের বেলায় যদি শাপলাফুলের কুঁড়ির চারদিকে রাত্রের তাপমাত্রা বজায় রাখা যায় তবে দিনেও শাপলাফুল ফুটতে পারে। এই গবেষণার বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, "একখণ্ড লৌহকে সমলম্ব একখণ্ড তাম্রের সহিত সংলগ্ন করিয়া উভয়কে উত্তাপ দিতে আরম্ভ করা হইল; তাপে উভয়েই বাড়িবে, কিন্তু সমতাপে তাম্র সমলম্ব লৌহ অপেক্ষা অধিক বাড়ে। অথচ প্রত্যেকটি পৃথক পৃথক বাড়িবার জো নাই বলিয়া ফলে সমস্তটি ধনুকের ন্যায় বাঁকিয়া যাইবে, যেটি বেশী বাড়ে সেইটি থাকিবে বাহিরে, যেটি কম বাড়ে সেইটি থাকিবে ভিতরে। সেইরূপ গাছের একদিক যদি আর একদিক অপেক্ষা বেশী বাড়ে তবে গাছটি বাঁকিতে থাকিবে, পাতার একদিক আর দিকের অপেক্ষা বাড়িলে পাতাটি ধনুকের মত হইবে।

বাহিরের উত্তাপ বা শৈত্যের সহিত গাছের বৃদ্ধির কোন সম্পর্ক আছে কি-না দেখিবার জন্য নবনির্মিত "ম্যাগনেটিক ক্রেস্কোগ্রাফ" যাহা অত্যাধিক শক্তিশালী "অনুবীক্ষণের দৃষ্টির" অতীত গাছের বৃদ্ধিকে কোটিগুণ পরিবর্দ্ধিত করিয়া চোখের সম্মুখে ধরে, সেই ক্রেস্কোগ্রাফে একটি গাছ বসান হইল ; গাছ তাহার সাধারণ অবস্থায় বাড়িতে লাগিল। ঠাণ্ডা বরফজল চারদিকে দেওয়া হইল। দেখিতে দেখিতে উহার বৃদ্ধি একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। এইবার বরফজল ফেলিয়া গরমজল দেওয়া হইল। গাছ তাহার সহজ অবস্থা অপেক্ষা অধিকতর দ্রুতবেগে বাড়িতে লাগিল।

বাহিরের উত্তাপে কুমুদের পাপড়িও বাড়িতে থাকিবে, কিন্তু এই পাপড়ির বাহিরের সবুজ দিকটা ভিতরের সাদা দিকটা অপেক্ষা বেশী কমণীয়। সুতরাং বাহিরটা ভিতর অপেক্ষা বেশী বাড়িবে, ফলে সমস্ত পাপড়িটা ধনুকের আকার লইবে—সবুজ দিকটা থাকিবে বাহিরে, সাদা দিকটা থাকিবে ভিতরে। সুতরাং ফুলটি একেবারে মুদিয়া যাইবে। দিনে ফোটে এইরূপ একটি ফুল লওয়া হইল, দেখা গেল পাপড়ির ভিতরটা উহার বাহির অপেক্ষা অধিক কোমল; সুতরাং এক্ষেত্রেও পাপড়িটি বাঁকিবে। তবে এবার উহা উল্টাদিকে বাঁকিবে। ফলে বাহিরের উত্তাপের প্রভাবে উহা আরও খুলিয়া যাইবে। সুতরাং একই উত্তেজনা যে ভিন্নজাতীয় পুষ্পকে বিভিন্নরূপ প্রদান করে তাহা কেবলমাত্র তাঁহাদের আভ্যন্তরিক গঠন বৈচিত্র্যের ফলে"।

এ পর্যায়ের অন্য গবেষণাটি হল একটি আম গাছকে নিয়ে। গাছটির অবস্থিতি ছিল কলকাতার কাছেই। খবর এলো আম গাছটির একটি ডাল থেকে ক্রমাগত ফোঁটা ফোঁটা জল নীচে পড়ছে। শুধু দিনের বেলায়, রাত্রে নয়। এ ব্যাপারে গ্রামবাসীরা আতঙ্কিত। তাঁদের ধারণা ঘটনাটি গ্রামের পক্ষে অমঙ্গল-সূচক। যেহেতু এই "কাঁদুনে আমগাছটি" গ্রামের অধিবাসীদের কাছে অমঙ্গল-সূচক তাই এ গবেষণায় জগদীশচন্দ্রকে কোন সামাজিক বাধার সামনে পড়তে হলো না। তিনি বেশ কিছু পরীক্ষার পর বললেন, গাছটির ডালের ভেতরের খানিকটা অংশ কোন কারণে পচে গিয়েছে। পচা জায়গাটিতে গাছের ক্ষরিত রস জমা হয়ে বাকলের কোন সরু ফুটো দিয়ে রস ফোঁটা ফোঁটা নীচে পড়ছে। এতে গ্রামবাসীর আতঙ্কিত হবার কোন কারণ নেই। এই রস শুধু দিনে বেরুবার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বললেন; দুপুরের উত্তাপে গাছটির বাকলের সজীব কোষের সক্রিয়তা বেড়ে যায় ও তাদের পাশ্বর্চাপে বেশী পরিমান রস

পচা জায়গাটিতে জমা হয়। সেই রস উপচে নীচে পড়ে। ক্রমশঃ পড়ন্ত বিকেলে তাপমাত্রা কমলে এই রস উপচে পড়া বন্ধ হয়।

১৯১৮ সালের শেষ থেকে মাস কয়েকের মধ্যে বেশ কয়েকটি গবেষণাপত্র ছাপা হল রয়্যাল সোসাইটির মুখপত্রে। বেশীরভাগই জগদীশচন্দ্রের নব আবিস্কৃত বিস্ময়কর Magnetic Crescograph যন্ত্রের পরীক্ষালব্ধ ফলাফলকে কেন্দ্র করে। এ পর্যায়ে জগদীশচন্দ্র গাছের আলোকানুবর্তিতা নিয়েও কাজ করেন। তখনকার বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল গাছের কাণ্ড ও মূলের আলোর অনুভূতি ভিন্ন। গাছের কাণ্ডে একদিক থেকে আলো দিলে কাণ্ড ক্রমশ আলোর দিকে সরে আসে কিন্তু শেকড়ে আলো দিলে ভিন্ন প্রতিক্রিয়ায় শেকড় বিপরীতগামী হয়। কিন্তু কাণ্ড বা মূলের অগ্রভাগে যদি চারদিক থেকে সমান-ভাবে আলো ফেলা যায় তবে গাছের কোন অংশই বেঁকে যায় না। তাঁরা আরও লক্ষ্য করেছিলেন অনেক সময় গাছের কাণ্ডে একদিক থেকে আলো দিলে কাণ্ড আলোর বিপরীত দিকে বেঁকে যায় ও শেকড় আলোর দিকে আসে। উদ্ভিদের এই পরস্পর-বিরোধী কার্যকলাপের কোন ব্যাখ্যা তখন জানা ছিল না। এ বিষয়ে জগদীশচন্দ্রের গবেষণা নূতন কতগুলো সিদ্ধান্ত খুঁজে বার করলো। তিনি বললেন, মূল ও কাণ্ডের অগ্রভাগে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় তা মূলতঃ অভিন্ন। তবে আলোর উত্তেজনায় কাণ্ড বা মূলের চলন অনেকগুলো শর্তের ওপর নির্ভরশীল। যেমন মূল ও কাণ্ডের কোষ সমূহের সংবহতা (Conduc tivity), আলোর তীব্রতা, সময় ইত্যাদি। তিনি আরও বললেন; আলোকরশ্মি যখন একদিক থেকে এসে মূল বা কাণ্ডের যে বিশেষ অগ্রভাগে সরাসরি পড়ে সেখানে দু'ধরনের উত্তেজনা সৃষ্টি হতে পারে। প্রথমটি প্রত্যক্ষ উত্তেজনা ও অন্যটি পরোক্ষ উত্তেজনা। প্রত্যক্ষ উত্তেজনায় উদ্ভিদকোষের রসস্ফীতি (turgidity) কমে। ফলে উদ্ভিদের ঐ বিশেষ অংশে সঙ্কোচন দেখা যায় ও কোষের বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়। আলোর উত্তেজনা প্রবাহের কোন ধরাবাধা নিয়ম নেই। উত্তেজনা ধীরগতিতে কখনো লম্ব আবার কখনো আড়ভাবে উদ্ভিদকোষে প্রবাহিত হয়। প্রবাহের গতির হারও কোষের সংবহতা; আলোর তীব্রতা ও সময়ের তারতম্যের ওপর একান্ত নির্ভরশীল। পরোক্ষ উত্তেজনায় উত্তেজনা প্রবাহের গতিবেগ খুব দ্রুত হয়। ফলে কোষের রসস্ফীতির পরিমান বাড়ে ও কোষের প্রসারণ ঘটে। সেই সঙ্গে বৃদ্ধির হারও বাড়ে। সুতরাং মূল বা কাণ্ড আলোর উত্তেজনায় কোন্‌দিকে বেঁকে যাবে তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করবে

বর্ধনশীল অংশে, (growing region) প্রত্যক্ষ উত্তেজনা না পরোক্ষ উত্তেজনার প্রাধান্য বেশী তার ওপর। জগদীশচন্দ্র উপসংহারে বললেন, যদি দেখা যায় আলোর উত্তেজনায় গাছের কাণ্ড বা মূল আলোর দিকে বেঁকে গেছে, তাহ'লে বুঝতে হবে কাণ্ড বা মূলের অগ্রভাগের বর্ধনশীল অংশের যে দিক আলোর দিকে পড়ে (Proximal end) সেখানে প্রত্যক্ষ উত্তেজনার প্রাধান্য আছে; অপরপক্ষে উল্টোদিকে (distal end) পরোক্ষ উত্তেজনা আছে। প্রত্যক্ষ উত্তেজনার ফলে উদ্ভিদে সঙ্কোচন দেখা যায় ও পরোক্ষ উত্তেজনায় প্রসারণ ঘটে। এই পরস্পর বিরোধী উত্তেজনার সংযোগে কাণ্ড বা মূল আলোর দিকে বেঁকে যায় (Positive Curvature)। মূল বা কাণ্ডের বিপরীত দিকে (Negative Curvature) যাওয়ার অর্থ হল সরাসরি অংশে (Proximal end) পরোক্ষ উত্তেজনার প্রাধান্য ও বিপরীত দিকে প্রত্যক্ষ উত্তেজনার উপস্থিতি। অন্য একটি পরীক্ষার সাহায্যে গাছের আলোকানুবর্তিতার ভিন্ন আর একটি প্রতিক্রিয়ার কথা বললেন। গাছের কাণ্ডে একদিক থেকে আলো দিলে প্রথমে কাণ্ডটি আলোর দিকে ও শেকড় বিপরীত দিকে যায়। ক্রমশ আলোর স্থায়িত্ব ও তীব্রতা বাড়ালে বেঁকে যাওয়া গাছটি সোজা হয় ও ধীরে কাণ্ডটি আলোর বিপরীত দিকে চলে যায়। গাছের শেকড়ও বিরূপ ভূমিকা পালন করে। জগদীশচন্দ্র এর কারণ হিসেবে বললেন, পরোক্ষ উত্তেজনার প্রভাব প্রত্যক্ষ উত্তেজনার দ্বারা প্রশমিত হয়। ফলে কোন উত্তেজনারই প্রাধান্য থাকে না তাই গাছটি সোজা হয়। পরে ক্রমশ উল্টোদিকে (Distal end) প্রত্যক্ষ উত্তেজনার প্রাধান্য বাড়ে। ফলে গাছের কাণ্ডটি আলোর উল্টোদিকে বেঁকে যায়। গাছের শেকড় আলোর দিকে আসার ব্যাখ্যাও তিনি একই সূত্রে ব্যাখ্যা করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বর্তমানে উদ্ভিদের আলোকানুবর্তিতা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কাণ্ডের বা মূলের অগ্রভাগে উৎপন্ন এক ধরণের হরমোনকে (অক্সিন) দায়ী করা হয়। বিজ্ঞানীরা বলেন, কাণ্ড বা মূলের অগ্রভাগে অক্সিন তৈরী হয়ে বর্ধনশীল অংশে নেমে আসে। কিন্তু উদ্ভিদের যে অংশে আলো পড়ে সেই অংশে হয় অক্সিন নষ্ট হয় কিম্বা সেখানকার অধিকাংশ অক্সিন বিপরীত দিকে চলে যায়। অক্সিনের এই অসম বন্টনের ফলে কাণ্ডের ক্ষেত্রে (distal end) বৃদ্ধি অধিকতর হয়। এর ফলে কাণ্ডের অগ্রভাগ আলোর দিকে বেঁকে যায় (Positive Phototropic Curvature)। কিন্তু মূলের ক্ষেত্রে দেখা গেছে

যে দিকে অক্সিনের পরিমাণ বেশী সেদিকে বৃদ্ধি কম হয়। ফলে মূল আলো থেকে দূরে সরে যায় (Negatively Phototropic)। এর কারণ হিসেবে বলা হয় মূল কাণ্ডের চেয়ে অধিকতর স্পর্শকাতর। তাই খুব অল্প পরিমাণ অক্সিনের উপস্থিতিতে বৃদ্ধি বেশী হয় ও অক্সিনের পরিমাণ বাড়ালেই বৃদ্ধি হ্রাস পায়।

জগদীশচন্দ্রের এই সাম্প্রতিক আবিষ্কারের ফলাফল ইয়োরোপে প্রশংসিত হচ্ছে—খবর এসেছে। জগদীশচন্দ্র অনুভব করলেন তাঁর এই নবলব্ধ মতবাদকে স্থায়ীরূপ দিতে প্রয়োজন ইয়োরোপ যাত্রা। কিন্তু সবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে ইয়োরোপ যাত্রা কতটা ফলপ্রসূ হবে তা নিয়ে জগদীশচন্দ্র ভাবনাচিন্তা শুরু করলেন। অবশেষে তিনি ইয়োরোপে যথাযথ যাওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে করলেন। লণ্ডন পেঁছে উপলব্ধি করলেন এ পদক্ষেপ যথাযথ হয়েছে। জগদীশচন্দ্র প্রথম বক্তৃতা দিলেন ইণ্ডিয়া হাউজে ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে। বক্তৃতার সঙ্গে নব আবিস্কৃত ম্যাগনেটিক ক্রেস্কোগ্রাফ যন্ত্রের বিভিন্ন পরীক্ষাও দেখালেন। এই দিনের পরীক্ষা প্রদর্শন ও বক্তৃতার প্রতিক্রিয়া জানা যায় তখনকার লণ্ডনের পত্রিকাগুলোতে। ১৭ ডিসেম্বর ১৯১৯ তারিখের 'Morning Post' কাগজ লিখল, "Sir Jagadish Chandra Bose had many interesting things to tell on English audience in the course of a lecture on plant Physiology which he delivered yesterday at the India office, in the presence of Mr. Balfour, Mr. Montagu (Secretary of State for India) and others, একই তারিখের Daily Chronicle কাগজ জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা উদ্ধৃত করে লিখল,……Sir Jagadish pointed out that the growth of a plant was thus made subservient to the will of the grower, and by experimenting in this direction in regard to agriculture discoveries of vast importance might be made. By the use of the Crescograph, he added, there was no need to wait a whole season as at present to witness the result of experiments……"

১৮ই ডিসেম্বর Times Educational Supplement লিখল, "The most eminent man of science modern India has produced,

Sir Jagadish Chandra Bose, is again in this country ; and on Tuesday afternoon, with Mr. A. J. Balfour in the chair; gave a lecture with demonstrations at the India office on his discoveries and the work of his Research Institute at Calcutta…………In a general survey of educational changes in his last quinquennial report Mr. Sharp noted in respect to courses a growing recognition of the claims of Science, illustrated by the appointment of Science Inspectors, the creation of a Faculty of Science in the University of Bombay the completion of the Royal Institute of Science there, the popularity of Science courses in the Punjab etc. TO THESE CHANGING CONDITIONS SIR JAGADISH BOSE HAS INFLUENTIALLY CONTRIBUTED. Indians are justly proud of the possession of a few men who havé gained world wide recognition in their particular fields of activity, and this pride reacts strongly upon public opinion…"

পরবর্তী বক্তৃতা লীড্‌স্‌ বিশ্ববিদ্যালয় ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় মিউজিয়ামে। বক্তৃতার প্রস্তুতিপর্ব শুরু হল। ইতিমধ্যে ১৭ই ফেব্রুয়ারী এবারডীন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য J. Arthur Thomson এক চিঠিতে জানালেন, At the meeting of our Senate this evening it was resolved, to my great joy, to offer you the Honoray Degree of L. L. D on account of your great contributions……"

২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে Edinburgh Indian Association প্রতিষ্ঠিত হয়। ১১ নং George Square-এ। এই সমিতির সভাপতি শ্রী ভি. কে. পরমানাগমের অনুরোধে জগদীশচন্দ্র উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জগদীশচন্দ্র ও অবলা দেবী সভায় ঢোকামাত্র উপস্থিত ভারতীয়দের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়। জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক জয়যাত্রাকে স্বাগত জানাতে সমবেত দু'শোর বেশী ভারতীয় 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দিতে থাকেন। কয়েক মিনিটের জন্য সভাস্থল ছোট্ট একটি জাতীয় উৎসবে রূপান্তরিত হয়। ২৫শে ফেব্রুয়ারী জগদীশচন্দ্র লীড্‌স্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দিলেন।

অক্সফোর্ড মিউজিয়ামের বক্তৃতার ঘোষণা কাগজে বেরুল। ঘোষণায় বলা হল, "We are glad to be able to announce that the distinguished Indian Scientist, Sir J. C. Bose, has consented to give a public lecture in Oxford. The lecture will be delivered under the auspices of the school of Botany, in the large Lecture room at the University Museum, at 5-30P.M. on Friday March 5."

অক্সফোর্ডের বক্তৃতাও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেল। অক্সফোর্ড ম্যাগাজিনে প্রশংসাসূচক সম্পাদকীয় প্রকাশিত হল। চারদিক থেকে প্রস্তাব উঠল জগদীশচন্দ্রকে রয়্যাল সোসাইটির সভ্য করা হোক। রয়্যাল সোসাইটির কাউন্সিলও জগদীশচন্দ্রের নাম প্রস্তাব করলেন। ঠিক এ সময়ে বিচিত্র এক প্রশ্ন তুললেন সেই প্রবীন জীববিজ্ঞানী অধ্যাপক ওয়ালার ও তাঁর মতাদর্শী কয়েকজন বিজ্ঞানী। তাঁরা খবরের কাগজে এক বিবৃতিতে বললেন; যন্ত্রের সাহায্যে দশলক্ষগুণ বড় করে গাছের বৃদ্ধি মাপা মানুষের সৃষ্ট যন্ত্রে সম্ভব নয়। আর বৃদ্ধির যে তরঙ্গলিপি জগদীশচন্দ্রের যন্ত্রে পাওয়া যাচ্ছে তা নিশ্চিতভাবে কোন যান্ত্রিক অপকৌশলের সাহায্যে দেখানো হচ্ছে। ভাবতে আজ অবাক লাগে এই উদ্দেশ্যমূলক বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আশ্চর্যজনকভাবে জগদীশচন্দ্রের প্রশংসামুখর রয়্যাল সোসাইটি কাউন্সিলের সদস্যরাও বেঁকে বসলেন। রয়্যাল সোসাইটির তদানীন্তন সভাপতি হঠাৎ এক বিবৃতি প্রকাশ করে বললেন, প্রবীন অনেক জীববিজ্ঞানী এখনো ঠিক মেনে নিতে পারছেন না জগদীশচন্দ্রের যন্ত্রপাতি ও তাঁর পরীক্ষা। তাই জগদীশচন্দ্রকে রয়্যাল সোসাইটি কর্তৃক নিয়োজিত কমিটির কাছে যন্ত্রের সফল পরীক্ষা দেখাতে হবে। কমিটির সদস্যরা হলেন Profs. Bayliss, Sir W. Bragg, Donnan, Blackman ও Lord Raleigh।

সদস্যদের মনোনীত স্থানে জগদীশচন্দ্রকে পরীক্ষা দেখাতে রাজী হতে হলো। যদিও ১১ই মার্চ ১৯২০ তারিখে রয়াল সোসাইটি অব মেডিসিনে "Plant and Animal Response" শীর্ষক বক্তৃতাকালে জগদীশচন্দ্র তাঁর যন্ত্রের সার্থক পরীক্ষা দেখান ও তা সর্বজনগ্রাহ্য হয়। একদিন নয়, বেশ কয়েকদিন ধরে জগদীশচন্দ্র যন্ত্রের নানা পরীক্ষা দেখালেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জগদীশচন্দ্রের এই ক্রেস্কোগ্রাফ যন্ত্র নিয়ে পরবর্তীকালেও প্রশংসামুখর

সমালোচনা কাগজে বেরিয়েছিল। ১৩ই জুলাই ১৯২৯ সালের Spectator পত্রিকা বসু বিজ্ঞান মন্দিরের কার্যধারা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিল, ...All the world depends for its physical existence on the growth of plant life, which occurs so slowly that until Sir Jagadis invented the crescograph with its fifty million (?) magnification, we were unable to discern the subtler reactions occurring in vegetable tissues. Now a whole new sphere of knowledge is opened up and we are confident that the Bose Institute will make a rich contribution to the welfare of mankind. As Faraday said when a politician asked him of what practical value his induction coil would be, "one day you will be able to tax that spark !"

কমিটির তরফ থেকে সরকারী বিবৃতি প্রকাশিত হওয়ার আগেই কমিটির অন্যতম সদস্য Prof. F. G. Donnan জগদীশচন্দ্রকে এক চিঠিতে বললেন, 23, Woburn Square, W. C. April 26th, 1920. ......I congratulate you very heartily on the magnificent work which you have done and continue to do, and on the splendid Research Institute which you have created. You have indeed performed already a noble work in the cause of Science in general and of Science in India in particular. I well remember your early and pioneering work on the reflection and refraction of short electric waves, and the hearty praise and welcome which that work received at the meeting of the British Association at Liverpool in 1896. Even since that time I have personally always regarded you as the chief pioneer of research in India, and I think that future generations will corroborate this view...."

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, Prof F. G. Donnanএর চিঠিতে জগদীশচন্দ্রের পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণার স্বীকৃতির কিছু উল্লেখ আমরা দেখতে পাচ্ছি। এ বিষয়ে ইতালীয় বিজ্ঞানী Prof Federico S. Bassoli ও জগদীশচন্দ্রের

১৯২৩ সালের পত্রালাপে তা আরও সুস্পষ্ট। পত্রালাপে পদার্থবিদ জগদীশচন্দ্র যে মার্কণির পূর্বাগত—একথা সংশয়হীনভাবে প্রমাণিত হয়েছে। কারণ মার্কনি বেতারের পেটেন্ট নেন ১৮৯৬ সালে। পাঠকদের উদ্দেশ্য সেই গুরুত্বপূর্ণ পত্রালাপ তুলে ধরছি—

From : Federico S.
Bassoli
Modena, 11 Oct. 1923
Viala R. Elena 12
Italy

Sir

In the book "Wireless Telegraphy and Hertzian Waves" by S. R. Bottone (Whittaker Co., London, 1910) on p. 50, I have found a very interesting information for my work; that is to say a little report of experiments about "the possibility of discharging a pistol or firing a mine from a distance without any intermediary but that of the atmospheric medium" made by you.

You can easily understand the great importance that have historically for me your experiments, as they would be the "first radiodynamical" experiments in the world, and the "embryo" of this marvelous branch of radio-dynamics.

As Bottone's report is not much large and detailed, and I have not been able to find any other part more particulars about the experience you have done, I shall be grateful to you of every information.

Very truly yours
F. S. Bassoli

এ চিঠির উত্তরে জগদীশচন্দ্র লিখেছিলেন,

From : Sir J. C. Bose

Dear Sir,

Your letter dated 11th October has been redirected to me

to Londan. I have been lecturing in Europe on my new discoveries.

As regards your inquiry, the short account given by Bottone is substantially correct. The public demonstration was given in 1894-95 at the Calcutta Town Hall when the Lt. Governor of Bengal was present. It was reported in the press, and I saw an account of it given in some Italian journals also. I am sorry that I have no other papers with me on the subject.

You will find some of my researches described "Hertzian waves and Wireless Telegraphy" by Pioncare, also in the Proceedings of Royal Society of London 1895—1900. My invention of receivers made of Galena rendered transmission to a distance possible. This invention would be found among 'the list of patents issued in Great Britain and in America.

Very truly yours

J. C. Bose

From : Federico S. Bassoli

Modena, Li 20/11/1924

Viala R. Elena 12

Italy.

***According to your statement, the public demonstration of your experiment referred by Bottone was given in 1894—95, before first Marconid's experiments ?**

Very truly yours

Sd/Federico S. Bassoli

জগদীশচন্দ্রের ম্যাগনেটিক ক্রেস্কোগ্রাফ ও তার পরীক্ষা সম্পর্কে তদন্তকারী কমিটির সুচিন্তিত অভিমত চৌঠা মে (১৯২০) লণ্ডন টাইমস্ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই প্রকাশিত মন্তব্য ও তার পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে

জগদীশচন্দ্র ১৯২৮ সালের ৯ই অক্টোবর তারিখে Statesman পত্রিকায় অতীত বাধা বিপত্তি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলেন, "......An enquiry was therefore undertaken by a Committee of the Fellows of the Royal Society including Sir William Bragg and Sir William Bayliss. The members of the committee reported in the "Times" of May 4, 1920, that they were satisfied that the growth of the plant and its response to stimulation were correctly recorded by my instruments at a magnification of one to ten million times. Inspite of this clear statement of the highest Scientific authorities, attempts are persistently made to cast doubt on demonstrated facts. My stay in the continent was prolonged for the purpose of allowing the leading authorities to verify all my results......"

১৩ই মে ১৯২০ সাল। রয়াল সোসাইটিতে জগদীশচন্দ্রের নাম চূড়ান্তভাবে মনোনীত হল। ২০শে মে আনুষ্ঠানিকভাবে জগদীশচন্দ্র রয়াল সোসাইটির সদস্যরূপে বৃত হলেন।

লন্ডনে আরও দু একটি বক্তৃতার পর জগদীশচন্দ্র প্যারিসে গেলেন। শারীর বিজ্ঞান কংগ্রেসে যোগ দিতে; সরবোর্-এ ও শারীর বিজ্ঞান কংগ্রেসে জগদীশচন্দ্র তাঁর যন্ত্রের পরীক্ষা দেখালেন। এ সব বক্তৃতায় অধ্যাপক ওয়ালার স্বয়ং উপস্থিত থেকে তাঁর সেই পুরোনো দাবী তুলে বলেছিলেন, গাছের বৃদ্ধি এত বর্ধিত আকারে নেওয়া মানুষের সৃষ্ট যন্ত্রে সম্ভব নয়। কিন্তু উপস্থিত বিজ্ঞানীরা একবাক্যে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার ও বক্তব্যকেই সত্য বলে মেনে নিয়েছিলেন।

পরবর্তী ভ্রমণসূচী বার্লিন। কারণ তাঁর অনেক মতবাদ প্রসিদ্ধ জার্মান বিজ্ঞানী হেবারল্যানটের পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের পরিপন্থী। সার্বজনীন স্বীকৃতির প্রশ্নে জগদীশচন্দ্র বার্লিন গেলেন। তাঁর বৈজ্ঞানিক মতবাদ ও পরীক্ষাপ্রণালী শ্রদ্ধার সঙ্গে জার্মান বিজ্ঞানীরাও মেনে নিলেন। এই সফরের অন্তিম লগ্নে বার্লিন বোটানিক্যালগার্ডেনের অধ্যক্ষ Prof Goebel জগদীশচন্দ্রের সম্মানে একনৈশভোজের আয়োজন করেন। বহু গণ্যমান্য জার্মান বিজ্ঞানী সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। জগদীশচন্দ্রের সাথে ছিলেন শ্রীমতী অবলা

বসু ও ছাত্র জ্যোতিপ্রকাশ সরকার। নৈশভোজ উপলক্ষে Prof Haberlandt বললেন, The same old Indian spirit which has carried to its utmost limits metaphysical speculation and introspection, wholly withdrawn from the world of sense, has now in its modern representative brought forth an extraordinarily developed faculty of observation and ecstasy in Scientific experimentation. অধ্যাপক Goebel বললেন, ……He is a most worthy representative of his country…… When I travelled eastwards the last time…… I intended to pay a visit to India and especially to the famous Bose Institute at Calcutta. But Germans were not allowed then to enter India! ……We believe with him that Science has an international task…… Ladies and gentlemen! We all are delighted by Sir J. C. Bose's lecture…… Let us drink to the health of our Indian guests. প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বার্লিনের এই বক্তৃতা সম্পর্কে পরবর্তী সময়ে জগদীশচন্দ্র বলেছিলেন, I therefore went to Berlin without notice and drove directly to the celebrated Physiological Institute at Dalhem, presided over by the eminent and vetern Physiologist Haberlandt. I was received with marked coldness and suspicion as having come from the Allied countries; the anti-foreign feeling was then at its highest. I only asked for fairplay. Let all the leading Scientists be invited and I would be ready to meet the shock of hostile criticisms. A lecture was organised and a miracle happened, for in less than 15 minutes the whole andience gave expression of their warmest appreciation……

কিছু দিনের মধ্যেই জগদীশচন্দ্র লন্ডন ফিরলেন। বিভিন্ন জায়গায় পরীক্ষা দেখাতে গিয়ে পথে কিছু যন্ত্রপাতি অচল হয়ে গেছে। বেশ কিছুদিন কেটে গেল যন্ত্র মেরামতির কাজে ও বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রয়োজনে সরকারী আমলা ও প্রথিতযশা বিজ্ঞানীদের সাথে যোগাযোগ করতে। দেশে ফেরার আগে

জগদীশচন্দ্র Stockholm এর ফিজিক্যাল সোসাইটি থেকে আমন্ত্রণ পেলেন। ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯২০ সাল। জগদীশচন্দ্র Stockholm শহরে তাঁর মতবাদের ওপর বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতা শেষে উপস্থিত বিজ্ঞানীদের মুখপত্র হিসেবে Physical Society of Stockholmএর সভাপতি Prof Carl Benedicks বললেন, I now have to move a vote of thanks to you Sir Jagadish Bose. Your name, since long time, has been familiar to many of us, on account of your early investigations on electro-magnetic waves··· Started soon after Hertz's discovery. some days ago, I looked up my old text Book of Physics and I found underlined by myself a passage telling that you had shown, that an ordinary book has the remarkable property of acting as an excellent polarisation prism for electric waves.

Later on, you turned to the great book of the Living Nature··· We all admire the rxtraordinary experimental skilfulness you have proved ··· at the same time we are proud being able to tell you, that you are at present in the country where the most delicate thickness gages of the world ere fabricated (C. E. Johansson, Eskilstuna).

You have opened up a pioneer field of investigation, and I move to you, Sir Jagadish, a most hearty thanks for your fascinating lecture !

জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহ, ১৯২১ সাল জগদীশচন্দ্র দেশে ফিরলেন। তখনকার স্বদেশীযুগে যে কোন ভারতীয় গৌরব জাতীয় উৎসবের রূপ নিত। এবারও দেশে ফেরার পর দেশবাসীর মধ্যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা যায়। জগদীশচন্দ্রকে প্রথমে সম্বর্ধনা জানান হয় বোম্বাই শহরে। পরে বোম্বাই থেকে ট্রেনে হাওড়া ষ্টেশনে নামার সাথে সাথে কলকাতার সম্বর্ধনা শুরু হয়। জানা যায় ৫ই জানুয়ারী ১৯২১ সালের "The Servant" পত্রিকার প্রতিবেদনে। প্রতিবেদনটির বর্ণনা মর্মস্পর্শী। প্রতিবেদক লিখেছিলেন, ······From 3 O'clock streams of Students trailed their way in to the Station and by half past four, the spacious platfrom

presented one vast sea of human heads all anxiously stretching their sight to catch the first view of the train.……By this time many notables had made their way into the crowd, amongst whom we noticed Sir Devaprasad Sarbadhicary, Dr. Chunilal Bose, Dr. B. L. Chowdhuri, Dr. Pramathanath Bandyopadhyaya, Dr. D. N. Roy, Dr. Agar Kar, Mr. Ramananda Chatterjee, Principal G. C. Bose, Pricipal H. C. Maitra……and others.

As soon as the Down Bombay Mail came in to sight, a thrill passed through the whole crowd and it spontaneously burst forth in to deafening cries of "Bande Mataram……Sir Jagadish Chandra was then garlanded amidst loud shouts of "Bande Mrtaram". Dr. Bose also spoke very warmly with every body and there was a veritable rush amongst the students just for a touch of the garment of the great Scientist. ……Sir Jagadish Chandra & Lady Bose got into the car about a quarter of an hour after the train arrived amidst Loud cheers……. One great feature of the whole thing was that it was entirely a national affair. There were no red carpets on the platform nor any flags or festoons as are met with usually. Even the cheers did not go beyond the national cry of "Bande Mataram". It was really a reception of spirit by spirit……

২৫শে জানুয়ারী ১৯২১ সাল। কলকাতার টাউন হলে জগদীশচন্দ্রের "F.R.S" হওয়া উপলক্ষে এক নাগরিক সম্বর্ধনার ব্যবস্থা হলো। উদ্যোক্তাদের প্রধান হলেন কলকাতার শেরিফ্ চুনীলাল বসু, কাশিমবাজারের মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, আবদুল রহিম, আশুতোষ চৌধুরী প্রমুখ। অনুষ্ঠিত সভায় জগদীশচন্দ্রকে কলকাতার নাগরিকগণের তরফ থেকে একটি মানপত্র প্রদান করা হয়। সভায় উপস্থিত নাগরিকবৃন্দকে মানপত্রটি পড়ে শোনান আশুতোষ চৌধুরী। এরপর জগদীশচন্দ্র তাঁর ভাষণে বলেন,……I came *recently*

to know from my friends that, so far back as twenty years ago, Lord Kelvin in recognition of my physical investigation on Electric Waves which he regarded as very important, wished to propose me for a Fellowship of the Royal Society. But I upset all his plans by leaving my true fold and making a daring incursion in the preserve of plant physiologists :

দেশে ফেরার পর প্রথমেই জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞান মন্দিরের তৃতীয় ও চতুর্থ গবেষণা পত্রিকা প্রকাশের কাজে হাত দিলেন। কারণ দীর্ঘ সময় ইয়োরোপে থাকায় ও যুদ্ধোত্তর নানা পরিস্থিতিতে বিজ্ঞান মন্দিরের গবেষণা পত্রিকা প্রকাশে যথেষ্ট বিলম্ব হয়েছে। ১৯২১ সালের অক্টোবর মাসে গবেষণা পত্রিকা প্রকাশিত হল। পত্রিকায় গাছের বৃদ্ধি ও গাছের রস সঞ্চালন বিষয়ক কিছু কাজের প্রাধান্য পেল। এরপর জগদীশচন্দ্র দার্জিলিং শহরে শৈল গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনার কাজ শুরু করলেন। মাত্র বছর খানেকের মধ্যে শৈল গবেষণাগার নির্মাণের কাজ শেষ হলো, এ বিষয়ে 4, 12, 1922 সালের "সিভিল এন্ড মিলিটারী গেজেট" এসোসিয়েটেড প্রেসের খবর উদ্ধৃতি করে বলল, "Sir J. C. Bose's Mayapuri Research Station in Darjeling is now complete, and will prove to be an unique institution for the study of life under cold climate conditions…" প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জগদীশচন্দ্রের এই শৈল গবেষণাগার তৈরীর ব্যাপারে প্রখ্যাত শিল্পপতি যমুণালাল বাজাজ অর্থ সাহায্য করেছিলেন। জানা যায় 24শে মে 1922 সালে লেখা যমুনালাল বাজাজের এক চিঠিতে। বোম্বে থেকে তিনি জগদীশ-চন্দ্রকে লিখেছিলেন, "…আমি অত্যন্ত আনন্দিত। পরিচালন সমিতিতে (বসু বিজ্ঞান মন্দির) প্রস্তাবটি অনুমোদন লাভ করেছে।…দার্জিলিং-এর জমি অধিগ্রহণের জন্য যে অর্থ প্রয়োজন তার জন্য বাকি দশ হাজার টাকা পাঠাইতেছি…"।

শৈল গবেষণাগার সংক্রান্ত কাজে ব্যস্ত থাকাকালীন সময়ে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি পেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "বিশ্বভারতীকে এইবার সাধারণের হাতে সমর্পণ করে দিচ্ছি। তোমাকে এর ভাইস-প্রেসিডেন্টের আসনে বসাতে চাই। সম্মতি লিখে পাঠিয়ো। বেশী কিছু দায়িত্ব নেই,

কেবল তোমার নামের সঙ্গে যোগ না থাকলে চলবে না—সময় যদি পাও এই সূত্রে কাজের যোগও ঘটবে···"

জগদীশচন্দ্র স্বাভাবিক কারণেই রবীন্দ্রনাথের এই চিঠিকে যথাযথ সম্মান দিয়েছিলেন। কারণ জগদীশচন্দ্র বিশ্বভারতীর শৈশবকাল থেকেই ছিলেন একজন বিশেষ উৎসাহদাতা। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রনাথকে লেখা জগদীশচন্দ্রের অল্প কয়েকটি চিঠির অংশ বিশেষ পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি···।

লন্ডন, ৩০-এ মে ১৯০২, ···"তুমি নগর হইতে দূরে যে আশ্রম স্থাপন করিয়াছ সেখানে কবে আসিতে পারিব মনে মনে কল্পনা করিতেছি।···তোমার এই নূতন স্থান কিরূপ মনে করিতে পারি না। আমার স্মৃতি শিলাইদহে আবদ্ধ। সেখানে কি ফিরিয়া যাইবে না? অন্ততঃ আমার সঙ্গে একবার যাইবে।···"

২৯. ৬. ১৯০৪, "···স্কুলের কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম। ···তাঁহারা সন্তানের শিক্ষার জন্য আমার পরামর্শ চাহিয়াছিলেন। দেশী লোকদের জন্য ৫ টাকার পরিবর্তে ১০ টাকা বেতন St. Xaviersএ ধার্য হইয়াছিল। ইহাতে দেশীয় কর্তৃপক্ষগণ পরম সৌভাগ্য মনে করিতেছিলেন। এখন সরকার হইতে হুকুম আসিয়াছে যে দেশীয়দিগকে যেন আর না ভর্ত্তি করা হয়। ···এখন কথা কোন্ নেটিভ স্কুলে ছেলে দেওয়া যায়। হায়, এত অপর্যাপ্ত রাজ ভক্তির এই পুরস্কার! তোমার স্কুলের উপর এখন অনেকের নজর পড়িতেছে।

মায়াবতীতে একজন আমেরিকান আসিয়াছে, সে কলকারখানায় বিশেষ মজবুত। আমার ইচ্ছা তুমি শীতকালে কয়মাসের জন্য তাহাকে নিমন্ত্রন করিয়া স্কুলে আনাও।···"

C/o Henry S. King and Co

9, Pall Mall, London, 19th December 1907.

"···এখানে নূতন রকমের কল দেখিয়া ইচ্ছা হয় যে তোমার স্কুলে ছোট Workshop খোলা হয়। ছোট কেরাসিনের এঞ্জিন (one horse power) ১৫০ টাকা মাত্র, অতি সহজেই চলে। বিদ্যুতের আলোর dynamo তাহার দ্বারা চালান যাইতে পারে, উহার জন্য আর ৫০ টাকা। আমার শিষ্য সুরেশের সহিত তোমার স্কুল সম্বন্ধে সর্বদা আলোচনা করি। ছোট American

Lathe সম্ভবতঃ ২০০ টাকার মধ্যে পাওয়া যাইবে। ৫।৬ শত টাকা হইলে তোমার Workshop আরম্ভ করা যাইতে পারে।…"

C/o Henry S. King and Co.
9, Pall Mall, London

২৮এ ফেব্রুয়ারী ১৯০৮, "…তোমার স্কুলের কথা সর্বদা ভাবি। এই তোমার প্রধান কার্য। এইরূপ মানুষ গড়ার চেয়ে কোন কাজ শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না। যদি Workshop করিতে চাও তাহা হইলে এখান হইতে সব খবর লইব। ১৫০০ টাকা হইলে বেশ ভাল হয়, ১০০০, হইলেও হইতে পারে।…"

Studio House, 168 Brattle St.
Cambridge, Mass. U.S:A

২০ নভেম্বর ১৯০৮, "…গানের পুস্তকে তোমার যে ছবি দেখিলাম তাহাতে একান্ত ক্লিষ্ট হইলাম।…এই ভগ্ন শরীর লইয়া কতদিন যুঝিবে? এ সম্বন্ধে আমারও স্বার্থ আছে মনে করিও। দেশে ফিরিলে আমাকে ঘনঘন বোলপুরে ও শিলাইদহে দেখিতে পাইবে। তোমার স্কুল ও তোমার গ্রাম্য সমিতির কথা সর্বদা মনে করি। …তোমার স্কুলের কথা আমাকে সর্বদা বিস্তারিতরূপে লিখিও। মনে রাখিও তোমার প্রতি কার্যে আমার মন আকৃষ্ট।…"

কলিকাতা, ২০এ জুলাই ১৯১৮, "…তোমার পক্ষে কতকদিন বিশ্রাম একান্ত আবশ্যক। তোমার চিঠি পড়িয়া মনে হইল স্কুলের কথা মনে করিয়া চিন্তিত আছ। …কিন্তু তোমার স্কুল দেখিয়া অন্য দেশে স্কুল হইতেছে। তাহারা ভাবুক নয় কিন্তু কর্মী। সুতরাং তোমার চেষ্টা হয়ত অন্য দেশে অধিকরূপ পরিস্ফুট হইবে।

আর তোমার স্কুলের ছেলেরা অন্ততঃ কয়েক বৎসর নির্ভয়ে বাড়িতে পারিয়াছে। আজকালকার দিনে এ কথাটা কম নয়। তাছাড়া এতগুলি ছেলের মধ্যে কেহ কেহ তোমার শিক্ষার সার্থকতা করিবে। সে হয়ত আমরা দেখিয়া যাইতে পারিব না, কিন্তু তাহা হইবেই হইবে।…"

২৫শে বৈশাখ ১৩৪৩, "—জগতের কল্যাণ জন্য তোমার অবিশ্রান্ত চেষ্টা বহু বৎসর ধরিয়া যেন ফলবতী হয় আজ এই প্রার্থনা করিতেছি।

তোমার বিশ্বভারতীর কোন অনুষ্ঠানের সাহায্যার্থে ৫০০ টাকা পাঠাইতেছি, গ্রহণ করিয়া সুখী করিবে।"

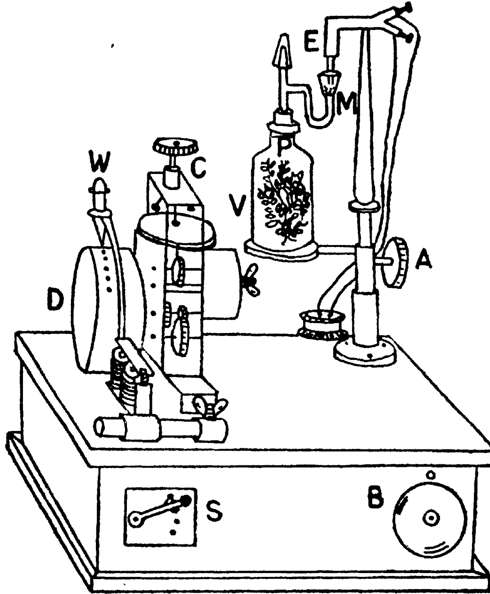
ইয়োরোপের এই বৈজ্ঞানিক সফর শেষে দেশে ফেরার পর নানা কাজে জগদীশচন্দ্র ব্যস্ত থাকলেও তাঁর গবেষণার কাজ থেমে থাকেনি। বরং বলা চলে জগদীশচন্দ্রের এ পর্যায়ের গবেষণা আরও ব্যাপক ও কর্মবহুল।

১৯২১ সালে দেশে ফেরার পর থেকে ১৯২৩ সালের মধ্যে জগদীশচন্দ্র গাছের আলোক সংশ্লেষণ কর্মধারার ওপর নানা চিত্তাকর্ষক গবেষণা করেন। তাঁর এই চমকপ্রদ পরীক্ষা প্রদর্শনের জন্য আবার তাঁকে এ সময়ে ইয়োরোপে যেতে হয়। এই বৈজ্ঞানিক সফরে জগদীশচন্দ্র লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় (১৫ই নভেম্বর ১৯২৩),লীডস্ বিশ্ববিদ্যালয় (২০শে নভেম্বর ১৯২৩), ইম্পিরিয়াল কলেজ (২৬শে নভেম্বর ১৯২৩), রয়্যাল সোসাইটি অব মেডিসিন (৬ই ডিসেম্বর ১৯২৩), ইণ্ডিয়া অফিস (৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৪) ছাড়াও কোপেন-হেগেন বিশ্ববিদ্যালয় ও ফ্রান্সের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভাষণ দেন। সর্বত্রই তাঁর বক্তৃতা প্রশংসিত হয়। এক্ষেত্রে শুধু তাঁর "ইণ্ডিয়া হাউজে" অনুষ্ঠিত বক্তৃতা সম্পর্কে কিছু তথ্য পাঠকদের কাছে তুলে ধরব।

৭ই ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার ১৯২৪ সাল। বিজ্ঞানী অলিভার লজের অনুরোধে "ইণ্ডিয়া হাউজে" জগদীশচন্দ্র পরীক্ষা দেখাচ্ছেন। বক্তৃতা কক্ষের জানালার ধারে উঁচু টেবিলের ওপর বসান আছে একটি যন্ত্র। যন্ত্রটি ছোটখাট। বক্তার নিজের হাতে তৈরী স্বয়ং-লেখ যন্ত্র।

যন্ত্রটির এক জায়গায় পরীক্ষাধীন জলজ উদ্ভিদ বিশেষভাবে তৈরী একটি কাচের শিশিতে রাখা আছে। সূর্যালোক সরাসরি এসে পড়ছে শিশিটির ওপর। শিশির মুখে রাবার ছিপিতে ইউ-টিউব (U-tube) লাগানো আছে। টিউবের মুখটির আকার ফানেলের অনুরূপ। ফানেলটির মুখে নির্দিষ্ট ওজনের পারদ দেওয়া আছে। পারদ বিন্দুর ভূমিকা ভাল্‌ব হিসেবে কাজ করা। আলোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া চালু হওয়ার পরেই দেখা গেল—শান্ত বক্তৃতা কক্ষকে সচকিত করে হঠাৎ যন্ত্রের মধ্যে লাগানো বৈদ্যুতিক ঘণ্টাটি আপনা থেকেই বেজে উঠল। পরক্ষণেই আর একবার। এবার জগদীশচন্দ্র এগিয়ে গেলেন যন্ত্রটির কাছে। উৎসুক দর্শকগণকে লক্ষ্য করে যন্ত্রটির কার্যক্ষমতা ও পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা শুরু করলেন। বললেন, আলোক সংশ্লেষণের ফলে পরীক্ষাধীন গাছ থেকে যে অক্সিজেন নির্গত হচ্ছে তা সোজা ইউ-টিউব দিয়ে বেরুবার চেষ্টা করছে। কিন্তু সেখানে ফানেলের মুখে নির্দিষ্ট পরিমান পারদ বিন্দু রয়েছে। তাই যতক্ষণ না নির্গত অক্সিজেন নির্দিষ্ট পরিমান চাপের সৃষ্টি করতে সক্ষম

হচ্ছে ততক্ষণ অক্সিজেন ইউ-টিউবে জমা হচ্ছে। তারপর নির্দিষ্ট পরিমান চাপ সৃষ্টি হলে পারদ বিন্দুকে ঠেলে অক্সিজেন বেরিয়ে যাচ্ছে। বেরিয়ে যাওয়ার সময় ফানেলের মুখে ঝোলান দুটি প্লাটিনামের তার পারদ বিন্দুর সংস্পর্শে আসছে। প্লাটিনামের তার দুটির সাথে তড়িৎ চৌম্বকীয় লেখনীর যোগ



ফটোসিন্থেটিক বাবলার রেকর্ডার

V—কাচের শিশি, M—নির্দিষ্ট ওজনের পারদবিন্দু, P—পরীক্ষাধীন জলজ উদ্ভিদ, W—তড়িৎ-চৌম্বকীয় লেখনী, D—ঘূর্ণীয়মান ড্রাম, B—তড়িৎ ঘন্টা, S—সুইচ, C—ড্রামের নিয়ন্ত্রণকারী ব্যবস্থা, E—প্লাটিনামের তার।

রয়েছে। ফলে তড়িৎবৃত্ত সম্পূর্ণ হচ্ছে। চুম্বক লেখনীর সামনের ঘড়িকলের সাহায্যে নির্দিষ্ট গতিতে ঘূর্ণীয়মান ড্রামের ওপর দাগ কাটছে। সেই সাথে প্রতিবার দাগ কাটার সময় তড়িৎ বর্তনীর সাথে যুক্ত তড়িৎ-ঘণ্টাটি বেজে উঠে সমবেত দর্শক মণ্ডলীকে সচকিত করছে।

এরপর জগদীশচন্দ্র স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে লিপিবন্ধ করে দেখাতে লাগলেন কি

গতিতে গাছ আলোক সংশ্লেষণ করে থাকে।পর্যায়ক্রমে পরীক্ষা মঞ্চেই লিপিবদ্ধ হতে থাকলো বিভিন্ন উত্তেজক পদার্থ প্রয়োগে সংশ্লেষণের হারের তারতম্য। দর্শক মণ্ডলীর প্রথম সারিতে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী রামজে ম্যাগডোনাল্ড। পাশে বসেছেন জর্জ বার্নার্ড'শ, বিজ্ঞানী অলিভার লজ ও ভারতের প্রাক্তন গভর্নর জেনারেল হার্ডিঞ্জ।

এক সময় বক্তৃতা শেষ হল। মঞ্চ থেকে নেমে এলেন বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র। কিছুটা কাছাকাছি আসতেই বার্নার্ডশ প্রধানমন্ত্রীকে লক্ষ্য করে তাঁর নিজের চিরাচরিত গাম্ভীর্যকে বজায় রেখে বলে উঠলেন—"ডঃ বোস শীঘ্রই হয়তো এমন একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করবেন; যা দিয়ে রাজনীতিবিদ ও অন্যান্যদের কার্য-ক্ষমতা যন্ত্র লিপির মাধ্যমে এঁকে দেখাবেন এবং বিভিন্ন ধরনের কাজে ওদের দক্ষতাও নিখুঁতভাবে পরীক্ষা করতে সক্ষম হবেন।"

এতক্ষণ আলোক সংশ্লেষণের হার মাপার জন্য তিনি যে যন্ত্রটি দিয়ে পরীক্ষা দেখাচ্ছিলেন, তার নাম "Photosynthetic Bubbler Recorder"। এই যন্ত্র কাজে লাগিয়ে মাঝে মধ্যে কিছু হেরফের করে "আলোর প্রাখর্য ও স্থিতি-কালের সঙ্গে কার্বনডাইঅক্সাইড ও ক্লোরোফিলের পরিমানগত সম্বন্ধ, তাপমাত্রার প্রভাব, উত্তেজনা; অবসাদক পদার্থ ও বিষ প্রয়োগের ফলাফল, কার্বন ডাই-অক্সাইডের অনুপস্থিতিতে আলোক সংশ্লেষণ। আলোক সংশ্লেষণে সৌরশক্তির সংহত অংশের পরিমান, সংশ্লেষণের উপর সূর্যালোকের বিভিন্ন বর্ণালীর প্রভাব" ইত্যাদি আরও বহু রকমের চমকপ্রদ পরীক্ষা তিনি সে সময় করেছিলেন। বলা বাহুল্য, 'ইণ্ডিয়া হাউজে' প্রদর্শিত পরীক্ষা সমূহ ছিল তাঁর বৃহৎ কর্মকাণ্ডের বিন্দুমাত্র।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আলোক সংশ্লেষণের ওপর বর্ণালীর প্রভাব খতিয়ে দেখার জন্য তিনি সে যুগে আরও আশ্চর্যজনক একটি যন্ত্র আবিস্কার করেছিলেন—নাম "রেডিও মিটার"। এই যন্ত্র দিয়ে তিনি "আপতিত বর্ণালীর বিকিরিত শক্তি" কতটা তা সঠিকভাবে মেপে দেখিয়েছিলেন। যন্ত্রটির প্রসারণ ক্ষমতা ছিল পঞ্চাশ লক্ষ গুণ।

১৯২৪ সালের মার্চ মাসে জগদীশচন্দ্র দেশে ফিরলেন। বিদেশ ভ্রমণের সময় ১৯২২ সালে লীগ অব নেশনস্ পৃথিবীখ্যাত বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক ও শিল্পীদের নিয়ে একটি সংস্থা গঠন করেন। উদ্দেশ্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে সুস্থ সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে তোলা। ভারতীয় প্রতিনিধি নির্বাচনের

প্রশ্নে জগদীশচন্দ্রকে মনোনীত করা হয়। এই নির্বাচনের ব্যাপারে জগদীশ-চন্দ্রের নাম প্রস্তাব করেছিলেন "ইনটেলেকচুয়াল কো-অপারেশন কমিটির ব্রিটিশ প্রতিনিধি লর্ড পারস্নর। বিদেশে থাকার সময়েই জগদীশচন্দ্রের "Comparative Electrophysiology" গ্রন্থটি ফরাসী ভাষায় অনূদিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯২১ সালে বিদেশ সফর শেষে দেশে ফেরার পর থেকে ১৯২৩ সালের শেষের দিক পর্যন্ত জগদীশচন্দ্র গবেষণার সাথে সাথে পুস্তক রচনার কাজেও বিশেষভাবে ব্যস্ত ছিলেন। এ পর্যায়ে তিনি তাঁর পঞ্চম গ্রন্থ The Physiology of Photosynthesis গ্রন্থটি প্রকাশ করেছিলেন ও ষষ্ঠ গ্রন্থ The Nervous Mechanism of Plants বইটির রচনাও প্রায় সমাপ্ত করে ফেলেন।

১৯২৫ সালের ৩০ নভেম্বর। বসুবিজ্ঞান মন্দিরের অষ্টম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উৎসব। অন্যান্য বারের মত এবারও জগদীশচন্দ্র বসুবিজ্ঞান মন্দিরের বক্তৃতা কক্ষে ভাষণ দিলেন। বক্তৃতা শোনার জন্য জনসাধারণ ও ছাত্রসমাজের মধ্যে আগে থেকেই সাড়া পড়ে গিয়েছিল। কারণ প্রায় মাসখানেক আগে দার্জিলিং-এর গবর্নমেণ্ট হাউজে লর্ড লিটনের আমন্ত্রণে জগদীশচন্দ্র একটি ভাষণ দেন। তাতে তিনি ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে দেশে ফেরার পরে আবিস্কৃত দু'একটি নতুন তথ্যের ওপর আলোকপাত করেন। জগদীশচন্দ্রের ভাষণটি প্রবাসী পত্রিকায় বাংলা ১৩৩২ সালের পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ঐ ভাষণের অংশ বিশেষ পাঠকদের উদ্দেশ্যে তুলে ধরছি। "...আট বৎসর পূর্বে যখন আমি বসুবিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলাম, তখন যাহারা এই গবেষণা কার্যে সমস্ত জীবন নিয়োগ করিবে, যাহারা চরিত্রবল এবং দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে ও প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হইবে, কেবল তাহাদিগকেই আমার শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলাম। ভারতবাসী কোন কার্যেই অগ্রণী হইতে অক্ষম—এই কলঙ্ক ভারতীয়গণকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। চিরদিনের জন্য সেই তথাকথিত কলঙ্ক কালিমা মুছাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলাম।

অতি বৃহৎ আবিস্কার করিতে হইলে প্রবল অন্তর্দৃষ্টি ও সূক্ষযন্ত্র আবিস্কার ও নির্মাণের দক্ষতা ও অনুসন্ধান করিবার কৌশল জানা আবশ্যক। অন্তর্দৃষ্টি-শূন্য ও উদ্দেশ্যবিহীন অনুসন্ধানের কোনই সার্থকতা নাই। ভারতের চিন্তা এবং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বৈশিষ্টের ফলে ভারত জ্ঞান প্রচার ক্ষেত্রে বিশেষরূপে পারদর্শী। আপাতদৃষ্টিতে বৈষম্যপূর্ণ ঘটনাবলীর মধ্যে ভারতীয় কল্পনাশক্তি ঐক্যের সন্ধান পায়। একাগ্র সাধনার দ্বারা সেই শক্তিকে সুনিয়ন্ত্রিত করা যায়।

এই ক্ষমতাই আবার মনকে ধৈর্যশালী করে ও সত্যের অনুসন্ধানে সক্ষম করিয়া তোলে। মনোমন্দিরই প্রকৃত বিজ্ঞানমন্দির।

উদ্ভিদের অভ্যন্তরীণ প্রাণযন্ত্রের গূঢ় রহস্য অবগত হইতে হইলে অন্তর্দৃষ্টি-দ্বারা···অনুভব করিতে হইবে। এই অন্তর্দৃষ্টি মাঝে মাঝে পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য; অপরীক্ষিত কল্পনা, চিন্তারাশিকে বিপথগামী করে। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা যখন কিছু দৃষ্ট হয়না, তখনও আমাদিগকে অদর্শনীয়ের অনুসরণ করিতে হয়। কারণ, যাহা আমাদের দৃষ্টিপথের বাহিরে থাকে, তাহার তুলনায় আমরা যতটুকু দেখিতে পাই তাহা একান্তই সামান্য। সেই অদৃশ্যরাজ্যে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিবার জন্য ক্রেস্কোগ্রাফ আবিষ্কার করিতে হইয়াছে।··· এই যন্ত্র ব্যবহার করিতে হইলে হস্ত সম্পূর্ণরূপ মনের অধীন করিতে হয়। নচেৎ যন্ত্র অব্যবহার্য হইয়া যায়। দেহের উপর মনের প্রভাব অপরিসীম এবং মনের বল দ্বারা যে সাফল্য লাভ করা সম্ভবপর হইয়াছে তাহা ইন্দ্রজালকেও পরাজিত করিয়াছে। বিশেষ শিক্ষার দ্বারাই এই সমস্ত শক্তির উৎকর্ষ সাধন করা সম্ভব। বিগত আট বৎসরে এই বিজ্ঞান মন্দিরে ২০০টি বিষয় এই কারণে সাফল্যের সহিত পরীক্ষিত হইয়াছে।

অন্তর্দৃষ্টি এবং অবিরাম অনুসন্ধিৎসা দ্বারা সুকঠিন সমস্যাসমূহ কি প্রকারে পূরিত হয়, আমার বর্ত্তমান আবিষ্কার তাহারই প্রমাণ। বৃক্ষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কি করিয়া রস সঞ্চালিত হয়, এই সমস্যা লইয়া দুইশতবর্ষের অধিককাল অনু-সন্ধান চলিয়াছে। কিন্তু কোন সুমীমাংসা হয় নাই। মাটি হইতে বহু উচ্চে গাছের উপরে জল উঠে। কি উপায়ে জলের গতি নিরূপিত হয় ইহা বহুদিন ধরিয়া এক সমস্যা ছিল। এই রস-সঞ্চালন কি জড় শক্তির প্রভাবে হয় না জীবনীশক্তির ফল? এই প্রশ্ন সমাধানের জন্য সট্রাসবুর্গার (Strasburger) বৃক্ষে বিষ প্রয়োগ করিয়াছিলেন এবং মনে করিয়াছিলেন যে, তাহাতে রস-সঞ্চালনের কোন ব্যতিক্রম ঘটায় নাই। কাজেই তিনি মত দেন, জীবনীশক্তি-দ্বারা ঐরূপ রস সঞ্চালন হইতে পারে না। জড় বিজ্ঞানের মধ্যে ইহার কারণ অনুসন্ধান চলিতে লাগিল—কল্পনার সহিত সত্যের সামঞ্জস্য ঘটাইবার জন্য অদ্ভুত অদ্ভুত যুক্তির অবতারণা করা হইল। কিন্তু সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। এমন কোন নিদর্শক বাহির করিবার চেষ্টা হইল না, যাহার সাহায্যে রস-সঞ্চালনের নির্দেশ পাওয়া যায়।

এ সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া আমি দেখাইলাম যে উদ্ভিদের পত্র রস-সঞ্চালনের নির্দেশক। রসের দ্রুত সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গেই বৃক্ষের পাতা সতেজ হইয়া ঊর্ধ্বে উঠে এবং সঞ্চালনে বাধা পড়িলে পাতা ঢলিয়া পড়ে। পাতার গতিবিধি এত সূক্ষ্ম যে সহজে তাহা লক্ষীভূত হয় না। আমি অপ্টিক্যাল লিভার (Optical Lever) দ্বারা এই অসুবিধা দূর করিলাম। এই যন্ত্রের একটি দণ্ডের একদিক একটি সূত্রদ্বারা পাতার সহিত বাঁধা থাকে। দণ্ডটির সহিত একটি দর্পণ সংলগ্ন থাকে। পাতার গতিবিধি এই দর্পণে প্রতিফলিত হয়। এইরূপে পাতার অতিসামান্য উত্থান-পতন এই যন্ত্রের সাহায্যে অতি সহজেই পাঁচ হাজার গুণ পরিবর্ধিত আকারে দেখা যায়। এই গবেষণার ফলে স্ট্রাসবুর্গারের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ...এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, প্রাণীর রক্তচাপের মতন বৃক্ষের রসচাপ কি বর্ধিত কিম্বা অবসন্ন হয়। এই অনুসন্ধান স্বভাবতই ব্যর্থ চেষ্টা বলিয়া মনে হইবে। প্রত্যেক স্পন্দনের দরুণ যে সঙ্কোচ-প্রসারণ হয় অত্যুৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও তাহা পরিলক্ষিত হয় না। ...সুতরাং, এই অদৃশ্য ও অবোধ্যকে কি করিয়া দৃশ্যমান করা সম্ভব হইবে? এই তথ্য প্রথমে আমার নূতন উদ্ভাবিত বিদ্যুৎশলাকা দ্বারা আবিস্কৃত হইল। আমি বৃক্ষের কাণ্ডের ধাপে ধাপে বৈদ্যুতিক শলাকা প্রবিষ্ট করাইয়া দেখিয়াছিলাম যে, যে মুহূর্তে ঐ শলাকা স্পন্দমান স্তরের সংস্পর্শে আসে সেই মুহূর্তে বৈদ্যুতিক সাড়া পাওয়া যায়। ঐ সাড়া গ্যালভানোগ্রাফ (Galvanograph) যন্ত্রে লেখা হয়। প্রত্যেকটি জীবকোষ প্রসারণকালে নিম্নদেশ হইতে জল চুষিয়া লয় এবং সঙ্কোচনের সময় উহা ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করে। ইহার পর অন্য সমস্যা মনে উদিত হইল। বিদ্যুৎ-শলাকা প্রবেশ না করাইয়া বাহির হইতে বৃক্ষের স্পন্দন কি কোনদিন আমাদের অনুভূতিগ্রাহ্য হইবে? যখন স্পন্দিত রস-প্রবাহ বৃক্ষে সঞ্চারিত হয় তখন প্রত্যেক ঢেউ বৃক্ষকে ক্ষণিকের জন্য প্রসারিত করে। এই অদৃষ্ট ও অস্পৃশ্য স্পন্দন মনুষ্য-প্রত্যক্ষগোচর করিবার জন্য কল্পনারও অতীত অনুভব যন্ত্র আবিস্কার করিতে হইয়াছে। এই অনুভবযন্ত্রে (Optical Sphygmo-graph) দুটিই দণ্ড আছে—একটি স্থির; আর একটি চালনশীল। বৃক্ষটি এই দণ্ড দুইটির মধ্যে অবস্থাপিত করিলে প্রসারণতরঙ্গ চালন যোগ্য দণ্ডখানিকে বাহিরের দিকে ঠেলিয়া দেয়। তবে ইহা চোখে দেখা যায় না। এই সঙ্কোচন প্রসারণ এক ইঞ্চির দশলক্ষভাগের একভাগেরও কম। সুতরাং, আমার ম্যাগনেটিক

অ্যামপ্লিফায়ার (Magnetic amplifire) যন্ত্রের দ্বারা এই প্রসারণ সঙ্কোচনকে এককোটিগুণ বাড়াইতে হইয়াছে। এই যন্ত্রের চুম্বকের সহিত সংলগ্ন দর্পণে প্রতিফলিত আলোকরশ্মি দূরস্থিত যবনিকায় পতিত হয়। বৃক্ষটির স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে এই আলোকরশ্মি আলোড়িত হইতেছে। উত্তেজক বা ক্লান্তিজনক ঔষধ প্রয়োগের ফলে এই আলোড়নের গতিবৃদ্ধি অথবা ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। জীবনী-শক্তির অদৃশ্য গতিবিধি কম্পিত আলোকরেখা দ্বারা জীবনের গূঢ় রহস্য জগৎ-সমক্ষে এইরূপ সর্বপ্রথমে প্রচারিত করিল।

বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য মানুষের ভার লাঘব করা। দৈন্য এবং অভাব আসিয়া জাতীয় জীবনকে মৃত্যুপথে লইয়া যাইতেছে। দেশের আর্থিক উন্নতি সাধন করিতে হইলে কৃষি এবং শিল্প উভয়েরই উন্নতিসাধন করা আবশ্যক। ইহা করিতে হইলে বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করিতেই হইবে। আমি প্রমাণ করিয়াছি যে অনুসন্ধান এবং আবিস্কারের ফলে ভারতবাসী বিজ্ঞানের প্রভুত উন্নতিসাধন করিতে পারে। যেমন আর্থিক দূরবস্থা ইয়োরোপে অশান্তি আনয়ন করিয়াছে—ভারতের আর্থিক সমস্যাই ভারতবর্ষের সমস্ত অশান্তির মূল। দেশের মৃত্তিকা নিহিত স্বাভাবিক ঐশ্বর্য উদ্ধার করিবার একমাত্র উপায়—দেশের বহুসংখ্যক যুবককে উন্নত প্রণালীর বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তাহাদিগকে দেশের কাজে ব্যাপৃত করা। উদ্যোগী শক্তিশালী ব্যাক্তির পক্ষে বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র রহিয়াছে। দেশের লোক যখন বৃথা আত্মকলহে ব্যাপৃত—এই সুযোগে বাহির হইতে বহু জাতি আসিয়া ভারতের ধনরত্ন লুটিয়া লইতেছে।

আমরা কি ভুলিয়া গিয়াছি যে, অকুল জলধি এবং হিমাচল সমগ্র পৃথিবীর প্রতিযোগিতা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না? ধরিত্রীমাতা যেমন "পাপভার" বহন করিতে অসমর্থ, প্রকৃতি জননীও সেইরূপ অসমর্থ জীবের ভার বহন করিতে বিমুখ। দেহের মৃত্যুই আমাদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ নহে। ধ্বংসশীল শরীর মৃত্তিকায় মিশিয়া গেলেও জাতীয় আশা ও চিন্তা ধ্বংস হয় না। মানসিক শক্তির ধ্বংসই প্রকৃত মৃত্যু; তাহা একেবারে আশাহীন এবং চিরন্তন। অবিরাম চেষ্টা ও বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে যুঝিয়া এবং মনের শক্তি বৃদ্ধি করিয়াই দেশের ও জগতের কল্যাণ সাধণ করিতে পারিব—নিশ্চেষ্ট হইয়া নহে। যে দুর্বল এবং যে জীবন সংগ্রাম হইতে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছে, সে কাপুরুষ। সে দান করিবার অধিকারী নহে, কারণ তাহার দান করিবার কিছুই নাই। যে বীরের ন্যায় সংগ্রামে যুঝিয়াছে এবং জয়যুক্ত হইয়াছে, কেবল সেইই

তাহার অরলব্ধ বিত্ত দান করিতে পারে এবং সেই দানদ্বারা জগৎকে সমৃদ্ধিশালী করিতে পারে। ভারতের গৌরব এবং জগতের কল্যাণ, ইহাই আমাদের চির-সাধনা হউক।

ইতিমধ্যে জগদীশচন্দ্র একটি চিঠি পেয়েছিলেন পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের কাছ থেকে। লক্ষ্ণৌ থেকে লেখা। তিনি লিখেছিলেন,

Lucknow

16th November, '25

Dear Sir Jagadish,

It seems an age since you visited the Hindu University. I write to day to request you to be good enough to repeat your visit and to deliver the convocation Address at the next convocation which will be held on the 19th proximo. I hope yon will accept the invitation. I need hardly say that we shall all be grateful for it. I hope the date will suit you. Kindly favour me with a reply by wire or letter at the 'Benares Hindu University, "where I hope to reach after two days. Kindly convey my invitation to Lady Bose also. I hope she too will come. I hope you are both quite well. Looking forward to the pleasure of meeting you.

Yours Sincerely

S/d M. M. Malaviya*

জগদীশচন্দ্র এই আমন্ত্রণের পরিপ্রেক্ষিতে ২১শে ডিসেম্বর তারিখে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে ভাষণ দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তিনি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা উৎসবেও একটি ভাষণ দিয়েছিলেন। সমাবর্তন উৎসবে প্রদত্ত ভাষনটি ২২. ১২. ১৯২৫ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত ভাষণের অংশবিশেষ তুলে ধরছি।

…বীজাভ্যন্তরস্থিত প্রত্যেকটি বীজাণুর একদিন বিশাল বটবৃক্ষে পরিণত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। অঙ্কুর যেমন একদিকে দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইবার জন্য

* চিঠিটি অপ্রকাশিত।

মাটির বুক চিরিয়া মূল প্রবেশ করাইয়া দেয়, অন্যদিকে তেমনি সে আলোকের সন্ধানে মাথা তুলিয়া আকাশের দিকে ধাবিত হয়—পত্রমণ্ডিত শাখা-প্রশাখা চতুর্দিকে ছড়াইয়া দেয়।

সর্বপ্রকার সংগ্রামে জয়ী হইবার এই শক্তি বৃক্ষ কোথা হইতে পায়? তাহার জন্মস্থান হইতে; পরিবর্তন বোধ ও তৎসঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা—তাহার জন্মসৃতি হইতেই সে এ ক্ষমতা পায়। ঐস্থান এবং স্থানীয় যাহা কিছু তাহা হইতেই সে জীবনীশক্তি পায়। এই সমস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যে হতভাগ্য, বিদেশী চিন্তাধারায় এবং বিদেশী পন্থায় পরিবর্ধিত হয় তাহার চরমগতি কোথায়? মৃত্যু তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইতেছে। ধ্বংসই তাহার একমাত্র পরিণতি।

আমাদের জাতীয় জীবনে এইরূপ কোন শক্তি আছে কিনা, যদ্বারা আমরা সর্বদাই নবীন জীবন লাভ করিতে পারি? আমাদের অতীত কি কেবল স্মৃতিতেই পর্যবসিত হইবে, না আমাদের নবীন জীবন সঞ্চারের শক্তিস্বরূপ হইবে? অতীতের এই নিহিত শক্তি যে জাগরূপ আছে, তাহার প্রমাণ—বিদ্যার এই প্রাচীন পীঠস্থানে চার হাজার বৎসর ধরিয়া অবিরত বিদ্যার চর্চা হইয়া আসিতেছে; সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে এমন একটা নিহিত শক্তি আছে, যাহা কালের সর্ববিধ্বংসী ক্ষমতাকে অগ্রাহ্য করিতে সমর্থ হইয়াছে। যে সভ্যতা অসংখ্য পরিবর্তন সহ্য করিয়া আজও মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, যে সভ্যতা মিশরের, এ্যাশিরিয়ার এবং ব্যাবিলনের সভ্যতার উত্থান পতন দেখিয়া আজও বাঁচিয়া আছে, যে সভ্যতা অতীতের সেই দৃঢ় বিশ্বাস লইয়া ভবিষ্যতের দিকে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, সেই সভ্যতার মধ্যে এই শক্তি নিশ্চয়ই নিহিত আছে।

এই চিন্তায়ই যেন আমরা আত্মতৃপ্তি লাভ না করি, কারণ আমাদের জাতীয় জীবনে এখন ভাটা পড়িয়াছে। আমাদের সম্মুখে যে বিপদ উপস্থিত, তাহা অতীতের বিপদ হইতেও কঠোরতর। অতীতে আমাদের কি শক্তি ছিল এবং বর্তমানে কেন আমরা সে শক্তি হারাইলাম, তাহা আমাদিগকে জানিতে হইবে।

সমালোচকগণের মতে স্থায়ী জ্ঞান প্রসারে ভারত অপটু। তাঁহারা বলেন যে যেখানে শাস্ত্রের আদেশ বুদ্ধির উপরে প্রভুত্ব করে, যে দেশ আয়তনে এত বৃহৎ এবং বহুধা বিভক্ত তথায় সত্য জ্ঞানের প্রচার সম্ভব নহে। অপর পক্ষ আবার ঠিক ইহার উল্টা কথা বলেন। কাহার কথা ঠিক? পশ্চিমে দ্বারকা

হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্বে পুরী এবং দক্ষিণে রামেশ্বরম হইতে উত্তরে কেদারনাথ পর্যন্ত ভারতের সমস্ত ভূভাগ ভ্রমণ করিবার পর আমি বুঝিতে পারিলাম, কোন শক্তি এই দেশকে সংহত রাখিয়াছিল।

শাস্ত্রের গোঁড়ামীর মত বিদ্যার প্রসারের প্রতিবন্ধক আর কিছুই নাই। সকলেই জানেন যে, গ্যালিলিওকে বাধ্য হইয়া স্বমত পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। ব্রুনোকে পোড়াইয়া মারা হইয়াছিল। কয়েক মাস মাত্র পূর্বে উন্নতিশীল আমেরিকায় অভিব্যক্তিবাদ প্রচার করায় এক ব্যক্তির সাজা হইয়াছে।

ধর্মের একদেশদর্শিতা ভারতের বিদ্যানুশীলনের প্রতিবন্ধক হইয়াছে কি না? সকলেই জানেন যে, এখানে দুইটি বিভিন্ন চিন্তাধারা পাশাপাশি বাড়িয়া উঠিয়াছিল। এই দুইটি চিন্তাধারা দুই পথে ধাবিত হইয়াছিল—একটি ভক্তির, বিশ্বাসের পথ—আর একটি জ্ঞানের মুক্তির পথ। কাহারও মতবাদের জন্য কাহাকেও দণ্ডিত করা হইত না। এই দেশের লোক মনে করিত যে, যিনি সৃষ্টির নিত্য নূতন রহস্যে আমাদিগকে সমাবৃত রাখিয়াছেন—যিনি ধূলিকণার পরমাণুর মধ্যে বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য নিহিত করিয়াছেন, তিনিই আমাদিগের মধ্যে জ্ঞানের পিপাসা দিয়া রাখিয়াছেন।

পুরাকালে চার বিদ্যার প্রতীক স্বরূপ এই বিদ্যাপীঠে চারটি প্রদীপ প্রজ্বলিত রাখা হইত, অতি দূর স্থান হইতে আসিয়াও যদি কেহ এই স্থানের পণ্ডিতদিগকে তর্কে পরাজিত করিতে পারিতেন, তবে এই প্রদীপ নির্বাপিত করা হইত। আবার বিজয়ীকে পরাজিত করিতে পারিলে তবে এই প্রদীপ পুনঃ প্রজ্বলিত হইত। স্বাধীন চিন্তার উৎকৃষ্টতর উদাহরণ ইহা হইতে আর কি হইতে পারে?

জ্ঞানের অনুশীলন কোন বিশেষ প্রদেশে নিবদ্ধ ছিল না। পশ্চিমে তক্ষশিলায়, উত্তরে নালন্দায় এবং দক্ষিণে কাঞ্চীপুরে বহু শতাব্দী ধরিয়া জ্ঞানের দীপশিখা প্রজ্বলিত ছিল। জ্ঞান প্রচারেও কোনপ্রকার ভৌগোলিক বাধা ছিল না। আচার্য শঙ্কর তর্কসংগ্রামে দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া এক একটি দেশকে পরাজিত করিয়া উত্তর ভারতবর্ষ পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিলেন। কয়েকখানি মাত্র তালপাতার পুঁথি সম্বল করিয়া বঙ্গদেশ হইতে মনীষিগণ দুর্লঙ্ঘ হিমালয় পর্বত অতিক্রম করিয়া তিব্বত, চীন এবং সুদূর প্রাচ্যে জ্ঞানপ্রচারে গমন করিয়াছিলেন। প্রেম এবং সেবার আকাঙ্খাই তাহাদিগকে এই কার্যে অনুপ্রেরিত

করিয়াছিল। যাঁহারা ইতিহাস পাঠ করেন, তাঁহারাই জানেন যে, ভারতীয় সভ্যতা কত বিভিন্ন জাতকে তাহার দেহে লীন করিয়া লইয়াছে। তাহাদেরই সম্মিলিত চেষ্টায় ভবিষ্যতের বৃহত্তর ভারত গড়িয়া উঠিবে।

যদি আমরা কেবলমাত্র অতীতের স্মৃতি লইয়াই বসিয়া থাকি, তবে নিষ্ক্রিয়তার ফলেই আমাদিগকে ধরণীর পৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইতে হইবে। অবিরত কর্মের দ্বারাই আমরা আমাদের উত্তরাধিকারের মর্যাদা রক্ষা করিতে পারি। আমাদের পূর্বপিতৃগণ সর্বদর্শী ছিলেন, এই কথা বলিয়া তাঁহাদের সম্মান বৃদ্ধি করিতে পারি না। তাঁহারা কত যুগযুগান্তরের অবিরত চেষ্টার দ্বারা বিদ্যামন্দির গঠিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা আমরা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি কি? বহু শতাব্দীর চেষ্টার ফল আজ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত—কতকাল যে অতীত হইয়াছে আমরা তাহার ধারনাও করিতে পারি না। জ্ঞানের এই উৎকর্ষের পরও তাহারা বলিয়াছেন যে, বেদ যদি সত্যের বিরোধী হয়, তাহা হইলে বেদকে পর্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হইবে—এতটা মহত্ব তাঁহাদের ছিল।

…আজ সেই তেজের অভাব ঘটিয়াছে। আমাদের জীবনে আজ যে অবসাদ আসিয়াছে, মৃত্যুর অগ্রদূত সেই অবসাদকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া আমাদিগকে নবজীবন লাভ করিতেই হইবে। এই সঞ্জীবনী শক্তি আমাদিগকে আমাদের মধ্যে হইতেই পাইতে হইবে।—আমাদের রাষ্ট্রীয় চেতনার মধ্যে সেই জাগরণের সাড়া পাওয়া যাইতেছে।

জ্ঞান কোন জাতি বিশেষের সম্পত্তি নহে। অতীতে ভারত জগতের সমৃদ্ধি বর্ধন করিতে তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ দেয় দান করিয়াছে। সেই শক্তি কি চিরতরে অন্তর্হিত হইয়াছে? বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রচারের কথাই ধরা হউক। বৃহৎ আবিষ্কারের জন্য জ্বলন্ত অন্তর্দৃষ্টি, আবিষ্কারের ক্ষমতা এবং বিশেষ হস্তকৌশলের আবশ্যক হয়। উদ্দেশ্যবিহীন অনুসন্ধানে কোন বিশেষ ফল হয় না। আবার অবাধ কল্পনা বাজে কল্পনার সৃষ্টি করে। খাঁটি অনুসন্ধান-কারীকে নিজের চিন্তাধারাকে বাহ্য জগতের সত্যের সহিত মিলাইয়া দেখিতে হয়। সত্যের কষ্টিপাথরে তাহার কল্পনার পরখ করিয়া লইতে হয়। ভুল হইলেই নির্দয়ভাবে সেই কল্পনা পরিত্যাগ করিতে হয়। …দেশের সম্মুখে দুটি ভীষণ বিপদ উপস্থিত। প্রথম বিপদ বিদেশীয় পীড়ন এবং আভ্যন্তরীন অশান্তি। শান্তি ছাড়া রাষ্ট্রীয় উন্নতি সম্ভব নহে। যদি বিদ্যার্থীরা বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের সেনাদলে ভর্ত্তি না হয়, তবে নাগরিক হিসাবে তাহাদের প্রাথমিক কর্ত্তব্যে ত্রুটি হইবে। কঠোরতা এবং শৃঙ্খলারক্ষা শিক্ষা করা তাহাদের কর্ত্তব্য ; কারণ কেবলমাত্র তদ্দ্বারাই তাহারা মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিবে।

দ্বিতীয় বিপদ আরও সমূহ এবং সর্বত্র প্রসারিত। অন্যত্র যেমন, এখানেও তেমন বেকার সমস্যা দারুণ অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছে। ...শান্তির সময়ে যাহা ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে, ক্ষুধার তাড়নায় হতাশ হইয়া লোকে তাহা নষ্ট করিয়া ফেলে। আমাদের দেশে এত খনিজ ধনরত্ন নিহিত থাকা সত্ত্বেও আমাদিগকে যে এই অবস্থায় পড়িতে হইয়াছে, ইহা অতীব শোচনীয়। অনবরত এই মিথ্যা প্রচারিত হইয়া আসিয়াছে যে, কোন বৃহৎ আবিষ্কার করিতে আমরা সক্ষম নহি। এই প্রচারের ফলেই কেহ খনিজ কারখানার কার্যে উদ্যোগী হইতে সাহসী হয় নাই। এই অপবাদ যে মিথ্যা, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। আজকাল এমন সমস্ত যুবক আছে, যাহাদিগকে উপযুক্তরূপে পরিচালিত শিক্ষাগারে শিক্ষাদান করিলে তাহারা যথোপযুক্ত শিক্ষালাভ করিতে সমর্থ হয়। আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন প্রত্যেক দেশের মত আমাদেরও কর্ত্তব্য উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশীর মুখাপেক্ষী না হওয়া।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি বিদ্যাচর্চার প্রসারের পরিচায়ক। কিন্তু ইহাতে বিপদও আছে। প্রথম হইতেই এই বিপদ হইতে সাবধান থাকিতে হইবে। জ্ঞান প্রচারই একমাত্র লক্ষ্য না হইয়া সাম্প্রদায়িক মতদ্বৈধ ইহাতে বৃদ্ধি পাইতে পারে। ফলে বিদ্যাপীঠসমূহ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচারের কেন্দ্রে পরিণত হইতে পারে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবর্ত্তে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মৈত্রী থাকা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় এক একটি বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা দান করিতে পারেন। অধ্যাপক এবং বিদ্যার্থীদের এক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের সুবিধা থাকা কর্ত্তব্য।

আমি চিরকালই বিদ্যার্থী। বয়োবৃদ্ধি সত্ত্বেও আমি দুঃসাধ্য কার্যের অনুসরণে যুবকের মত বল পাই। জীবিকা হিসাবে আমি শিক্ষকতা গ্রহণ করি নাই, সর্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি বলিয়াই ইহা গ্রহণ করিয়াছি। সমগ্র ভারতের ছাত্র-সম্প্রদায় আমাকে তাহাদের সুহৃদ, পথপ্রদর্শক বলিয়া মনে করে। এই দুর্লভ সৌভাগ্য আমার লাভ হইয়াছে। প্রতিদানে আমি আমার সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাভিন্ন আর কিছু দিবার নাই। আমি তোমাদের দুর্বলতার কথা বলিব না ; আমি তোমাদের শক্তির উদ্বোধন করিতে চাহি, সুতরাং যাহা সহজ, আমি তাহা

তোমাদের নিকট উপস্থিত করিব না, যাহা কঠিন, তাহাই তোমাদিগকে গ্রহণ করিতে সর্বতোভাবে উপদেশ দিব। তোমাদিগের উত্তরাধিকার তোমাদিগকে সাহায্য করুক, কিন্তু তোমরা অতীতের দাস না হইয়া পূর্বপুরুষগণের জ্ঞান-রাশির প্রকৃত উত্তরাধিকারী হও।

নানাপ্রকার আশঙ্কা তোমাদের মনকে আন্দোলিত করিতেছে। বিদ্যায়তনে যে শৃংখলা রক্ষা করিতে হয়, তাহাকে, অনেকেই পীড়ন বলিয়া মনে করিয়া তাহার হাত হইতে নিস্কৃতি পাইবার আশা করিতেছে। তোমরা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি যে, সেই নিরোধ করিবার শক্তিই সর্বাপেক্ষা বৃহৎশক্তি। তোমাদের জীবনের এই সময়েই তোমাদিগকে এই নিরোধ শক্তি লাভ করিতে হইবে।

স্বাধীন চিন্তাকে দমন করিয়া রাখিতে পারে এমন শক্তি কি কোথাও আছে? বহু বৎসরের আত্মনিরোধের ফলে তোমরা ভবিষ্যৎ জীবন গঠন করিবার শক্তি-লাভ করিবে। পোষাক পরিচ্ছদ নহে—বিপদের ঘাত প্রতিঘাতই তোমাদিগের দেহকে শক্ত করিয়া তুলিবে। বৃথা কথা বলিয়া শক্তির অপচয় করিও না। অপরকে উপদেশ দিতে যাইও না, নিজের উপদেশ নিজে পালন করিও। যে দুর্বল সকলের সহিত সংগ্রামে যোগ দেয় না, সে কিছু পায়ও না, তাহার দিবারও কিছু নাই। জীবনে যে সংগ্রাম করিয়াছ এবং জয়ী হইয়াছে, সেই তাহার অভিজ্ঞতাদ্বারা জগৎকে সমৃধশালী করিতে পারে। এই বীরভূমি ভারতবর্ষে অতীতকালে কর্মেরই প্রশংসা করা হইত, নিস্কৃয়তার নহে। এমনকি ভারতের যুদ্ধক্ষেত্রেই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানের উন্মেষ হইয়াছিল। সকলের জন্য যে সুখ আমরা দিতে পারিনা, তাহা প্রকৃত সুখ নহে। দেশের আহ্বান যখন সর্বত্র প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে, তখন আমরা অলসভাবে বসিয়া থাকিতে পারিনা ব্যক্তিগত মুক্তি পর্যন্ত কামনা করিতে পারি না।"

কোলকাতা ফেরার কিছুদিনের মধ্যেই ভারতের বড়লাট লর্ড রিডিং বসু বিজ্ঞান মন্দির পরিদর্শনে আসেন। এই পরিদর্শনকে কেন্দ্র করে ছোট্ট একটি ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি জগদীশচন্দ্রের অনমনীয় চরিত্রের পরিচায়ক। ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রাক্তন কর্মী আশুতোষ গুহঠাকুরতা তাঁর "আচার্য জগদীশচন্দ্রকে যেমন দেখেছি" প্রবন্ধে বলেছিলেন, "ইনস্টিটিউটে আমার যোগদানের কয়েক মাস পরেই তদানীন্তন বড়লাট বাহাদুর লর্ড রিডিং ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের প্রাক্কালে কলকাতার পুলিশ

কমিশনার টেগার্ট সাহেব তাঁর দক্ষিনহস্তস্বরূপ পূর্ণ লাহিড়ী মহাশয়কে ইনস্টিটিউটের মধ্যে নিরাপত্তামূলক পুলিশী ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য জগদীশচন্দ্রের কাছে পাঠান। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন ইনস্টিটিউটের মধ্যে তিনি এ ব্যাপারে কোন পুলিশ ঢুকতে দেবেন না। তাঁরা ইচ্ছা করলে ইনস্টিটিউটের বাইরে থাকতে পারে। ইনস্টিটিউটের ভিতরে তিনিই ভাইসরয়ের নিরাপত্তার জন্য দায়ী থাকবেন। টেগার্ট নিজে এসে বুঝাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তিনি অনড়। তিনি বললেন, এ নিয়ে পীড়াপীড়ি করলে পরিদর্শন বন্ধ করে দেবার জন্য বড়লাট বাহাদুরের কাছে তিনি অনুরোধ জানাতে বাধ্য হবেন। টেগার্ট তখন অনুপায় হয়ে বললেন, তিনি কখনও ইনস্টিটিউট দেখেননি, তাঁকে অন্তত সঙ্গে আসার অনুমতি দেওয়া হোক। তার উত্তরে তিনি বললেন যে, এবার বড়লাটের সঙ্গে তাঁকে তিনি পরিদর্শনের জন্য নিমন্ত্রণ করতে অক্ষম, ইচ্ছা করলে তিনি স্বতন্ত্রভাবে একদিন এখানে আসতে পারেন। টেগার্টকে শেষ পর্যন্ত বিফল মনোরথ হয়েই ফিরতে হল। তিনি আমাদের সতর্ক করে দিলেন। পশ্চিমদিকের দেয়ালের দিকে আমরা যেন নজর রাখি, পুলিশ আমাদের অপদস্থ করবার জন্য তাদের সাকরেদ দিয়ে ঢিল ফেলতে পারে। নজর রাখবার জন্য ঐদিকে দুজন মালিকে মোতয়েন করা হল।

ইনস্টিটিউটের ভিতরে পুলিশী ব্যবস্থা ছাড়াই লর্ড রিডিং তাঁর কাউন্সিলের কয়েকজন সদস্য ও তদানীন্তন সেনাধ্যক্ষকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। আমরা গেটটির কাছে আচার্যের পেছনে জড় হয়েছিলাম। ···কিন্তু যা আমাদের সবচেয়ে মুগ্ধ করেছিল সেটি হচ্ছে এই শীর্ষ রাজপুরুষদের সঙ্গে আচার্যদেবের সমপর্যায়ের বন্ধুর মত ব্যবহার। ইতিপূর্বে এই সব রাজপুরুষদের সঙ্গে আমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের একত্রে যেসব ছবি চোখে পড়েছে, সেক্ষেত্রে এক পক্ষের গর্বিতভাব ও অপর পক্ষের একটু হীনম্মতার ভাবই যেন লক্ষ্য করেছি। কিন্তু এক্ষেত্রে তার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমই চোখে পড়ল। তিনি শুধু বৈজ্ঞানিক তত্ত্বই ব্যাখ্যা করে বুঝাচ্ছিলেন এমন নয়, ফাঁকে ফাঁকে শাসন ব্যবস্থায় নানা ত্রুটি ও কুফল সম্বন্ধে অনুযোগ করে নিজের মতামত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে চলেছিলেন। মনে হয়েছিল যেন অতবড় ধুরন্ধর ইংরেজ তাঁর ব্যক্তিত্বে অভিভূত হয়ে পড়েছেন। মুখে কোন প্রতিবাদের ভাষা যোগাচ্ছে না। নতমস্তকে সব স্বীকার করে নিচ্ছেন।" প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই ঘটনার কিছুদিন বাদে কুখ্যাত

টেগার্ট সাহেব বসু বিজ্ঞান মন্দির পরিদর্শনে এসেছিলেন। এ বিষয়ে আশুবাবু লিখেছিলেন, "…পুলিনচন্দ্র দাস মহাশয় আন্দামান থেকে মুক্তি পাবার পর আর্থিক কষ্টে দিনযাপন করছিলেন। তিনি (জগদীশচন্দ্র) জানতে পেরে পুলিনবাবুকে ডেকে লাঠি ও ছোরা খেলা শেখাবার জন্য একটি মাসিক ভাতায় (বসু বিজ্ঞান মন্দিরে) নিয়োগ করেন। আমাদের বলে দিলেন, "প্রত্যেকে বিকালে লাঠি খেলবে, এতে স্বাস্থ্য ভালো হবে এবং গবেষণার কাজে উৎসাহ পাবে। ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়েও এরূপ একটা ব্যবস্থা করেছিলেন। …এই সময় একদিন টেগার্ট সাহেব ইনস্টিটিউট দেখতে এলেন। তিনি বিকালের দিকে আসেন। আমাদের কারো কারো রাজনৈতিক কারণে পুলিশের খাতায় নাম ছিল। পুলিনবাবু আমাদের লাঠিখেলা শেখান। এসব তাঁর না জানা থাকার কথা নয়। ইনস্টিটিউট দেখবার ছুতো করে নিজের চোখে এসব দেখে যাবার উদ্দেশ্যই হয়তো ছিল। তার জন্য কোন ডিমনস্ট্রেশনের ব্যবস্থা হয়নি। জগদীশচন্দ্র টেগার্ট সাহেবকে সেখানে নিয়ে এলেন। রসিকতা করে বললেন, "তুমি ওরকমভাবে তাকাচ্ছ কেন? তোমাদের পুলিশের চোখ বড় খারাপ। এরা সব ভালো ছেলে।" পুলিনবাবুকে দেখিয়ে বললেন, "ওকে চেন নিশ্চয়ই! তোমাদের দেশে জন্মালে ইনি হয়তো একজন মস্ত বড় জেনারেল হতেন। নিজের দেশকে ভালোবাসেন বলে তাঁকে তোমাদের হাতে অনেক নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে।" টেগার্ট চুপ করে ছিলেন। মুখে মৃদু হাসি দেখা যাচ্ছিল।…"

১৯২৫ থেকে ১৯২৭ সালের মধ্যে জগদীশচন্দ্র দুবার ইয়োরোপ যাবার সুযোগ পেয়েছিলেন। ১৯২৫ সালে যাওয়া সম্ভব হয়নি। গিয়েছিলেন ১৯২৬ সালের ২৬শে জুলাই তারিখে অনুষ্ঠিত ইনটেলেকচুয়াল কো-অপারেশন কমিটির অধিবেশনে যোগ দিতে। অধিবেশনের শেষের বাকি সময়টুকু বৈজ্ঞানিক সফরের রূপ নিয়েছিল। এ সফরে দেখা হয়েছিল আইনস্টাইন, লোরেনৎসের মত বিজ্ঞানীর সাথে। জগদীশচন্দ্র বক্তৃতা দিয়েছিলেন জেনিভা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সভায় উপস্থিত বিজ্ঞানীমণ্ডলীর প্রতিনিধি হিসেবে আইনস্টাইন বলেছিলেন, "জগদীশচন্দ্র পৃথিবীকে যে সব অমূল্য তত্ত্ব উপহার দিয়েছেন তার যে কোন একটির জন্য বিজয় স্তম্ভ স্থাপন করা উচিত। জেনিভা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও এ সফরে তিনি অক্সফোর্ড ব্রিটিশ এসোসিয়েশন, ব্রুসেলস্ বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য স্থানে ভাষণ দিয়েছিলেন। ব্রুসেলস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের সভায় সভাপতি

ছিলেন বেলজিয়ামের রাজা লিওপোল্ড। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাজা লিওপোল্ড এক বিশেষ সভায় জগদীশচন্দ্রকে রাজকীয় উপাধি (Order de Leopold) দান করেন।

দেশে ফেরার পর ৩০শে নভেম্বর তারিখে বসুবিজ্ঞান মন্দিরের নবম বার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। উৎসবে প্রদত্ত ভাষণে এবারকার বিদেশ সফর সম্পর্কে বলতে গিয়ে জগদীশচন্দ্র বলেন, "...সর্বত্রই বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল। অক্সফোর্ড ব্রিটিশ এসোসিয়েশনের নিকট প্রদত্ত আমার বক্তৃতা বহুদূর পর্যন্ত এত প্রবল উৎসাহের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিল যে, সমস্ত বক্তৃতাটি তার যোগে পৃথিবীর সর্বত্র প্রেরিত হইয়াছিল এবং পরদিনই প্রাতঃকালে ইয়োরোপ ও আমেরিকার সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইয়োরোপ এবং আমেরিকায় একসঙ্গে আমার অনুসন্ধান ফলের একটি সাধারণ গ্রাহ্য বর্ণনা প্রকাশিত হইবে।

মহামান্য বেলজিয়াম সম্রাট ভারত ভ্রমণকালে আমার বিজ্ঞান মন্দিরে অনুসন্ধানকার্য দেখিয়া বিশেষ তুষ্টিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি জীবন বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাকে বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করেন। রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ধারাবাহিক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। সভাসদমণ্ডলী পরিবৃত সম্রাট বাহাদুর স্বয়ং এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যবৃন্দ এই বক্তৃতা শুনিবার জন্য উপস্থিত ছিলেন। আমার পরীক্ষা কার্যের জন্য রাজকীয় উদ্যানে পূর্ব হইতেই উপযুক্ত বৃক্ষ জন্মান হইয়াছিল,—তাহার ফলে আমার প্রদর্শনী বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। প্যারিতে আমি সোর্বোন এবং নেচারাল হিস্টোরী মিউজিয়মে বক্তৃতা করি। চিকিৎসক এবং প্রানীতত্ত্ববিদ্‌গণ আমার আবিস্কৃত পন্থা এবং অনুসন্ধান ফলের বিশেষ প্রশংসা করেন। ল্যাটিন ভাষী দেশসমূহে জিজ্ঞাসুদের আকাঙ্খা পূরণকল্পে বিখ্যাত বিজ্ঞান পুস্তক প্রকাশকগণ আমার পুস্তকের ফরাসী সংস্করণ প্রকাশ করিবার উদ্যোগ করিয়াছেন।..."

জগদীশচন্দ্র ১৯২৭ সালের জানুয়ারী মাসে লাহোরে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি হিসেবে ভাষণ দেন। এর কিছুদিনের মধ্যেই মে মাসে আবার তিনি স্বল্পকালের জন্য ইয়োরোপ যাত্রা করেন। জীবনের এ পর্যায়ে জগদীশচন্দ্র সুযোগ পেলেই ইয়োরোপে যাওয়া পছন্দ করতেন। মনে হয় এইভাবে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চার নবলব্ধ আসনকে বিশ্বের দরবারে

স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করতেন। এই সফরটি ছিল জগদীশচন্দ্রের অষ্টম ইয়োরোপ সফর।

এই সফরে ফ্রান্সে পেঁছেই জগদীশচন্দ্র কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দেন। চাক্ষুষ আলাপ হয় রম্যাঁ রলাঁর সঙ্গে। এই সাক্ষাৎ ও পরবর্তী সময়ের সাক্ষাৎকারকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি রম্যাঁ রলাঁর ডায়রী থেকে জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে কিছু মূল্যবান তথ্য শ্রদ্ধেয় অবন্তীকুমার সান্যাল পাঠকদের উপহার দিয়েছেন তাঁর "রম্যাঁ রলাঁ ও জগদীশচন্দ্র বসু" প্রবন্ধে। পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রবন্ধটি থেকে নির্বাচিত অংশবিশেষ তুলে ধরছি। তাতে শুধু বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র নন, মানুষ জগদীশচন্দ্র সম্পর্কেও অনেক তথ্য জানা যাবে।

"···প্রথম সাক্ষাতেই* রলাঁ এমন মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তাঁর দিনপঞ্জীতে প্রথমেই উচ্ছ্বসিত হয়ে লিখেছিলেন : তিন চার ঘণ্টা ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে এই মানুষটি যে প্রাণশক্তি, বুদ্ধিমত্তা, উত্তাপ ছড়ালেন তার একটা ধারণা কী করে দিই! মানুষটি ছোটখাট, বুদ্ধিদীপ্ত দুই চোখ, কালো ভুরু, রুপোলি চুল; একটু সেমিটিক রক্ত-মেশা ভূমধ্য সাগরাঞ্চলের মানুষের মতো রোদে পোড়া গায়ের রঙ, ছোটখাট দুটি শুকনো হাতের (প্রতিভাবানের হাত) নখ ছোট করে কাটা, বয়সের তুলনায় এক অবিশ্বাস্য (আমার সমান বা আমার চেয়েও উচ্চস্তরের) তারুণ্য এবং বলার, চিন্তা করার, বেঁচে থাকার এক আনন্দ—আমাকে মনে পড়িয়ে দেয় গৌরবময় আবিষ্কারের ঠিক পরেকার (১৯১৫) আইনস্টাইনকে।

জগদীশচন্দ্র ছিলেন অক্লান্ত বক্তা, বিশেষ করে রলাঁর মতো উৎসাহী শ্রোতাকে পেয়ে তাঁর আলোচনা হয়ে উঠেছিল বিচিত্র ও বহুমুখী। প্রকৃতপক্ষে প্রথম দর্শনে রলাঁর কাছে তিনি তাঁর আজন্ম বৈজ্ঞানিক সাধনার মর্মকথা উদ্ঘাটিত করার প্রবল উৎসাহ বোধ করেছিলেন।······

---

*রলাঁ জগদীশচন্দ্রকে দেখেছিলেন পরিণত বয়সে। ১৯১৭ সালের ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে Capital পত্রিকার সম্পাদক তাঁর সম্পাদকীয় প্রবন্ধে জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলেন, Many years ago I sat, in an improvised refreshment room at Gaya, at a table next to another at which a man of remarkable appearance was lounching. I was attracted by his intellectual face and bird-like charm of movement. I enquired his identity of my Companion—a professor of physics by the same token.

…রলাঁ জগদীশচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন ভারতের বিজ্ঞানের অতীত সম্পর্কে। তিনি উত্তরে বললেন: "দু হাজার বছর আগেই ভারতবর্ষে রসায়নের দ্বৈত প্রস্থান ছিল: এক প্রস্থান পদার্থের ছদ্ম-ধর্মকে ঈশ্বরে, ও যে মন তাদের কল্পনা করে তাতে আরোপ করত। অন্য প্রস্থান অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক ভাবেই স্বরূপেই পদার্থের পর্যবেক্ষন করত, এবং এই তত্ত্বটি নিস্কাষিত করেছিল: যে কোনো পদার্থই পরম ভালো বা পরম মন্দ নয়, প্রত্যেকেই ক্ষেত্রানুসারে (এবং মাত্রানুসারে) ভালো অথবা মন্দ।"…

…সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্র যে স্বচ্ছ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন তা রলাঁর তীক্ষ্ন দৃষ্টি এড়ায় নি। কারা রাজনীতির কল-কাঠি নাড়ে তা তিনি সহজেই ধরতে পারেন; মিথ্যার মুখোশের আড়ালে লীগ অব্ নেশনসের প্রকৃত রূপটি চিনে নিতে তাঁর অসুবিধে হয়নি। মুসোলিনি বারংবার নিমন্ত্রণ জানালেও তিনি কখনও কর্ণপাত করেন নি। মুসোলিনির নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে দুইজন ভারতীয় তাঁদেরএকজন জগদীশচন্দ্র, অপরজন জহরলাল নেহেরু। রলাঁ এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, রাজনৈতিক দিক থেকে "তিনি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অনেক বেশী দূরদর্শী।*…

…বিজ্ঞান সম্পর্কে বিবেকানন্দের চিন্তাধারা কী ছিল তা জানার জন্যে রলাঁর প্রবল কৌতূহল।…জগদীশচন্দ্র বিবেকানন্দকে খুবই ভালো করে জানতেন, তাঁকে ভালোবাসতেন। তাঁর·মধ্যে জাতীয়তাবাদী প্রবনতা দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে বিবেকানন্দ তাঁকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিলেন, 'তিনি যেন ভারতীয় মনের বৈজ্ঞানিক মূল্যের দাবি নিয়ে কেবলমাত্র বিজ্ঞানেই জাতীয়তা-বাদকে দেখান'। বিবেকানন্দের মতোই আলৌকিকতা, তুচ্ছতাকে তিনি বিশ্বাস করেন না। থিওসফির প্রতিও তাঁর একই রকম অবজ্ঞা। জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা থেকে রলাঁ এই সিদ্ধান্তে পেঁছিলেন যে, "ভারতীয় ধর্মীয় মহৎ স্বতঃ-

*এ প্রসঙ্গে জগদীশচন্দ্রের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি সম্পর্কে একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি। আশুতোষ গুহঠাকুরতা তাঁর "আচার্য জগদীশচন্দ্রকে যেমন দেখেছি" প্রবন্ধে বলেছেন, "… ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইয়োরোপ সফর থেকে ফিরে এসে কথা প্রসঙ্গে আমাদের কাছে বললেন, "চার্চিল ভবিষ্যতে ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী হবে। চার্চিল তখন বিলাতের কনজারভেটিভ পার্টির একজন উদীয়মান নেতা ঠিকই, তবে তিনি ভবিষ্যতে বিলাতের প্রধানমন্ত্রীর পদ অধিকার করতে পারেন; সেই সম্ভাবনার কথা তখন কারো মনে উদয় হবার কারণ ঘটে নি।…"

লব্ধ বোধের (যা তুরীয় আনন্দ পর্যন্ত যেতে পারে) অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত হচ্ছে সব সময়েই বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণ ; এবং সাময়িক হলেও। যা বুদ্ধিকে বিসর্জন দেওয়ায়, তার প্রতিই তার বিতৃষ্ণা।"···

···জগদীশচন্দ্রকে প্রচণ্ড লড়াই করতে হয়েছে মানসিক ভীরুতা, অবিশ্বাস এবং সংস্কারের বিরুদ্ধে। তাঁর পেশার সকলেই তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। মানুষের বাইরেও যে "আবেগময়" জীবন আছে; তাঁর এই আবিষ্কারে প্রথম দিকে লর্ড কেলভিন তাঁকে বলেছিলেন, "না, এটা সম্ভব নয়। এটা হবে ঈশ্বর সম্পর্কে শ্রদ্ধার একটা অভাব। তিনি চেয়েছিলেন মানুষকে বিশেষ অধিকার দিতে।" জগদীশচন্দ্র তার প্রতিবাদে জানিয়েছিলেন, ঈশ্বরকে গণ্ডিবদ্ধ করার দাবিটাই তো শ্রদ্ধার অভাব।···তিনি নিজেকে মনে করেন প্রাচীন ভারতের ক্ষত্রিয়ের মতো মনের জগতের ক্ষত্রিয়। এই ক্ষত্রিয়োচিত লড়াইয়ের প্রসঙ্গে গান্ধীর কথা উঠল। রলাঁ লিখেছেন : জগদীশচন্দ্র গান্ধীকে ভালো করেই জানেন এবং গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি আছে। কিন্তু তাঁর বিচারে গান্ধী বড়োই সংকীর্ণ। তিনি শিল্প বিজ্ঞানের প্রতি বড়োই উদাসীন বা খড়্গহস্ত। মনের এই স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয় ঐশ্বর্যের তাঁর বড়োই অভাব। ঠিক এর বিপরীত, জগদীশচন্দ্র চান, মনের সৃষ্টির সমস্ত শক্তিগুলোকে তরুণদের মধ্যে উদ্দীপ্ত করা হোক—এই শক্তিগুলো সর্বজনীন প্রকৃতির স্বর্গীয় পরিকল্পনার অঙ্গ—অপরিহার্য অঙ্গ। তরুণ বংশধরদের মাধ্যমে সৃষ্টির এই অবিশ্রান্ত উৎসার ছাড়া প্রকৃতি ঝিমিয়ে যায়, ঘুমিয়ে পড়ে এবং অসাড় হয়ে পড়ার ভয় থাকে। শেষদিন পর্যন্ত তাকে তরুণ থাকতে হবে এবং চিরকাল থাকতে হবে নব তারুণ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে।···

···দুই বন্ধুর আবার সাক্ষাৎ হল ভিলন্যভেই এক বছর পরে ১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে।···সেবারের সাক্ষাৎকারের প্রথমেই রলাঁ লিখেছেন : আগের চেয়ে তিনি অনেক বেশি প্রাণবন্ত ও উচ্ছল। আমার বোন তাঁর কথাগুলো যাতে তর্জমা করতে পারেন তার জন্যে একটু একটু থামতে না হলে, এক নিশ্বাসে দু' ঘণ্টা কথা বলে যেতে থামতেন না। আলোচনা প্রসঙ্গে নিজের কর্মতৎপরতাকে জগদীশচন্দ্র ভারতীয় ক্ষত্রিয়ের বৈশিষ্ট্য বলে গর্ব প্রকাশ করলেন, এবং বললেন "কর্মতৎপরতায় আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে আমি দশটি ইয়োরোপীয়কে চ্যালেঞ্জ করি।" বিবেকানন্দকেও তিনি ক্ষত্রিয় হিসেবে দাবি করলেন। জগদীশচন্দ্র জীবনে রাজসিকতার সমর্থক। তিনি বললেন, বিবেকানন্দও রাজসিকতার

সমর্থক ছিলেন। 'বিবেকানন্দ বলতেন, দারিদ্র্য ও ত্যাগের সমর্থন করাটা যেমন ভালো; তেমনি ভালো ঐশ্বর্য ও রাজকীয় জীবনযাত্রার সমর্থন করাটাও। ...জগদীশচন্দ্র উচ্চ কণ্ঠে ঐশ্বর্য, ভোগ, জয়, সক্রিয় ও উচ্ছল সমস্ত শক্তির মাহাত্ম্য কীর্তন করলেন,—কিন্তু সে সব নিজের জন্যে নয়, ভারতের সমস্ত মানুষের জন্যে। গান্ধীর তপশ্চর্যায় ও প্রকৃতিতে বা সরল জীবনে ফিরে যাবার বাণীর প্রতি তাঁর কোনোই সহানুভূতি নেই।—তিনি সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার অতি শক্তিশালী মূর্ত প্রকাশ, সেইজন্যে প্রগতির পিছনে না ফিরে কেবলই—কেবলই সামনে এগিয়ে চলার ঘোষিত প্রবক্তা না হয়ে পারেন না।—তিনি ভারতবর্ষের বৃহৎ শিল্প বিকাশের পক্ষে; বললেন, একে আটকাতে ব্যর্থ হয়ে গান্ধীর খদ্দর কেবল জাপানী মাল ডেকে আনার কাজে লাগছে; জাপান এরই মধ্যে পাকা হাতে তৈরী করা মেকি "মেড ইন টোকিও" খদ্দরে ভারতবর্ষ ছেয়ে ফেলেছে।"...

এরপর রলাঁ তাঁকে প্রশ্ন করলেন 'রাজযোগ' সম্পর্কে। এ ব্যাপারে জগদীশচন্দ্রের ধারণা অনেকটা তাঁর নিজের মতো জেনে খুশি হলেন। জগদীশচন্দ্রের বিশ্বাস রাজযোগে বিরাট শক্তিলাভ হয়, কিন্তু এক সীমার বাইরে নয়। অরবিন্দের প্রতি প্রবল শ্রদ্ধা জানিয়েও বিশ বছরের নির্জন বাসে ভারতের মুক্তির জন্যে তাঁর অলৌকিক ফলপ্রাপ্তির আশা সম্পর্কে তিনি সংশয় প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন, "যোগের মাধ্যমে যদি এমন ব্যাপার সম্ভব হত, তাহলে প্রাচীন ঋষিরা কেন তার ব্যবহার করতেন না তা বোঝা যায় না।...

...জগদীশচন্দ্র ও লেডি বসু রলাঁর বাড়িতে এলেন চা-খেতে। রলাঁ লিখেছেন "জগদীশচন্দ্র একটুও পাল্টান নি; তাঁর তরুণ-সুলভ প্রাণশক্তি তেমনি অক্ষুন্ন আছে। কিন্তু পুরোপুরি মন জুড়ে আছে ভারতবর্ষ ও তার সংগ্রামের চিন্তা, তাতে তিনি ক্ষয় হয়ে যাচ্ছেন। আর কিছুই তিনি ভাবতে পারছেন না। তাঁর সমস্ত কাজ বন্ধ হয়ে গেছে।...তিনি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অন্য ধাতুতে গড়া। আমি স্বীকার করছি, তাঁকে আমার বেশি মনে ধরে।...তিনি ভালোই জানেন যে ভারতবর্ষ জিতবে; কিন্তু তিনি ভাবছেন, অপরিসীম দুঃখভোগের কথা—আজকের দুঃখভোগ, আগামীকালের দুঃখভোগের কথা। তিনি দেখেছেন; ইংলণ্ডের হাতে ভারতবর্ষ হয়েছে শিক্ষাহীন, নির্মম নির্যাতীত, বাকরুদ্ধ, অন্ধ। তাঁর জিজ্ঞাসা, যাঁদের উপরে তাঁর আস্থা আছে, মাত্র সেই দুইজন রাজনৈতিক নেতা গান্ধী(অত্যন্ত অসুস্থ) ও মতিলাল নেহেরুর মৃত্যুর পর ভারত-

বর্ষের কী হবে।"...প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রম্যাঁ রলাঁ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Jean christopher এর প্রথম পাতায় নিজ হাতে অভিনন্দন লিখে জগদীশচন্দ্রকে উপহার দিয়েছিলেন।

দেশে ফেরার পর ১৯২৭ সালের অক্টোবর মাসে জগদীশচন্দ্র একটি চিঠি পেলেন। লিখেছেন মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। চিঠিতে অধ্যাপক শীল জগদীশচন্দ্রকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সমাবর্ত্তন উৎসবে ভাষণ দান করার জন্য। অপ্রকাশিত আমন্ত্রণ লিপিটি পাঠকদের উদ্দেশ্যে তুলে ধরছি।

Mysore
Dated The 2nd Oct
1927

My dear Sir Jagadis,

I have very great pleasure in conveying to you the invitation of His Highness the chancellor of the University to deliver the Address at the next convocation to be held at Mysore on the 3rd November. The University will feel it a great honour if you kindly accept the invitation.

I need hardly add that by accepting the invitation you will be conferring a personal obligation upon me. For "auld long Syne", do kindly consent.

Yours Sincerely
Brajendranath Seal

এই আমন্ত্রণের পরিপ্রেক্ষিতে জগদীশচন্দ্র ৩রা নভেম্বর তারিখে মহীশূরে বিশ্ববিদ্যালয়ে দীক্ষান্ত ভাষণ দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কাশী ও মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও জগদীশচন্দ্র বিভিন্ন সময়ে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়, নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভাষণ দেন।

মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ ভাষণটি তখনকার আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত ভাষণের অংশবিশেষ পাঠকদের উদ্দেশ্যে তুলে ধরা হলো।

"...আমি বহু বর্ষ পূর্বে শিক্ষকতা আরম্ভ করিয়াছিলাম—বৃত্তি হিসাবে

নহে, সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত হিসাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্তির পরও যাহাদের উচ্চাকাঙ্খা তৃপ্ত হয় নাই, সে সমস্ত যুবকদিগকে পরিচালিত করিয়া মনুষ্যত্ব লাভে সাহায্য করাকে জীবনের ব্রত করা অপেক্ষা মহত্তর কিছু ধারণা আমি করিতে পারি নাই।

…আমার জীবনযাত্রার প্রারম্ভে আমি প্রায়ই শুনিতাম যে, ভারতবর্ষ প্রাচীন দার্শনিকের দেশ, এজন্যই ভারতবর্ষের যাহা কিছু গৌরব সে গৌরবও লোপ পাইয়াছে। লুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধার হইবে না। এ সমস্ত কথায় আমি নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিলাম।

তোমরা হয়তো জিজ্ঞাসা করিবে যে, আমার ভ্রান্তি কি করিয়া দূর হইল, বিরাট বিঘ্ন অতিক্রম করিবার অধ্যবসায় আমি কোথা হইতে পাইলাম। আমার উত্তর এই যে, আমার কার্যই ছিল আমার শিক্ষক, ব্যর্থতাই আমাকে আবশ্যক উৎসাহ দিয়াছে এবং অতীতের অভিজ্ঞতাই ছিল আমার উৎসাহের চির উৎস।…

…যাহা অসম্ভব বা যাহা শুধু অন্য দেশেই সম্ভব, সে সমস্ত বিষয়ের কথা আজ তোমাদিগকে শুনাইব না। ভারতবর্ষে যাহা করা যাইতে পারে এবং যাহা করা হইয়াছে তাহার কথাই আমি তোমাদিগকে শুনাইব। তোমাদিগকে যে সমস্ত বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হয় আমাকেও সেই সমস্ত বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হয়। তোমরা যখন নৈরাশ্যের অন্ধকারে নিমজ্জিত হইবে তখন তোমরা এই কথাটি স্মরণ রাখিও যে, বহুবর্ষ অধ্যবসায় সহকারে বিঘ্নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার পূর্বে আমি আশার ক্ষীণ আলোকরেখাও দেখিতে পাই নাই। আমার এই বিশ্বাস ছিল যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার নিকট পরাজয় স্বীকার করায় মনুষত্ব নাই। অসীম সাহসে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সম্মুখীন হইয়া তাহাকে পরাজিত করাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব।…

…জ্ঞানের গরিমা এবং জ্ঞান প্রচার করিয়া জগৎকে সমৃদ্ধশালী করিবার শক্তি দ্বারাই একটা জাতীয় জীবনের পূর্ণ অভিব্যক্তি লাভ হয়। যে জাতি সে শক্তি হারাইয়াছে, যে শুধু পরের নিকট হইতে অনুগ্রহই লয়। পরকে কিছুই দেয় না, সে জাতির জীবন শেষ হইয়া আসিয়াছে। কৃত্রিম উপায়ে একটা বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করা যায় না। কোন সনন্দ বলেও তাহার প্রতিষ্ঠা স্থায়ী করা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার্থীরা জগৎকে যাহা দিবে তাহার উপরই তাহার প্রতিষ্ঠা নির্ভর করিবে। সুতরাং জীবন্ত এবং শক্তিশালী হইতে হইলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রথম আদর্শ হওয়া কর্তব্য, স্বীয়

অভিব্যক্তি এবং সেই অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া রাষ্ট্রসংঘে ভারতকে স্বীয় মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা করা।

সমালোচকগণ বলেন যে, ভারতবাসীর মধ্যে জ্ঞানের অনুশীলন এবং শিক্ষা প্রচার করিবার যোগ্যতা ভারতবর্ষের নাই। তাঁহারা বলেন যে, ভারতে সার্বজনীন আদর্শ নাই। বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত অধিবাসীদের মধ্যে কোন সংযোগ-সূত্র নাই। তাহার অতীত ও বর্ত্তমানের অব্যাহত পারম্পর্য নাই—আছে শুধু অসহিষ্ণু শাস্ত্রের অনুশাসন, যুক্তির পরিবর্ত্তে শাস্ত্রের আদেশ—কল্পনা প্রিয় বলিয়া ভারতবাসীরা সত্যজ্ঞান পথে অগ্রসর হইতে পারে না; বিজ্ঞানের অনুশীলন সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য, ভারতীয় সভ্যতার সহিত তাহার সামঞ্জস্য নাই—এই সমস্ত উক্তি অজ্ঞতা প্রসূত এবং সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

প্রাচীন ভারতে রাজপুত্র এবং সাধারণ প্রজার পুত্রকে গুরুগৃহে একই প্রকার আড়ম্বরবিহীন জীবন যাপন করিতে হইত। এরূপ ব্যবস্থা অন্য কোন দেশে আছে বলিয়া আমি জানি না। আমাদের মহাকাব্যে আমরা দেখিতে পাই যে, তিন হাজার বৎসর পূর্বে হস্তিনাপুর রাজসভার সম্মুখে একটি বিরাট অস্ত্র পরীক্ষা হইয়াছিল। সূতপুত্র কর্ণ রাজপুত্র অর্জুনকে শক্তি পরীক্ষায় আহ্বান করিয়াছিলেন। অর্জুন ঘৃণাভরে এই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিয়াছিলেন—"যাহার কোন বংশমর্যাদা নাই, রাজপুত্র তাহার সহিত অস্ত্র বিনিময় করেন না।" প্রত্যুত্তরে কর্ণ বলিয়াছিলেন, "আমিই আমার বংশের প্রতিষ্ঠাতা, আমার কার্যই আমার আভিজাত্যের পরিচয়।" নিজের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে মানুষের নিজের অধিকারের দাবী বোধহয় এই সর্বপ্রথম।

আমার যখন শিক্ষারম্ভ হয় তখন সৌভাগ্যক্রমে আমার পিতা আমাকে কোন ইংরাজী বিদ্যালয়ে না পাঠাইয়া বাঙ্গলা পাঠশালায় পাঠাইয়াছিলেন। তথায় কৃষক পুত্ররা ছিল আমার সহপাঠী। তাহাদের নিকট হইতে আমি শ্রমের প্রকৃত মর্যাদা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলাম। তাহারা চাষ করিয়া সবুজ ক্ষেতে সোনার ফসল জন্মাইত, তাহাদের সহিত থাকিয়া আমার প্রকৃতির প্রতি ভালবাসা জন্মে। বিশাল নদীর মধ্যে এবং এদো পুকুরে যে সমস্ত আশ্চর্য জীব বাস করে ধীবর বালকেরা তাহাদের গল্প আমাকে শুনাইত। তখন হইতেই প্রতিপদে আমি একটা অদ্ভুত আবেগ অনুভব করিতাম। সহপাঠীদের সহিত গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিতে পাইতাম, আমার জননী আমাদের আগমণ প্রতীক্ষা করিতেছেন। আমার মাতা ছিলেন নিষ্ঠাবতী হিন্দু, আমার সহপাঠীদের মধ্যে

কেহ কেহ "অস্পৃশ্য" ছিল, তাহাতে কিন্তু মায়ের কোন বিরক্তি হইত না। তিনি সকলকেই নিজের পুত্রের মত আদর করিয়া খাওয়াইতেন। সত্য সত্য মায়ের প্রাণ এইভাবে মাতৃস্নেহ বিলাইয়া কাঙ্গালকে স্বীয় ক্রোড়ে আশ্রয় দিতে পারে। এই সুকুমার বয়সে আমাকে কেন বাঙ্গলা পাঠশালায় দেওয়া হইয়াছিল আজ আমি তাহার তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। তথায় আমি মাতৃভাষায় শিক্ষা করিয়াছিলাম, নিজে চিন্তা করিতে শিখিয়াছিলাম এবং আমাদের মহাকাব্যগুলির মধ্য দিয়া আমি আমাদের জাতীয় সভ্যতার অধিকার লাভ করিয়াছিলাম।…

…একথা সত্য যে আচারের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে নূতন সত্য গ্রহণ করা যায় না, সত্যান্বেষণের পক্ষে ইহা অপেক্ষা বড় বিঘ্ন আর নাই। একথা বলা যায় যে, এই সঙ্কীর্ণতার ভাব তাহা প্রাচ্য হইতে পাশ্চাত্যেই অধিকতর প্রকট। গ্যালিলিওকে যে বাধ্য হইয়া সত্য কথা প্রত্যাহার করিতে হইয়াছিল এবং ব্রুনোকে যে আগুনে পুড়িয়া মারিতে হইয়াছিল ইহা সর্বজন বিদিত! এই অসহিষ্ণুতা পাশ্চাত্যে অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। ডারুইনের উদ্বর্তনবাদ সংশ্লিষ্ট বিতর্কই তাহার প্রমাণ। আমেরিকার একটি যুক্ত রাষ্ট্রে অদ্যাপি উদ্বর্তনবাদ শিক্ষা দেওয়া দণ্ডনীয়। বিজ্ঞান ক্ষেত্রেও এরূপ একটা গণ্ডী আছে। কোন বড় আবিষ্কারই আবিষ্কারকের জীবনকালে আদৃত হইতে দেখা যায় না।

এ দেশে শাস্ত্রানুশাসনের গণ্ডী জ্ঞানচর্চাকে সঙ্কীর্ণসীমায় আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল কিনা তৎসম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই দেশেই দুইটি স্বতন্ত্র চিন্তাধারা পাশপাশি বাড়িয় উঠিয়াছিল। একটি শাস্ত্রাদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত ভক্তিবাদ, অপরটি যুক্তিবাদ—প্রত্যক্ষ প্রমাণই তাহার ভিত্তি। ভক্তিবাদীরা বোধ হয় একথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, যদি তাহাদের অনুগ্রহের উপর ভগবানের অস্তিত্ব নির্ভর করিতে হয়, তবে তাহাতে ভগবানের অবমাননা করা হয়, এজন্যই বোধ হয় যুক্তিবাদের সৃষ্টি। …আমাদের পূর্বপুরুষগণ অবিরত পরিশ্রমের ফলে ধীরে ধীরে জ্ঞানের মন্দির গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহাদের অতটা সাফল্য সত্ত্বেও একথা বলিবার মত উদারতা তাঁহাদের ছিল যে, সত্যের সহিত না মিলিলে বেদও অগ্রাহ্য। এই যে সত্যান্বেষণের স্বাধীনতা আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছি, তাহা অস্বীকার করার অর্থ—কপট দেশভক্তি।…

…প্রথমে যে সমস্ত বিঘ্ন দুর্লঙ্ঘ্য বলিয়া মনে হইয়াছিল, বহুবর্ষ চেষ্টার ফলে সেই সমস্ত বিঘ্ন অতিক্রম করার পর এই সমস্ত আশ্চর্য ব্যাপার আমার নিকট পরিস্ফুট হইয়াছে। ভারতসুলভ মনঃসংযমই পরিনামে জয়ী হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসুর পথ সুগম নহে। তাহাকে লোহার শরীর মন লইয়া অবিশ্রান্ত সংগ্রামে অগ্রসর হইতে হয়। সুখদুঃখ, লাভ অলাভ, জয় পরাজয়কে সমান মনে করিয়া জীবনকে আহুতি দিতে হয়। সুলভ সাফল্যের লোভ তাহার বীর হৃদয়কে আকৃষ্ট করে না, দুর্লভের অনুসরণে ব্যর্থতার দুঃখই তাহাকে আকৃষ্ট করিয়া থাকে।…

…সম্প্রতি আমি লোকার্ণোতে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলাম। সেই সম্মেলন বুঝিতে পারিয়াছেন যে, প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি পুরাতন হইয়াগিয়াছে, এখন নূতন পদ্ধতি প্রবর্ত্তনের সময় আসিয়াছে। যে শিক্ষা পদ্ধতি লোককে চিরকাল দাস করিয়া রাখে তাহা অনিষ্টকর না হইয়া পারে না। ভারতীয় ছাত্রগণ শিক্ষালাভের জন্য ইয়োরোপে যাইবে ইহা অপেক্ষা লজ্জাকর কিছুই নাই; তাহাতে অনেক বিপদও আছে। আমরা কেন নিজেদের দেশেই শিক্ষাক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিব না? এই ধারণা লইয়াই আমি আমার বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছি।…

…পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যেমন, ভারতেও তেমনি অর্থসঙ্কট দেখা দিয়াছে। ভারতে এই সঙ্কট প্রবল বলিয়াই সমস্যা কঠিন দেখা যাইতেছে। ক্ষুধার তাড়নায় লোকে অসহিষ্ণু হইয়া উঠে এবং শান্তির প্রতিষ্ঠান নষ্ট করিয়া দেয়। অতীব দুঃখের কথা এই যে, আমাদের দেশে এত সম্পদ নিহিত থাকা এবং শিল্পোন্নতির সম্ভাবনা সত্ত্বেও আমাদিগকে এই অবস্থায় পড়িতে হইয়াছে। আমরা কিছু আবিস্কার করিতে পারি না, কিছু উদ্ভাবন করিতে পারিনা—এইরূপ বাজে কথা বলিয়া এতদিন আমাদের সমস্ত চেষ্টার পথ রুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। এক্ষণে এই উক্তির অসারতা প্রমাণিত হইয়াছে।

অন্যান্য দেশে শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক এবং ব্যবসায়ীগণ দেশের ধনবৃদ্ধির চেষ্টায় নিযুক্ত হন। নরওয়ে এবং ডেনমার্কের মত ছোট ছোট দেশেও আমি কোন অর্থকষ্ট দেখি নাই; অথচ প্রাকৃতিক সম্পদে ঐ সমস্ত দেশ ভারতবর্ষ অপেক্ষা সম্পন্ন নহে। তাহাদের দেশে সার্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, তথায় সর্ববিষয়ে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় রহিয়াছে; দারিদ্র তথায় নাই বলিলেই চলে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে দেশের সম্পদ কাজে লাগাইয়া তাঁহারা এই অদ্ভুত ব্যাপার সম্ভব করিয়া

তুলিয়াছেন। আমরা কি তাঁহাদের উদাহরণ দেখিয়া শিক্ষালাভ করিতে পারি না?…

…আজ জাতীয় জীবনে একটা আশ্চর্য দৌর্বল্য ও অবসাদ দেখা দিয়াছে। অবিলম্বে ইহার প্রতিকার না করিলে ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। দুর্বল ও জীর্ণের প্রতি প্রকৃতির কোন দয়া নাই। জীবন ধারণের জন্য, যতটুকু আবশ্যক, অলস প্রকৃতির লোক ততটুকু সংগ্রহ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে। তাহাতে তাহার কর্মশক্তি হ্রাস পায়।…

…কিন্তু পাশ্চাত্যে এরূপ দেখা যায় না। জাতির মহাদুর্দিনেও তাহারা কর্মশক্তি বজায় রাখিয়াছে। তাহাদের শ্রমের বলে তাহারা জাতিকে স্বচ্ছল করিয়া তুলিতেছে। দুইয়ের পার্থক্যের উদাহরণ স্বরূপ আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলিতেছি। আমার পুরাতন ছাত্রদের মধ্যে অনেকেরই বিজ্ঞানের প্রতি একটা বিশেষ অনুরাগ ছিল। কিন্তু তাহারা তাহাদের এই স্বাভাবিক অনুরাগ বিসর্জন দিয়া আইন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে। আদালতে যাইয়া অনিশ্চিত ভাগ্যের অনুসরণ ভিন্ন যেখানে প্রতিভা দেখাইবার অন্য উপায় নাই সে দেশ যে কি দুর্দশায় পড়িয়াছে এবং সে দেশে যে কি দারুন সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে তাহা অন্ধ ভিন্ন সকলেই দেখিতে পায়।

জাপানের গবর্নমেন্ট প্রতিভাবান ছাত্রের জন্য কি যত্ন লইয়া থাকেন তাহা দেখিবার সুযোগ আমার ঘটিয়াছিল। প্রতিভাবান ছাত্রদিগকে জাপানের গবর্নমেন্ট দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়া মনে করেন। আমি দেখিয়াছি যে, প্রতিভাবান ছাত্ররা প্রধান প্রধান কর্মচারীদের সহিত ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত।…

…শিক্ষাদান ও অনুসন্ধিৎসা পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে সংবদ্ধ। শুধু পুরাতন সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াই শিক্ষা দেওয়া চলে না। অনেক সময় এই সমস্ত সিদ্ধান্ত ভিত্তিহীন বলিয়া প্রমাণিত হয়। বড়লোকের কথাকেই অভ্রান্ত সত্য বলিয়া ধরিয়া লইতে শিক্ষা দেওয়ার মত অনিষ্ট নাই। বিদ্যার্থীকে নিজে সত্য আবিষ্কারে উদ্বুদ্ধ করাই আচার্যের প্রধান কর্তব্য। এরূপ আচার্য সহজে মিলে না। সেরূপ আচার্য আপনাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে এবং তাঁহাকে কার্যের সুবিধা দিতে হইবে। নিজেদের জন্য সর্বদা বিশেষ সুবিধা খুঁজিয়া বেড়াইবে, এমন একটা শিক্ষিত জাতির সৃষ্টি যেন আপনারা না করেন। একমাত্র জ্বলন্ত প্রদীপই আলো

বিতরণ করিতে সমর্থ। এইরূপে আচার্যের অধীনে থাকিয়া ধৈর্য এবং প্রতিপদে সতর্কতা শিক্ষা করিবে।...

মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবের ভাষণটি দেশের সর্বত্রই খুব আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। পরপর কয়েকদিন ধরে সে সময়কার Mysore Patriot, Hindu, Statesman, Madras Mail, Justice প্রভৃতি পত্রিকায় প্রশংসাসূচক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। মহীশূর রাজ্য থেকে বিদায় নেওয়ার আগে জগদীশচন্দ্রকে মহীশূর টাউন হলে নাগরিক সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। কলকাতায় ফেরার আগে ডঃ অ্যানি বেসান্ত ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে জগদীশচন্দ্রকে মাদ্রাজ যেতে হয়। মাদ্রাজের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জগদীশচন্দ্র বেশ কয়েকটি ভাষণ দেন। প্রতিটি বক্তৃতাতেই প্রচুর জনসমাগম হয়েছিল। ভীড় সামলানো কষ্টসাধ্য ঘটনায় পর্যবসিত হয়েছিল।

নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে জগদীশচন্দ্র কলকাতায় ফিরলেন। ফেরার দিন কয়েক পরে Far Eastern Association of Tropical Medicine-এর সপ্তম অধিবেশন কলকাতা শহরে অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশন উপলক্ষে ৬ই ডিসেম্বর তারিখে অধিবেশনের প্রতিনিধিদের সামনে 'জগদীশচন্দ্র একটি সহজ সুন্দর ভাষণ দেন ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষা দেখান। পরদিন ৭ই ডিসেম্বর তারিখে জগদীশচন্দ্রের ভাষণটি পরীক্ষা প্রদর্শনের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত ভাষনটির অংশবিশেষ পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি। তাতে দেখা যাবে, কিভাবে কত সহজ ভাষায় তিনি বিজ্ঞানের কঠিন বিষয়বস্তুকে দর্শকদের সামনে তুলে ধরেছিলেন—

"সর্বপ্রকার প্রাণক্রিয়ার সমক্রিয়া প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে আমি আমার অনুসন্ধান আরম্ভ করি। যদি এই সমক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করা যায়, তবে বিজ্ঞান রাজ্যে একটা বিরাট রহস্যের দ্বারোদ্ঘাটন হইবে, জীব দেহের যে সমস্ত জটিল সমস্যা আমরা সমাধান করিতে সমর্থ হই না, উদ্ভিদ দেহের অনুরূপ ক্রিয়া দেখিয়া সে সমস্ত সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হইবে। উদ্ভিদ ও জীবের প্রাণের সমক্রিয়া কি করিয়া প্রতিপন্ন করা যায়? নিছক কল্পনা যতই আনন্দদায়ক হউক না কেন, তাহাতে কোন ফল হইবে না। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের কঠোর পথে অনুসরণ করিতে হয়। নানাপ্রকার কৌশলে মূক উদ্ভিদকে দিয়াই স্বীয় প্রাণক্রিয়ার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করাইবার ব্যবস্থা

প্রাণীদেহের প্রত্যেকটি অবয়ব সমগ্র দেহের এক একটি বিশেষ কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। বিভিন্ন শ্রেণীর পাকযন্ত্রের কার্য তুলনা করিলে এই কথাটি স্পষ্টতররূপে বুঝিতে পারা যাইবে। পাকযন্ত্রের কার্য হইতেছে পাচকরস নিঃসরণদ্বারা ভুক্তদ্রব্যকে দ্রবীভূত করিয়া হজম করা। Sundew নামক কীটভুক উদ্ভিদের পত্রগুলির মধ্যে কতকগুলি শুঁয়া থাকে, সেই শুঁয়াগুলি একপ্রকার টক রস নিঃসরণ করে। এই রসের মধ্যে কীটপতঙ্গ আটক পড়িয়া যায়। পরে কীটপতঙ্গ যখন ছাড়া পাইবার জন্য হস্তাদি বিক্ষেপ আরম্ভ করে, তখন অন্যান্য শুঁয়াগুলি শিকারকে আরও শক্ত করিয়া ধরিয়া থাকে। অতঃপর কীটগুলি দ্রবীভূত হইয়া যায়, শুধু কঙ্কালগুলি অবশিষ্ট থাকে। সম্পূর্ণ উন্মুক্ত পাকস্থলীর কার্যের নিদর্শণ এই ক্ষেত্রে দেখা গেল; কিন্তু প্রাণীদেহের অভ্যন্তরস্থ পাকস্থলীর কার্য এত সহজ নহে। যাহা হউক, পচনক্রিয়ার ক্ষমতা দেখিয়া ডারুইনের অনুসন্ধানলব্ধ তথ্য প্রকাশের পর সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, কীটভুক উদ্ভিদের "পাকস্থলী" আছে। Venus নামক গাছের পাতার দুইটি অর্ধাংশ মিলিয়া একটি ফাঁদের আকার ধারণ করে, ঠিক যেন বৃক্ষটি মুখব্যাদন করিয়া থাকে, যেই কোন কীট ঐ ফাঁদে পড়ে, অমনি পাতাটি বুজিয়া যায়। Nepenthes পাকযন্ত্র একটি থলিয়ার আকৃতি। ইহার পাকযন্ত্র কতকটা প্রাণীদেহের পাকযন্ত্রের অনুরূপ। এইরূপ যদি উদ্ভিদ জীবনে অনুসন্ধান করা যায় তবে দেখা যায় যে, সরল সহজ যন্ত্র কিভাবে ধীরে ধীরে জটিল যন্ত্রে পরিণত হইয়াছে।

প্রাণীদেহে তিন প্রকার কোষ আছে—পেশীকোষ, স্নায়ুকোষ এবং স্বতঃস্পন্দনশীল কোষ। উদ্ভিদ দেহেও অনুরূপ ক্রিয়াশীল কোন কোষ আছে কিনা; তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখা আবশ্যক। আমি পূর্বে বক্তৃতা প্রসঙ্গে উদ্ভিদের নাড়ীর সঙ্কোচন প্রসারণ কার্য দেখাইয়াছি, এক্ষণে শুধু...রস সঞ্চালন ক্রিয়া দেখাইলেই চলিবে। প্রাণীদেহে কতগুলি কোষ আছে, যাহাদের স্বতঃসঙ্কোচন বিস্ফারণের দ্বারা এই কার্য হইয়া থাকে। উদ্ভিদদেহে এরূপ কোন স্বতঃসঙ্কোচন বিস্ফারণশীল কোষ আছে কিনা?

একটি সঙ্কোচন-প্রসারণশীল যন্ত্রের সাহায্যে প্রাণীদেহের রক্ত সঞ্চালনক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। সেই যন্ত্রটির নাম হৃদযন্ত্র। কেঁচো প্রভৃতি নিম্নস্তরের প্রাণী-দেহে হৃদযন্ত্রটি একটি লম্বমান নলাকৃতি, এই হৃদযন্ত্রের সংকোচন বিস্ফারণের সহায়ে সঞ্জীবনী রস সঞ্চালিত হয়। উচ্চতর স্তরের প্রাণীর মধ্যেও হৃদযন্ত্রটি

লম্বাকৃতি। প্রাণীদেহের হৃদযন্ত্রস্থিত কোষগুলির বৈশিষ্ট স্বতঃস্পন্দনশীলতা, বিভিন্ন অবস্থায় এই স্পন্দনের হ্রাসবৃদ্ধি হয়। কোন কোন উত্তেজক ঔষধির ফলে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া দ্রুত সম্পাদিত হইতে থাকে, ফলে দ্রুত রক্ত সঞ্চালিত হয়। আবার অবসাদজনক ঔষধির ফলে ঠিক বিপরীত ভাব দেখা যায়।

একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আমি একটি ভেকের রক্ত সঞ্চালন কার্য এই যবনিকার উপর প্রতিফলিত করিতেছি। দেখুন প্রধান শিরা এবং উপশিরার মধ্য দিয়া কিরূপ দ্রুতগতিতে রক্তধারা প্রবাহিত হইতেছে। আমি এক্ষণে একটি অবসাদজনক ঔষধি প্রয়োগ করিতেছি। দেখুন ঠিক বিপরীত ক্রিয়া দেখা যাইতেছে, এই দেখুন রক্তপ্রবাহ একেবারে বন্ধ হইয়া গেল।

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, উদ্ভিদদেহের রসসঞ্চালন অনুরূপ হৃদক্রিয়াদ্বারা নিষ্পন্ন হয় কিনা? প্রচলিত সিদ্ধান্ত এই যে, উদ্ভিদদেহে রসসঞ্চালন জড় ক্রিয়ার ফল; —জীবন্ত কোষের প্রাণক্রিয়ার ফল নহে। ইউক্যালিপ্টাস বৃক্ষে ৪৫০ ফুট পর্যন্ত ঊর্ধ্বে রসসঞ্চালিত হয়, কোন জড়যন্ত্রের সাহায্যে এত উচ্চে জল উত্তোলন করা অসম্ভব। প্রাণক্রিয়াদ্বারাই এই কার্য হয় কিনা, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য স্ট্রাসবার্গার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার অনুসন্ধান অসম্পূর্ণ থাকার ফলে এই প্রাণক্রিয়া সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত অনেকটা খর্ব হইয়া পড়ে। স্ট্র্যাসবার্গার পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, বিষ প্রয়োগদ্বারা উদ্ভিদদেহে রস সঞ্চালন হ্রাস পায় না। ইহা হইতে তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, যদি উদ্ভিদের দেহে রসসঞ্চালন কার্য জীবিত কোষের সাহায্যেই হইত, তবে বিষক্রিয়ার ফলে কোষগুলির নিশ্চয় মৃত্যু হইত এবং রসসঞ্চালন বন্ধ হইত। অন্যান্য অনেকে অন্ধভাবে এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। একটু বাদেই আমি আপনাদিগকে যাহা দেখাইব, তাহাতে স্ট্র্যাসবার্গারের সিদ্ধান্ত যে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক তাহা প্রমাণিত হইবে। পক্ষান্তরে আমি প্রমাণ করিব যে, জীবন্ত কোষের স্পন্দনশীলতার ফলেই রসসঞ্চালন অব্যাহত থাকে।

উদ্ভিদ দেহে কিভাবে রসসঞ্চারিত হয়, আমি এক্ষণে দেখাইতেছি। আমি আরো দেখাইব যে, যে অবস্থায় প্রাণীদেহে রক্ত সঞ্চালনের হ্রাস, বৃদ্ধি হয়, সে অবস্থায় উদ্ভিদদেহে রসসঞ্চালনেরও হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। রসসঞ্চালনের বেগ পরিমাপক কোন সন্তোষজনক উপায় ইতিপূর্বে উদ্ভাবিত হয় নাই। রস-সঞ্চালনের বেগ নির্ণয় করিবার জন্য আমি একটি উপায় বাহির করিয়াছি। এই উপায়ে উদ্ভিদের পত্রগুলিকেই মাপকাঠিরূপে গ্রহণ করা যায়। জলাভাবে

পাতাগুলি হেলিয়া পড়ে, আবার জল পাইলে পাতাগুলি সোজা হইয়া উঠে; অধিকন্তু কোন উপায়ে যদি রসসঞ্চালন বৃদ্ধি করা যায়, তাহা হইলে পাতাগুলি দ্রুত সোজা হইয়া উঠে। আবার অবসাদ জন্মাইয়া রসসঞ্চালন হ্রাস করিলে পাতাগুলি হেলিয়া পড়ে। পাতাগুলির এই উত্থান পতনের হার এত সামান্য যে চক্ষে ধরা সম্ভব নহে, যন্ত্র সাহায্যে এই হারকে বৃহদাকারে প্রতিফলিত করা সম্ভব,—আমি তাহাই দেখাইতেছি। এই যে গাছটি দেখিতেছেন, ইহা জলশূন্য স্থানে ছিল, কাজেই পাতাগুলি হেলিয়া পড়িয়াছে। আমি এক্ষণে গাছটিতে জলসিঞ্চন করিতেছি। দেখুন পাতাগুলি সোজা হইয়া উঠিতেছে; কিন্তু এই পাতাগুলি ঠিক একচোটে সোজা হইয়া উঠিতেছে না, কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিতেছে। ইহা দ্বারাই অদৃশ্য সঙ্কোচন প্রসারণশীল যন্ত্রের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইতেছে। আমি এক্ষণে পটাশিয়াম ব্রমাইড নামক অবসাদজনক ঔষধি প্রয়োগ করিতেছি। দেখুন জলসিঞ্চলের ফলে পত্রগুলি যেভাবে সোজা হইয়া দাঁড়াইতেছিল এক্ষণে আর সেভাব নাই, পাতাগুলি এক্ষণে আবার কাঁপিতে কাঁপিতে হেলিয়া পড়িতেছে।

প্রানীদেহে কর্পূর প্রয়োগের ফলে হৃদক্রিয়া বৃদ্ধি পায়। আমি সামান্য কর্পূর মিশ্রিত জল এই গাছটিতে দিতেছি। দেখুন দুইটি পরস্পর বিরোধী ক্রিয়ার কি সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। এই দেখুন শেষকালে উত্তেজক ঔষধির কার্যই জয়লাভ করিল—প্রতিচালিত আলোকরেখা উর্ধ্বগমন করিয়া রস-সঞ্চালনের বৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে। আমি এক্ষণে গাছটিকে তড়িতাঘাত করিতেছি, দেখুন তড়িতাঘাতে আমাদের দেহে যেরূপ বিক্ষেপের সঞ্চার হয়, গাছটিতেও সেরূপ বিক্ষেপের সঞ্চার হইল।

এতদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, গাছটির মধ্যে নিশ্চয়ই আকর্ষক-বিকর্ষক কোষ আছে।···

বহুদিন ধরেই জগদীশচন্দ্র অনুভব করে আসছেন উদ্ভিদতাত্ত্বিক ফলিত গবেষণার জন্য প্রয়োজন কলকাতার বাইরে চাষের উপযোগী কিছুটা জমি। এবার কলকাতায় ফেরার পর এ ব্যাপারে তিনি চিন্তা ভাবনা শুরু করলেন। বছরখানেক আগেও সরকারের কাছে এ ব্যাপারে আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানিয়েছিলেন, কিন্তু তা ফলপ্রসূ হয়নি। তাছাড়া বিজ্ঞান মন্দিরের স্থায়িত্বের জন্যও অর্থ প্রয়োজন। ইতিমধ্যে পাঞ্জাবের রাজ্যপাল Sir W. H. Haily পাঞ্জাব সরকারের পক্ষ থেকে জগদীশচন্দ্রকে সুদৃশ্য ও কারুকার্যমণ্ডিত কাঠের

একটি ফটক উপহার পাঠিয়েছেন (যে ফটকটি আজও বসুবিজ্ঞান মন্দিরের প্রধান ফটক)। জগদীশচন্দ্র এই অযাচিত উপহার পেয়ে কিছুটা আশান্বিত হয়ে তাঁর সদ্য প্রকাশিত "Plant Autographs" গ্রন্থটি Sir Haily-কে উপহার পাঠিয়ে লিখলেন, 14th December 1927,···The beautiful Lahore Gate presented by the Punjab Government adorns the entrance of the Institute and is greatly admired. You have for many years taken a personal interest in the success of the Institute. I therefore feel no hesitation in asking your kind advice and help in expanding its activities···The Consideration of this matter was postponed last year and I am told that there is every chance of an increase of grant to the Institute this year, if Sir Basil Blackett could be made to take an interest in it. He has seen the work and understands its importance; may I ask your kind influence on Sir Basil for the purpose?···

এই একই ধরণের চিঠি লিখলেন দিল্লীর লেজিসলেটিভ এসেম্বলির সদস্য স্যার মহম্মদ হবিবুল্লা সাহেব, শিক্ষা বিভাগের উপসচিব গিরিজাশঙ্কর বাজপাইকে। আর আর্থিক সাহায্যের মূল আবেদনটি পাঠালেন ভারত সরকারের অর্থসচিব Sir Basil Phillot Blackett-কে। এতগুলো চিঠিপত্র লিখেও জগদীশচন্দ্র নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। দিল্লীর লেজিসলেটিভ এসেম্বলির মাদ্রাজ রাজ্যের সদস্য চিরশুভাকাঙ্ক্ষী রামস্বামী আয়েঙ্গারকে তাঁর পুরোনো প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে লিখলেন, 31 Dec 1927, You were kind enough to promise exerting your Influence on Sir Basil Blackett for increase of grant to my Institute. As the Budget is now being drawn up, may I ask you to do the needful? THE GRANT MUST BE SANCTIONED THIS YEAR for the next Finance Minister may take no interest in Indian Research···

···We have met with many set-backs in our National efforts. In our intellectual advance at least, let us pursue the conquests that have already been won···

ঐ একই তারিখে বোম্বের M.L.A Mr. Joyakarকে লিখলেন,…you will be glad to know that the recent discoveries made at the Institute have aroused great interest all over the world. The members of the International Medical Congress held in Calcutta were greatly impressed…

Mr. Jinna* informed me through a friend that being interested in the success of the Institute, he is willing to do anything that would help ; he added, however, that no one has yet consulted him on the subject.…

I was informed, while in Madras, that Mr. Iyengar M.L.A has considerable influence on Sir Basil Blackett. He promised that he would do everything to get the support of the Finance Minister…

এত প্রচেষ্ঠা সত্ত্বেও যে কোন সরকারী অর্থ সাহায্য মেলেনি তা আমরা পূর্ববর্ত্তী এক অধ্যায়ে (পাতা ৭০-৭১) দেখেছি। ডায়মণ্ডহারবারের কাছাকাছি ফলতায় ফলিত গবেষণার জন্য জমি ও বিজ্ঞান মন্দিরের উন্নতি দুইই জগদীশচন্দ্রকে নিজের কষ্টসাধ্য চেষ্টার মধ্যেই করতে হয়েছিল।

Three score and Ten। তিনকুড়ি দশ। বাইবেলে কথাটির উল্লেখ রয়েছে। ৭০ বছর বয়েস হলো মানুষের জীবনের পূর্ণতার বয়েস। তাই বহুকাল ধরে একটা রীতি চলে আসছে সার্থক মানুষের সপ্ততিতম জন্মজয়ন্তী পালন করা। ১৯২৮ সালের ৩০শে নভেম্বর তারিখে আচার্য জগদীশচন্দ্রের ৭০ বৎসর পূর্ণ হল। সেই উপলক্ষে পরদিন পয়লা ডিসেম্বর তারিখে বসু বিজ্ঞান মন্দিরে জগদীশচন্দ্রের সপ্ততিতম জন্মজয়ন্তী মহাসমারোহে পালিত হয়। এই সার্থক জন্মজয়ন্তীর প্রস্তুতির ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ অগ্রনী ভূমিকা নিয়েছিলেন। অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি পর্বে রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীর উদ্দেশ্যে এক আবেদনে বলেন, It is proposed to hold the 70th birthday celebration of Sir Jagadis Chandra Bose on the 1st December between 4-6 PM at the Bose Institute. On this occasion the numerous pupils

*Mr Jinna বর্ত্তমান পাকিস্থানের রূপকার মহম্মদ আলি জিন্না।

and admirers feel it a great privilege to convey to Sir Jagadis Chandra Bose their sincerest appreciation of his life long services to the cause of advancement of learning in India. In the darkest hour of India's intellectual degradation, he has set afire a flame which shows us the path to a greater future. His spirit of deep scientific inquiry, his profound love of universal humanity, his serene hopefulness have ever been a source of inspiration to all who have come near him. It is only in the fitness of things that his pupils and admirers should assemble on his 70th birth day and express their feelings in a suitable manner.…

১লা ডিসেম্বর তারিখের অনুষ্ঠানের পূর্ণ বিবরণ ২রা ডিসেম্বর তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি অনুষ্ঠানের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, "সেদিন বসুবিজ্ঞান মন্দিরকে ফুলে পল্লবে সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছিল। বহুবর্ণে চিত্রিত মঙ্গলঘট নানা জায়গায় বসান হয়। সেই সঙ্গে ছিল বাহারি আলোর রোশনাই। অনুষ্ঠান শুরুর আগে এই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য বসুবিজ্ঞান মন্দিরের অতিথি অধ্যাপক ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর Hans Molisch-কে দিয়ে বসুবিজ্ঞান মন্দিরের বাগানে বেশ কিছু গাছ লাগানো হয়। তার মধ্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আত্মিক মিলনের প্রতীকস্বরূপ জগদীশচন্দ্র ও অধ্যাপক মলিশ এক সঙ্গে একটি যমজ নারকেল গাছ রোপন করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অধ্যাপক মলিশই প্রথম বিদেশী বিজ্ঞানী যিনি বসু-বিজ্ঞান মন্দিরে অতিথি গবেষক হিসেবে কাজ করেন। অনুষ্ঠান শুরুতে জগদীশচন্দ্র ও পত্নী অবলাদেবীকে সুদৃশ্য একটি জোড়া চেয়ারে বসান হয়। চেয়ারটির নির্মাণকার্য বিস্ময়কর। দুটি ছোট সমান মাপের কুঁদে হাতির ওপর চেয়ারটি রাখা। অনুষ্ঠান শুরু হয় বরণডালা ও সমবেত সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে। সঙ্গীত পরিচালনা করেন সরলাদেবী। সঙ্গীত শেষে স্বরচিত দুটি কবিতা পাঠ করেন অধ্যাপক বিনয় সরকার। কবিতা দুটির নাম "দিগ্বিজয়ী জগদীশ" ও "বিজ্ঞান-বীর জগদীশচন্দ্র"। প্রথমটি নিউ ইয়র্কের পথে ১৯১৪ সালে জাহাজবক্ষে ও দ্বিতীয়টি ১৯২১ সালে প্যারিস শহরে বসে লেখা। কবিতা দুটির অংশবিশেষ পাঠকদের উদ্দেশ্যে তুলে ধরছি।

(নিউ ইয়র্কের পথে), নভেম্বর ১৯১৪ সাল

দুনিয়ারে কোন্ তত্ত্ব শিখায়ে গেলে তুমি ?
গুরুদেব ! বুঝিতে পারি না তাহা মূর্খ আমি ।
জানি,—বাইরের আঘাত পেলে জীবন দেয় সাড়া,
সেই সাড়া কি তারাও দেয় চেতনা-হীন যারা ?
... ...
যন্ত্রে ধরেছ, হে যন্ত্রবীর, অচেতনের স্পন্দন-সুর,
তোমার দেশের সাড়াও তাই বিশ্ববাসী পাচ্ছে দূর।
এক জগদীশ নও ভারতের তুমি সে সাড়ার ফলে,
হাজার জগদীশ আজ মায়ের কোলে আধ আধ কথা বলে ।

(প্যারিস, ১৯২১)

গম্ভীর বদন তোমার স্থিরনেত্র জগদীশ,
প্রশান্ত হাসিতে তোমার দেখিনা হরিষ ।
বেদনার মূর্ত্তি তুমি ওহে সেনাপতি,
সৃষ্টিকর্ত্তার অহঙ্কারে ভরা তোমার মতি ।
... ...
ধ্যানমগ্ন আঁখি তোমার, উদ্বিগ্ন অন্তর,
শোকে ভরা মহানন্দ প্রাণের সহচর।
ছড়াও স্বদেশে সংগ্রাম, শান্ত যোগ ধীর,
আর বেদনা বিরাট তোমার হে বিজ্ঞান বীর।

অনুষ্ঠানে অগণিত সুধীমণ্ডলীর মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি কামিনী রায়, ডাঃ নীলরতন সরকার, ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, বি. কে. বসু (নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য) ডঃ কালিদাস নাগ, ডাঃ চুনীলাল বসু, অধ্যাপক যদুনাথ সরকার, অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহালানবিশ, প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ R. S. Ramsbotham, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য W. S. Urquhart প্রমুখ। প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা।

এরপর প্রেসিডেন্সী কলেজের ফিজিক্যাল সোসাইটি ও বিশ্বভারতীর "কর্ম-সমিতির" তরফ থেকে প্রশান্তচন্দ্র মহালানবিশ, এলাহাবাদ ও লক্ষ্ণৌ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তরফ থেকে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা, প্রাক্তন ছাত্রদের তরফ থেকে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পোস্ট গ্রাজুয়েট কাউন্সিলের

পক্ষ থেকে ডাঃ নীলরতন সরকার ভাষণ দেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকেও ভাষণ দেওয়া হয়। শারিরীক কারণে রবীন্দ্রনাথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেন নি। ডঃ কালিদাস নাগ সভায় এই উপলক্ষে রচিত রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা পাঠ করেন। কবিতা পাঠের পর ডঃ নাগ রোঁম্যা রোঁল্যার ফরাসী ভাষায় লিখিত একটি অভিনন্দন বার্ত্তা পাঠ করেন ও ভাষণটি ইংরেজীতে অনুবাদ করে উপস্থিত সকলকে পড়ে শোনান।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই জয়ন্তী উৎসবের কিছু আগে ২২শে অক্টোবর তারিখে জগদীশচন্দ্র একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, "…তুমি যাহা সাধন করিয়াছ তাহা অবিনশ্বর রহিবে। আর যে বেশী তোমার দান তাহা অযাচিত। সে কার্যে আমি তোমার চির সহায় মনে করিও।

আমরা দুজনেই প্রবল শত্রুকে প্রবল মিত্র করিয়াছি। তবে যেখানে শত্রুও নাই, মিত্রও নাই, সেই ক্ষুদ্রতার মধ্যে মনের জোর রাখা কঠিন। তাহার মধ্যেও বড় কার্য হইয়াছে এবং হইবে। একথা সর্বদা মনে রাখিও। আমাদের মধ্যে যে বহুদিনের একতা, তাহা দেবতার দান বলিয়া মনে করি।

১লা ডিসেম্বর আমার ৭০ বৎসর হইবে। সেদিন আমি সমস্ত বোঝাপড়া ঠিক করিব, সেদিন তোমার সহিত দেখা হইলে সুখী হইব। তোমার শুভ ইচ্ছা যেন আমাকে সেদিন বলীয়ান করে।

উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ২৪ শে অক্টোবর ১৯২৮,… তোমার ৭০ বছরের অভিনন্দন সভায় নিশ্চয়ই আমি যোগ দিতে যাব। তখন শীতের সময় শরীরে এখনকার চেয়ে বল পাব বলে বিশ্বাস করি।

সভায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও উপস্থিত থাকতে পারেন নি। তবে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তরফ থেকে ডাঃ চুনীলাল বসু সভাপতি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর লেখা একটি অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন। অভিনন্দন পত্রটি বেশ মজার। পাঠকদের উদ্দেশ্যে সেই অভিনন্দন পত্রটি তুলে ধরছি—

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের

—সপ্ততিতম জন্মতিথি উপলক্ষে—

কল্যাণভাজন স্যার জগদীশ,

ভগবানের কৃপায় আপনি আজ সত্তর বৎসর অতিক্রম করিয়া একাত্তর বৎসরে পড়িতেছেন। সত্তর বৎসরে যমরাজের নাম "ভীমরথ", সেই জন্য সত্তর বৎসরের পর লোকের ভীমরথী হয়। আপনার সেরূপ কিছুই হয় নাই। ইহা যে শুধু

আপনারই সৌভাগ্য এবং আমাদেরই সৌভাগ্য, এমন নহে; ইহা জগতের সৌভাগ্য। কারণ এখন আপনি আর শুধু আমাদের ন'ন—সমস্ত জগতের স্যর জগদীশচন্দ্র বসু।

আমাদের অতিশয় সংকট সময়ে আপনি সভাপতিত্ব করিয়া আমাদের উদ্ধার করিয়াছিলেন; সেজন্য আমরা সকলেই মনে মনে আপনার পূজা করিয়া থাকি। তাই আজ এই শুভ্র দিনে আপনার নিকট উপস্থিত হইয়া আপনার মঙ্গল কামনা করিতেছি এবং ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আপনি শতায়ু হউন।

ইতি

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ — শুভার্থী

কলিকাতা — শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

বঙ্গাব্দ ১৩৩৫/১৫ই অগ্রহায়ণ — সভাপতি

বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ছাত্র ও কর্মীদের তরফ থেকে জগদীশচন্দ্রকে একটি তাম্রপত্র দেওয়া হয়। এর পর বিচারপতি সি, সি ঘোষ পৃথিবীখ্যাত মনীষী ও কালজয়ী প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত অভিনন্দন বার্তাগুলি উপস্থিত সুধীবৃন্দকে পড়ে শোনান। সেইসব অসংখ্য অভিনন্দনবার্তা থেকে মাত্র কয়েকটি পাঠকদের সামনে উপস্থিত করছি।

"Many happy returns to a life devoted to discovering ultimate truth and mystery of life··· All Asia shares in your glory— Chinese Minister of Education.

···Your wonderful enthusiasm and power of overcoming defficulties are an example to us all, and have helped to give you the blessings of perpetual youth. May you long continue your work and inspire the love of Science in the many students who come to your great Institute—

Sir John Farmer

Professor of Botany

Imperial College of Science, London

Every biologist in the whole world has read with profound admiration your important discoveries.··· I also

send, in the name of my colleagues of the Botanical Laboratory and the University, our hearty congratulations.…

Prof. Goobel
Munich Univercity
Director, Botanical Institute
Munich.

I congratulate from the bottom of my heart Dr. J. C. Bose on the attainment of his seventieth birthday. It is not often that a great man in this unfortunate land of ours in permitted by providence to reach his seventieth year in the plenitude of his powere and faculties. The more the ranks of our great men are being depleted, the more fondly do we cling to those who are still with us. As one to whom there is but one problem in life namely the freedom of his motherland—my fervent prayer is—May he live long enough to see India free !

Subhas Chandra Bose
1. 12. 28

As one of the many admirers of Sir J. C. Bose in all parts of the world I offer most cordial congratulations. It has been my privilege to know Sir Jagadish Bose for more than thirty years, when he divised compact apparatus for studying the properties of electric waves, it was then clear to me and everyone, that he was a master in conceiving and manipulating delicate apparatus for the study of physical facts and principales. His remarkable achivements in this physical field were later to be extended to physiological phenomena of plants and animal tissues.…

Sir Richard Gregory
Editor of "Nature"

…After a long winter on some centuries in scientific activity, Sir Jagadish Bose's marvellous work drew the attention of the world to the dormant scientific genius of this country and its great possibilities. He had enormous difficulties of race, religion and politics to surmount as every pioneer and pathfinder has to and his enormous faith in himself and pride of patriotism gave him the stength to resist resolutely all opposition and persist in his upward endeavour.…

S. Radhakrishnan
C. U.

I am sending my sincerest congratulations and my best wishes for your further live and work. As Tagore is the senior representatives of Indian Art, so are you the senior and representative man of Indian Science, which is growing up so remarkably well in all branches. You may be proud to have guided this development and to have created enthusiasm for plant—physiology as for other branches of Science in India.…

A Sommerfield
Nobel Laureate and Prof.
of Physics, Munich

Your researches are of great importance and originality and I have been greatly impressed by them. Never have I found in a single man such a combination of idealism, enthusiasm and devotion to the tasks and problems of humanity. I am truely happy to have come in contact with you who is a real leader.… I am sending for your kind

acceptance my book "Researches on Enzymes" which has just been published."

Geheimrat Prof. Willstatter

(Nobel Laureate)

In the name of the Egyptian Government I wish you, in the progress of Science and agriculture, continued success in your investigations which have filled us with wonder. I also wish continued prosperity for the Bose Institute.…

Nakhla el Motei Pasha

Minister of Agriculture,

Govt of Egypt.

I wish you all happiness and many more years of splendid service to humanity.

Gorge Berrard Shaw*

৮।

জর্জ বার্নার্ড'শর চিঠি

---

*২৪শে জুন ১৯২৭ সালে জর্জ বার্নার্ড'শ তাঁর নিজের লেখা কিছু বই লণ্ডনের ঠিকানায় জগদীশচন্দ্রকে উপহার পাঠিয়ে লিখেছিলেন,

My dear Sir Jagadis,

If the accompanying box is too great an addition to your

…I offer a pupil's tribute to the great Bengalee who now belongs to the whole World.…

J. M. Sengupta
10-4 Elgin Road
Calcutta
1st. Dec. '28

অভিনন্দন বার্তাগুলি পড়া শেষ হলে জগদীশচন্দ্র তাঁর ভাষণে বলেন,…I have been a fellow (Calcutta University) for nearly 40years, and which I claim to be my alma matar. The late Sir Ashutosh Mukherjee gave to the Post Graduate studies a new impetus and I would regard it as a great privilege if I can in any way help in making my own University honoured all over the world. It has been my great fortune that my Institution should have brought some of the scientific leaders of Europe to study the biophysical investigations initiated in India.…

এই সপ্ততিতম জন্মজয়ন্তী উৎসবের দিন কয়েক বাদে জগদীশচন্দ্র আর একটি চিঠি পেলেন। লিখেছেন মহাত্মা গান্ধী।* চিঠিটি বেশ মজার। পাঠকদের উদ্দেশ্যে চিঠিটির অংশ বিশেষ তুলে ধরছি। ৫ই ডিসেম্বর ১৯২৮।

---

luggage, take out the first two books—St Joan and Methuselah—which I have inscribed ; and throw away the rest.…

faithfully
G. Bernard Shaw

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বার্নাড'শ তাঁর Methuselah গ্রন্থটির প্রথম পাতায় জগদীশচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন,

"From the least to the greatest of living biologists, G. Bernard Shaw to Sir Jagadish Bose.

* মহাত্মা গান্ধী চিরকালই জগদীশচন্দ্রকে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন।

I am stupid and live as in a well not knowing what goes on outside its walls. I came to know of your birthday only yesterday. Though late, pray let me add my greetings to thee many you have received....

সাধারণত বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ কিছুটা আত্মসমাহিত হয়ে পড়ে। কর্মতৎপরতায় ঘাটতি পড়ে। মানুষ কিছুটা বিশ্রাম চায়। জগদীশচন্দ্র ইচ্ছে করলে জীবনের এ পর্যায়ে ব্যক্তিগত সুখসাচ্ছন্দে নিজেকে সঁপে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। এ সময়ে তিনি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ দুটি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ লেখেন। প্রথমটি Motor Mechanism of Plants"। ১৯২৮ সালে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় গ্রন্থটি Growth and Tropic Movements of Plants', ১৯২৯ সালে রচনা করেন। তাছাড়া সহজ ভাষায় লেখা "Plant Autographs গ্রন্থটি ফরাসী ও জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়। তাঁর সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থগুলি সে সময় উদ্ভিদ গবেষণার ক্ষেত্রে নূতনভাবে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। জীবনের এই পর্যায়ে জগদীশচন্দ্র আরও দুবার ইয়োরোপে গিয়েছিলেন, ইনটেলেকচুয়াল কো-অপারেশন কমিটির বাৎসরিক অধিবেশনে যোগ দিতে। এইসব ভ্রমণের প্রতিটিবারেই তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করতেন বসুবিজ্ঞান মন্দিরের পক্ষে ইয়োরোপীয় জনমত গড়ে তুলতে। যাতে বৃটিশ সরকার বিজ্ঞান মন্দিরের সরকারী অর্থ সাহায্য কিছুটা বাড়িয়ে দেন।

১৯৩৭ সালে কংগ্রেস ওয়ারকিং কমিটির অধিবেশনে একবার "বন্দেমাতরম্" গানটি বর্জনের প্রস্তাব উত্থাপনের চেষ্টা হয়। এ বিষয়ে ১৬/১০/৩৭ তারিখে কার্শিয়াং থেকে নেতাজী সুভাষচন্দ্র এক চিঠিতে অবলা দেবীকে বলেছিলেন, ..."বন্দেমাতরম্" গান লইয়া খুব আন্দোলন চলিতেছে...এই মাসের শেষে কলিকাতায় কংগ্রেস Working committee-র যে অধিবেশন হইবে সেখানে এই কথা উত্থাপিত হইবে। কি সিদ্ধান্ত হইবে তাহা বলিতে পারি না। যদি এ বিষয়ে আচার্য জগদীশচন্দ্র মহাত্মা গান্ধীকে লেখেন তাহা হইলে বড় ভাল হয়। তাঁর মতামত মহাত্মাজী উপেক্ষা করিতে পারিবেন না।...মহাত্মা গান্ধী বোধহয় কলিকাতায় ২৬ তারিখে আসিবেন এবং 1 Woodburn Park-এ থাকিবেন।...প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জগদীশচন্দ্র তখন শারিরীকভাবে অসুস্থ। অসুস্থ শরীরেও তিনি মহাত্মা গান্ধীকে চিঠি লিখেছিলেন।

১৯২৯ সালে বিদেশ সফর শেষে জগদীশচন্দ্র বোম্বাই শহরে ডি. এন. চন্দ্রভারকরের পেডলার রোডের বাড়িতে অল্প কয়েকদিনের জন্য অতিথি হিসেবে ছিলেন। সম্প্রতি ডি. এন চন্দ্রভারকরের পুত্র গনেশলাল চন্দ্রভারকরের একটি স্মৃতিলেখনের সন্ধান পাওয়া গেছে। স্মৃতি লেখনটিতে একটি ছোট্ট ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। ঘটনাটি তুচ্ছ হলেও জগদীশচন্দ্রের ব্যক্তি চরিত্রের দিক থেকে অনুধাবণযোগ্য। পাঠকদের উদ্দেশ্যে তা'থেকে নির্বাচিত অংশবিশেষ তুলে ধরছি, Throughout the day, there was a regular stream of visitors··· We found him sitting in an arm chair, reading a book. A visitor came to see him. I think it was Seth Mulraj Khatao. I had to announce the visitor to Acharya Bose, but I dared not disturb him as I saw that he was seriously engrossed in the book he was reading. After waiting for about fifteen minutes I had to tell him. He raised his eyes and looked at me. ···I felt very sorry that I had to disturb him. Just then my eye fell on the title of the book. It was an abridged edition of "Alice in Wonderland···"

১৯২৯ সালের ইয়োরোপ সফর শেষে কলকাতায় ফেরার পর জগদীশচন্দ্র নূতন একটি সিদ্ধান্ত নেন। ছাত্রদের ডেকে বলেন তাঁদের এবার স্বাবলম্বী হতে হবে। গবেষণার কাজ প্রত্যেককে আলাদাভাবে করতে হবে। কারণ তাঁর অবর্ত্ত-মানেও যেন বিজ্ঞান মন্দিরের গবেষণার কর্মধারা "চিরন্তন প্রাণের প্রবাহে" এগিয়ে যেতে পারে। এ সময়ে জগদীশচন্দ্র নিজেকে বিজ্ঞান মন্দিরের কর্মধারা থেকে কিছুটা সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এতে এক ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল মানুষ দুর্বল কণ্ঠে অপব্যাখ্যার চেষ্টা করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু জগদীশচন্দ্র এসব উপেক্ষা করে গভীরভাবে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন বিজ্ঞান মন্দিরের স্থায়িত্বের প্রশ্নে। মনে প্রশ্ন উঠেছিল হয়তো তাঁর অবর্ত্তমানে ইংরেজ সরকার সরকারী অনুদান পুরোপুরি বন্ধ করে দেবেন। জগদীশচন্দ্রের এই আশঙ্কা বিশ্বাসে পরিণত হয়েছিল ১৯৩১ সালে। কারণ এবছরই ইংরেজ সরকার বসু বিজ্ঞান মন্দিরের বার্ষিক অণুদান অর্ধেক কমিয়ে দিয়েছিলেন। এ ঘটনায় তিনি উঠে পড়ে লেগেছিলেন বসুবিজ্ঞান মন্দিরের জন্য স্থায়ী তহবিল গড়ে তোলার কাজে যাতে সরকারী অর্থসাহায্য বন্ধ হলেও এত কষ্টের বসু বিজ্ঞান

মন্দিরের অস্তিত্ব বিপন্ন না হয়। এ প্রসঙ্গে জগদীশচন্দ্রের উত্তরসূরী বসুবিজ্ঞান মন্দিরের প্রাক্তন অধ্যক্ষ অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন বসু লিখেছিলেন, "In 1931—32 however the Government of India acting on the recommendation of an all India Retrenchment committee reduced the annual grant to the Bose Institute from one Lakh to Rs. 50,000,00··· Jagadish chandra was never quite certain whether after his demise the Government of India would continue the central grant to the Bose Institute. He had hoped to build up an invested fund of Rs. 20.00 Lakhs for the Institute. In 1936 he created another Trust··· He left the direction that the Trust Capital should be allowed to accumulate upto Rs. 10,00 lakhs before any grant was paid to the Bose Institute. These investments according to his estimate would provide an annual income to the Bose Institute of Rs. one Lakh, an income which in those days was considered adequate for a small highly specialized research Institute.

জগদীশচন্দ্রের শেষজীবনে এই আর্থিক দুঃশ্চিন্তা বড় মর্মান্তিক হয়ে দেখা দিয়েছিল। শরীরও সুস্থ ছিলনা। তাছাড়া একদিকে যখন তিনি বিজ্ঞান মন্দিরের আর্থিক সমস্যা নিয়ে বিব্রত, চিন্তাগ্রস্থ—তখন অযাচিতভাবে অর্থের বদলে জোয়ারের মত এসেছিল নানা সম্মান প্রাপ্তি। ১৯২৮ সালে মিশর সরকার জগদীশচন্দ্রকে সম্বর্ধনা জানান। ১৯২৯ সালে ফিনল্যাণ্ডের বিজ্ঞান একাডেমী জগদীশচন্দ্রকে তাঁদের প্রতিষ্ঠানের সদস্যরূপে মনোনীত করেন। এ বছরই সাউথ আফ্রিকা অ্যাসোসিয়েশন ফর দি অ্যাডভানসমেণ্ট অব সায়েন্স তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ১৯৩০ সালে মিউনিখের জার্মান একাডেমীর সভাপতি Dr. K. Hanshofer ও চেয়ারম্যান Dr. Frans Thierfelder ভারত ও জার্মান সাংস্কৃতিক মৈত্রীতে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য জগদীশ-চন্দ্রকে একাডেমীর সদস্য হিসেবে নির্বাচিত করেন। এই একই সময়ে জগদীশ-চন্দ্রকে জার্মান একাডেমী ফর সাইনটেফিক রিসার্চেরও সভ্য মনোনীত করা হয়। ১৯৩১ সালের ১৪ই এপ্রিল কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান তাঁকে নাগরিক সম্বর্ধনা

জানান। বরদা থেকে তাঁকে তিন বছরের জন্য শ্রী সয়াজীরাও গায়কোয়ার প্রাইজ অ্যান্ড অ্যানুইটি প্রাইজ দেওয়া হয়। ১৯৩৩ সালে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক D. Sc ডিগ্রী প্রদান করেন। ১৯৩৫ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজে সম্বর্ধনা জানান হয়। ১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও সম্মানসূচক D. Sc ডিগ্রী প্রদান করা হয়।

১৯৩৫ সালে কলকাতা শহরে দ্বাদশ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন কলকাতা শহরে অনুষ্ঠিত হওয়ার পেছনে ছোট্ট একটি ইতিহাস আছে। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন শুরু হয় ১৯২৩ সালে। এই সম্মেলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ অতুল প্রসাদ সেন। ১৯৩৪ সালে সম্মেলনের একাদশ বৈঠক বসে গোরক্ষপুরে। এই সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতুলপ্রসাদ উদাত্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, "প্রবাসী! চলরে দেশ চল্"। এই সম্মেলন শেষ হওয়ার কিছুদিন পরেই অতুলপ্রসাদ মারা যান। পরের বছর অতুল প্রসাদের বক্তৃতার মূল সুরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ডাঃ সুরেশচন্দ্র রায় ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় উদ্যোগী হয়ে কলকাতায় দ্বাদশ সম্মেলনের আয়োজন করেন। এই সম্মেলনে দেশের সমস্ত প্রান্ত থেকে দুশ'রও বেশী প্রতিনিধি যোগদান করেন। এই উপলক্ষে একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়। সমিতির সদস্যরা ছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র, অবলা বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, নলিনীরঞ্জন সরকার, যামিনী রায়, সত্যচরণ লাহা, নির্মলা সরকার (ডাঃ নীলরতন সরকারের পত্নী), সরলা বসু ও আনন্দবাজার সম্প্রদায়।

এই সম্মেলন উপলক্ষে অসুস্থ শরীরেও জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানের অপব্যবহার সম্পর্কে এক বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। মনে হয় হিটলার ক্ষমতায় আসার পর জার্মানী ও ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে নতুন সমরাস্ত্র উদ্ভাবনের জন্য গবেষণায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগকে স্মরণ করেই তিনি বিজ্ঞানীদের প্রতি সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। জগদীশচন্দ্রের সাবধান বাণীটি আজকের দিনে বিশ্বশান্তির পরিপ্রেক্ষিতে আরও জীবন্ত। পাঠকদের উদ্দেশ্যে জগদীশচন্দ্রের ভাষণটি তুলে ধরছি।

"প্রবাসী বাঙ্গালী সম্মেলনে যাঁহারা প্রতিনিধি হইয়া আসিয়াছেন তাঁহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি।

প্রবাসী বাঙ্গালীদের সহিত নানা সময়ে আমার সাক্ষাৎ করিবার সুবিধা হইয়াছিল। সে ৪০ বৎসরেরও আগেকার কথা। তখন ভারতবর্ষকে প্রকৃত-

রূপে জানিবার জন্য বিভিন্ন প্রদেশে এবং ভারতের বাহিরেও ভ্রমণ করিয়াছি। দেখিয়াছি সর্বস্থানেই বাঙ্গালী তাহার মানসিক প্রতিভাবলে বিবিধ প্রদেশের মঙ্গল এবং ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য নিজেকে নিয়োজিত করিতে সমর্থ হইয়াছে।

একথা কাহারও অবিদিত নাই যে এক সময় বিজ্ঞানক্ষেত্রে একান্ত অপারগ বলিয়া ভারতের অপযশ দেশে-বিদেশে ঘোষিত হইত। সেই দুঃসময় বিজ্ঞানের নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার এবং তাহার প্রচার দ্বারা ভারত যে জগতে উচ্চস্থান অধিকার করিবে এই আশা বাঙ্গালাদেশ পোষণ করিয়াছিল।

বাঙ্গালী সাধক বিজ্ঞানের বিবিধ শাখায় আপাতত বৈষম্য দেখিয়াও নিরুৎসাহ হয় নাই। পরন্তু ইহার মধ্যেও মূলগত একত্বের আবিষ্কার করিতে প্রয়াসী হইয়াছিল এবং সেইজন্য অসীম ধৈর্য সম্বল করিয়া অব্যক্ত জগতের সীমাহীন রহস্য সূক্ষ্ম পরীক্ষা প্রণালী দ্বারা প্রতিষ্ঠা করিতে সাহসী হইয়াছিল।

সমস্ত জগতই যে একতা সূত্রে গ্রথিত এই সত্য জীবন্তভাবে উপলব্ধি করিয়াছিল এবং নানা পথ অবলম্বন করিয়া প্রাণিজগৎ, উদ্ভিদজগৎ এবং জড়জগৎ যে একই নিয়মে পরিচালিত, ইহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

বিভিন্ন প্রদেশবাসী সাধকগণও আজ ৩০ বৎসর যাবৎ তাঁহাদের অত্যাশ্চর্য গবেষণার দ্বারা ভারতের নাম মহীয়ান করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে বাঙ্গালার এবং বাঙ্গলার বাহিরে বাঙ্গালীর প্রচেষ্টা অক্ষুন্ন রহিয়াছে। মাদ্রাজ হইতে ডাক্তার বিমানবিহারী বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি হইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার বিবিধ গবেষণার ফলে বাঙ্গলার ও ভারতের গৌরব বৃদ্ধি পাইয়াছে।

এখন দেখা যাউক বিজ্ঞানের প্রকৃত লক্ষ্য কি। পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান দ্বারা মানুষের শক্তি নানা দিকে বহুলরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। মানবের দুঃখ লাঘব করাই বিজ্ঞানের এক প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু একথা ভুলিয়া কেহ কেহ ইহার অপব্যবহার করিতেছে। ইহারা বিশ্বদ্রোহী। এইসব দুর্মতিগণ বিশ্বে কল্যাণের পথ অবরোধ করিয়া নিজের স্বার্থের জন্য জগতের অকল্যাণ করিতেছে।

অকল্যান মোচন করিয়া কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করাই ভারতের চিরকালের আদর্শ। বিশ্বমৈত্রীর বাণী এদেশে চিরকাল প্রচারিত হইয়াছে। সেইহেতু এদেশে নিঃস্বার্থ জ্ঞান আহরণে জীবন উৎসর্গিত হইয়াছে। তাহার আহ্বানে মানবের কল্যাণহেতু রাজসম্পদ ত্যাগ করিয়া কেহ কেহ দুঃখ দারিদ্র বরণ করিয়াছে এবং দেশ সেবায় অকাতরে জীবন বিসর্জন করিয়াছে। সেইসব জীবনের বিক্ষিপ্ত শক্তি

অন্য জীবন, জ্ঞান ও ধর্মে, শৌর্য্য ও বীর্য্যে পরিপূরিত করিয়াছে। সেই শক্তিতেই মানব দানবত্ব পরিহার করিয়া দেবত্বে উন্নীত হইবে।

আমাদের সর্বাপেক্ষা আশার কথা এই যে প্রবাসে থাকিয়াও বাঙ্গালী বাঙ্গলার সহিত তাহার হৃদয়ের যোগ জীবন্তরূপে অনুভব করিতেছে। যাহারা বিচ্ছিন্ন তাহাদিগকেই মৃত্যু সর্বদা অনুসরণ করে। কিন্তু যাহারা সুখে দুঃখে একই হৃদয়-স্পন্দন দ্বারা অনুপ্রাণিত, তাহারাই মৃত্যুর বিভীষিকা অতিক্রম করিবে এবং তাহাদের প্রচেষ্টা চিরঞ্জীবী হইবে।"

নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ। ১৯৩৭ সাল। জগদীশচন্দ্র রওনা হলেন গিরিডি শহরে; রায়বাহাদুর এ. এন মিত্রের বাড়ীতে। শরীর ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে। রক্তচাপজনিত নানা উপসর্গ বাড়ছে। বিশ্রাম প্রয়োজন। এ মাসের শেষের দিনটিতে তাঁর আশীতিতম জন্মজয়ন্তী ও বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস সমারোহে পালিত হবে। তাই বেশী দিন থাকা চলবে না। এ সময় জগদীশচন্দ্র প্রতিবছরই শীতকালীন অবকাশ যাপনের জন্য গিরিডি যেতেন। তবে কোন সময়েই পুরোপুরি বিশ্রাম হতো না। বিজ্ঞান মন্দির সংক্রান্ত নানা কাগজপত্র ও ছাত্রদের গবেষণাপত্রগুলি সঙ্গে নিয়ে যেতেন। নিজে হাতে পরিমার্জনা করতেন। এবার আর গিরিডি থেকে ফেরা হল না। ২৩শে নভেম্বর সকাল। জগদীশচন্দ্র শেষনিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

গিরিডি ছোট্ট শহর। দুঃসংবাদ মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়লো। বিহার সিভিল সার্ভিসের অফিসার শরৎচন্দ্র বিশ্বাস সেদিন গিরিডি শহরে ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় তিনি বলেছিলেন, "···জগদীশচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা পুষ্পস্তবক নিয়ে তাদের শেষ শ্রদ্ধা জানাতে আসেন। দুপুরের মধ্যে রায় বাহাদুরের বাড়ির সামনের রাস্তা জন-সমুদ্রে পরিণত হয়। বিপুল জনতরঙ্গ থেকে বোঝা গেল এই প্রখ্যাত বিজ্ঞানী এই ছোট শহরের অধিবাসীর কত আপনজন ছিলেন। বেলা দুটো নাগাদ শববাহী গাড়ীটি চলতে আরম্ভ করলে সকলেরই চোখ অশ্রুতে ভরে ওঠে—কারণ তারা আর তাঁদের প্রিয় বিজ্ঞানীর সহাস্য মুখটি দেখতে পাবেন না। দুপুরের মধ্যে দুঃসংবাদ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়লো। জগদীশচন্দ্রের মরদেহ কলকাতার পার্ক সার্কাস ক্রিমেটোরিয়ামে দাহ করা হয়। এ বিষয়ে আনন্দবাজার পত্রিকার বর্ণনা বড় মর্মস্পর্শী। পত্রিকাটি সেদিনের বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন—

"কলিকাতার রাজপথে মর্মস্পর্শী দৃশ্য ঃ বিপুল জনসমুদ্রের শবানুগমন।"

"বিশ্ব বিশ্রুত বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রের প্রতি শেষ অর্ঘ ও শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য গত বুধবার খুব ভোর হইতেই বসু বিজ্ঞান মন্দিরে জনতার সমাবেশ হইতে থাকে। অট্টালিকাবাসী ধনী ও কুটীরবাসী দরিদ্র, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, হিন্দু ও মুসলমান সকল সম্প্রদায় ও সকল শ্রেণীর লোক ও বহু মহিলা অন্তরের ভক্তি-অর্ঘ প্রদানের জন্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন।···সকাল সাড়ে সাতটার সময় তাঁহার মৃতদেহ পুষ্পপত্রাদিতে সুসজ্জিত করিয়া বসুবিজ্ঞান মন্দিরের মধ্যবর্ত্তী উন্মুক্ত স্থানে নামাইয়া আনা হয়। পূর্ব হইতেই সেখানে বিপুল জনতা হইয়াছিল। আগ্রহাকুল নরনারী শেষ দেখা দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তম্মধ্যে কেহ কেহ অশ্রুপাত করিতেছিলেন।···

অল্পক্ষণের মধ্যে মৃতদেহ লইয়া বিরাট শোভাযাত্রা গঠিত হয়।···বেলা ৮-৪৫ মিনিটের সময় শোকযাত্রা বসু বিজ্ঞান মন্দির হইতে বাহির হয় এবং সেখান হইতে এক বিরাট শোকযাত্রা সার্কুলার রোড ধরিয়া উত্তর দিকে অগ্রসর হয়। মঙ্গলবার শেষরাত্রি ৪টা ১২ মিঃ সময় আচার্য জগদীশচন্দ্রের মৃতদেহ মোটর বাসে করিয়া কলিকাতার বসু বিজ্ঞান মন্দিরের সম্মুখে আনীত হয়। তৎক্ষণাৎ উহা বিজ্ঞান মন্দিরের দোতালায় (আচার্য ভবনে) তাহার শয়নকক্ষে লইয়া যাওয়া হয়।···অতঃপর সুসজ্জিত মৃতদেহটি একবার বসু বিজ্ঞান মন্দিরের "বক্তৃতা কক্ষে" লইয়া যাওয়া হয়। এই কক্ষেই তিনি তাঁহার বহু গবেষণার ফলাফল ঘোষণা করিয়াছিলেন।

অন্য জগদীশচন্দ্র

আচার্য জগদীশচন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভার মধ্যে সাহিত্য রচনার প্রতিভা অন্যতম। তাঁর রচিত ইংরেজী প্রবন্ধের তুলনায় মাতৃভাষায় রচিত প্রবন্ধের সংখ্যা খুব কম। সে যুগে তাঁর লেখা প্রবন্ধগুলি তখনকার নানা পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশিত রচনায় বিজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শনের অপূর্ব সমন্বয়, স্বদেশপ্রীতি ও বাংলা সাহিত্যের প্রতি মমত্ববোধ পরিস্ফুট। তাছাড়া তিনি তাঁর রচনাগুলোর মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান গবেষণার কঠিন বিষয়বস্তুকে সহজ সুন্দর প্রকাশভঙ্গীর মাধ্যমে প্রাঞ্জল সাহিত্যগুণমণ্ডিত করেছেন।

বাংলা ১৩২৮ সালে জগদীশচন্দ্র বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধে তাঁর বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধগুলো থেকে কুড়িটি প্রবন্ধের এক সংকলন প্রকাশ করেন। নাম দেন "অব্যক্ত"। গ্রন্থটির মুখবন্ধে জগদীশচন্দ্র লিখেছিলেন, "ভিতরে ও বাহিরের উত্তেজনায়, জীব কখনও কলরব কখনও আর্তনাদ করিয়া থাকে। মানুষ মাতৃ-ক্রোড়ে যে ভাষা শিক্ষা করে সে ভাষাতেই সে আপনার সুখ দুঃখ জ্ঞাপন করে। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে আমার বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য কয়েকটি প্রবন্ধ মাতৃ-ভাষাতেই লিখিত হইয়াছিল। তাহার পর বিদ্যুৎ তরঙ্গ ও জীবন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছিলাম এবং সেই উপলক্ষে বিবিধ মামলা মোকদ্দমায় জড়িত হইয়াছি। এ বিষয়ে আদালত বিদেশে, সেখানে বাদ-প্রতিবাদ কেবল ইয়োরোপীয় ভাষাতেই গৃহীত হইয়া থাকে। এ দেশেও প্রিভি-কাউন্সেলের রায় না পাওয়া পর্যন্ত কোন মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় না।

জাতীয় জীবনের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অপমান আর কি হইতে পারে? ইহার প্রতিকারের জন্য এদেশে বৈজ্ঞানিক আদালত স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছি। ফল হয় এ জীবনে দেখিব না; প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান মন্দিরের ভবিষ্যৎ বিধাতার হস্তে।…

প্রকাশিত গ্রন্থখানি রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে জগদীশচন্দ্র লিখেছিলেন, ৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩২৮ সাল, সুখে দুঃখে কত বৎসরের স্মৃতি তোমার সহিত জড়িত। অনেক সময় সেসব কথা মনে পড়ে। আজ জোনাকির আলো রবির প্রখর আলোর নিকট পাঠাইলাম।" উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "তোমার অব্যক্ত'র অনেক লেখাই আমার পূর্ব পরিচিত এবং এগুলি পড়িয়া বারবার ভাবিয়াছি যে যদিও বিজ্ঞান বাণীকেই তুমি তোমার সুয়োরানী করিয়াছ তবু সাহিত্য সরস্বতী সে পদের দাবী করিতে পারিত; কেবল তোমার অনবধানেই সে অনাদৃত হইয়া আছে।"

আচার্য জগদীশচন্দ্রের সাহিত্য রচনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে জগদীশচন্দ্রের প্রাক্তন ছাত্র রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বাংলা ১৩০৪ সালের প্রদীপ পত্রিকার মাঘ সংখ্যায় বলেছিলেন, "জগদীশবাবু বালকবালিকাগণের শিক্ষাকার্যে বিশেষ আগ্রহশীল। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার ও আমি তাঁহারই উৎসাহে শিশুদের জন্য "মুকুল" নামক সচিত্র মাসিকপত্র প্রকাশ করি।···

বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ আছে। আমার যতদূর মনে পড়ে, তিনি ইংলন্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রথমে "সঞ্জীবনী" পত্রিকায় একটি বাঙ্গলা প্রবন্ধ লেখেন।···তাহার পর আমি যখন "দাসী" সম্পাদক ছিলাম, তৎকালে উক্ত পত্রিকায় তিনি "ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে" নামক একটি ও "কলুঙ্গার যুদ্ধ"* সম্বন্ধে আর একটি প্রবন্ধ লেখেন। পূর্বোক্ত প্রবন্ধটি সম্বন্ধে "সাহিত্য" সম্পাদক নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করেন :—"ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে একটি সুন্দর প্রবন্ধ। লেখক কবিতার ভাষায়, গানের ঝঙ্কারে, বিজ্ঞানের গভীর তত্ত্ব গল্পের মত বর্ণনা করিয়াছেন।" এই প্রবন্ধের একটি স্থান এখনও আমার মনে আছে। তাহা এই :—

"সেই দুইদিন বহু বন ও গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিয়া, অবশেষে তুষার-ক্ষেত্রে উপনীত হইলাম। নদীর ধবল সূত্রটি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া এ পর্যন্ত আসিতেছিল, কল্লোলিনীর মৃদুগীতি এতদিন কর্ণে ধ্বনিত হইতেছিল, সহসা যেন কোন ইন্দ্রজালিকের মন্ত্র প্রভাবে সে গীত নীরব হইল, নদীর তরল নীর অকস্মাৎ কঠিন নিস্তব্ধ তুষারে পরিণত হইল। ক্রমে দেখিলাম, স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড ঊর্মিমালা প্রস্তরীভূত হইয়া রহিয়াছে; যেন ক্রীড়াশীল চঞ্চল তরঙ্গগুলিকে কে "তিষ্ঠ!" বলিয়া অচল করিয়া রাখিয়াছে। কোন মহাশিল্পী যেন সমগ্র বিশ্বের স্ফটিক খনি নিঃশেষ করিয়া এই বিশাল ক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের মূর্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন।···"

···সকলগুলির (সকল প্রবন্ধের) ভাষা মনোজ্ঞ, বিশুদ্ধ ও কবিত্বপূর্ণ। বাস্তবিক কবির কল্পনা ও বৈজ্ঞানিকের কল্পনা সচরাচর লোকে যেরূপ বিভিন্ন প্রকারের মনে করিয়া থাকে, তাহা নহে।** কি সৌন্দর্য-রচনা, কি বৈজ্ঞানিক-

* জগদীশচন্দ্রের লেখা "অগ্নিপরীক্ষা" প্রবন্ধে কলুঙ্গার যুদ্ধের বর্ণনা আছে। ১৮৯৫ সালে মে মাসের "দাসী" পত্রিকায় প্রবন্ধটি ছাপা হয়।

**এ প্রসঙ্গে "অব্যক্তে" সংকলিত "বিজ্ঞানে সাহিত্য" প্রবন্ধে সুন্দর একটি বর্ণনা আছে।

তত্ত্ব আবিষ্কার, উভয়েরই কল্পনার প্রয়োজন। কল্পনা ব্যতিরেকে নূতন কিছু গঠিত বা সৃষ্ট হইতে পারে না।…

জগদীশচন্দ্র সাহিত্য পিপাসুও ছিলেন। ১৯৩৩ সালে শারদীয় বঙ্গশ্রী সম্পাদক এক চিঠিতে প্রশ্ন পাঠিয়ে বলেছিলেন, শৈশবে কোন্ পুস্তকের প্রভাব আপনাকে সর্বাধিক প্রভাবিত করেছিল। এ প্রশ্নের লিখিত জবাবে জগদীশচন্দ্র বলেছিলেন—

"বাল্যকালে মহাভারত পাঠ করিয়াই জীবনের আদর্শ উপলব্ধি করিয়াছিলাম। যে রীতিনীতি মহাভারতে প্রচারিত হইয়াছিল, সেই নীতি যেন বর্তমান কালেও জীবন্তভাবে প্রচারিত হয়। তদনুসারে যদি কেহ কোন বৃহৎ কার্যে জীবন উৎসর্গ করিতে উন্মুখ হন, তিনি যেন ফলাফল-নিরপেক্ষ হইতে পারেন। তাহা হইলে বিশ্বাস-নয়নে কোন দিন দেখিতে পাইবেন যে, বারবার পরাজিত হইয়া যে পরাঙ্মুখ হয় নাই, সেই একদিন বিজয়ী হইবে।"

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মহাভারতের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের খুব ছোট বয়েস থেকেই পরিচয় হয়েছিল। এ বিষয়ে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথকে লেখা জগদীশচন্দ্রের চিঠিপত্রেও তাঁর সাহিত্য-পিপাসার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। জগদীশচন্দ্র প্রায়ই নানা ব্যস্ততার মধ্যেও বিদেশ থেকে রবীন্দ্রনাথকে চিঠি পাঠাতেন, প্রকাশিত লেখার কপি পাঠাতে। এক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্রের দু'-একটি চিঠির অংশবিশেষ তুলে ধরছি—

৩০শে মে ১৯০২ সাল। জগদীশচন্দ্র লন্ডন থেকে লিখেছিলেন, "এতকাল কেবল কার্যসংবাদ লিখিয়াছি। একদিনও মন খুলিয়া চিঠি লিখিতে সময় পাই নাই। আজ আর সব কথা ভুলিয়া তোমার গৃহে অতিথি হইলাম। এক এক সময় মনে হয় দূরে হউক দুঃখের কথা—মানুষের হৃদয় বলিয়া ত একটা জিনিষ আছে। সন্ধ্যার সময় তোমার ঘরে যেন বসিয়াছি। আমার ক্রোড়ে আমার ছোট বন্ধুটি বসিয়া আছে, অদূরে বন্ধুজায়া, আর তুমি তোমার লেখা পড়িয়া শুনাইতেছ। আমি তোমার লেখাগুলি পড়িতেছিলাম, তোমার স্বর যেন শুনিতে পাইতেছি। তুমি যে কালিদাসের সময়ের কথা লিখিয়াছ, মনে হয় যেন পূর্বজন্মের কথা শুনিতেছি। সেসব দিনের কথা স্মরণ করিয়া মন কেমন পুলকে বিহ্বল হয়। এরূপ মধুর স্মৃতি এরূপ উজ্জ্বল সরল প্রেম, এরূপ সুখ এরূপ কল্যাণ অন্য কোন জাতিতে কি কখনও ছিল?

Cambridge, Mass

8th Jan. 1909 "...মনে করিও তোমার বোলপুর ও শিলাইদহের কথা সর্বদা স্মরণ করি। সেই প্রথমে যখন শিলাইদহে গিয়াছিলাম—সে আজ কত বৎসরের কথা—আজও প্রত্যেক দৃশ্য মনে পড়িতেছে।

অনেকগুলি ছোট ছোট গল্প লিখিয়া রাখিও। প্রতিদিন এক একটি শুনাইতে হইবে। জীবনের সন্ধ্যাকালে স্বপ্নরাজ্য জাগিয়া উঠিবে। তাহাই অনেক সময়ে প্রকৃত—এসব মিছা ছোট ঘটনাই অস্থায়ী।"

১৯১৪ সালের বিশ্ব পর্যটন শেষে দেশে ফেরার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগদীশচন্দ্রকে D. sc উপাধি দান করা হয়। এ সময় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদও জগদীশচন্দ্রকে সম্বর্ধিত করেন। পরের বছর পরিষদের সভাপতি নির্বাচনের প্রশ্নে পরিষদের "নবীন ও প্রবীন" সদস্যদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। অবশেষে বিদায়ী সভাপতি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রস্তাবে জগদীশচন্দ্র পরিষদের সভাপতিরূপে নির্বাচিত হন। সভাপতি হিসেবে জগদীশচন্দ্র একটি বাস্তবধর্মী ভাষণ দেন।* তিনি তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, "...যে দলাদলি হইতে পরিষদের উন্নতি পঙ্গুপ্রায় হইয়া উঠিতেছে, সেই দলাদলি হইতে পরিষদকে কিরূপে রক্ষা করা যায় এবং এইসব বাধা দূরীভূত করিয়া পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য—সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ কিরূপে সাধিত হইতে পারে ?"

"জীবনের বহু বাধা-বিপত্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া ও নানা দেশ পরিভ্রমণের ফলে জানিতে পারিয়াছি, সফলতা কোথা হইতে আসে এবং বিফলতা কেনই বা হয়। আমি দেখিয়াছি, যে অনুষ্ঠানে কর্তৃত্ব শুধু ব্যক্তি বিশেষের উপর ন্যস্ত হয়, যেখানে অপর সকলে নিজেদের দায়িত্ব ঝাড়িয়া ফেলিয়া দর্শকরূপে হয় শুধু করতালি দেন, না হয় কেবল নিন্দাবাদ করেন, সেখানে কর্ম শুধু কর্তার ইচ্ছাতেই চলিতে থাকে। দেশের কল্যাণের জন্য যে শক্তি সাধারণে তাঁহার উপর অর্পণ করিয়াছিল, এমন একদিন আসে, যখন সেই শক্তি সাধারণকে দলন করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। তখন দেশ বহু দূরে সরিয়া যায় এবং ব্যক্তিগত শক্তি উদ্দামভাবে চলিতে থাকে। ইহাতে দলাদলির যে ভীষণ বহ্নি উদ্ভূত হয় তাহা অনুষ্ঠানটিকে পর্যন্ত গ্রাস করিতে আসে। দলপতি যদি তাঁহার সহকারী-দিগকে কেবল যন্ত্রের অংশ মনে না করিয়া প্রত্যেকের অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বকে জাগরূপ করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলেই দেশের প্রকৃত কল্যাণ

* ভাষণটি পরে "নবীন ও প্রবীন" নামে অব্যক্ত গ্রন্থে স্থান পায়।

সাধিত হয়। এই কারণে সাহিত্য পরিষদে ব্যক্তিগত প্রাধান্যের পরিবর্তে সাধারণের মিলিত চেষ্টা যাহাতে বলবতী হয় সেজন্য বিবিধ চেষ্টা করিয়াছি। প্রতিষ্ঠিত কোনো সাহিত্য-সমিতিকে খর্ব করিয়া নিজেরা বড়ো হইবার প্রয়াস আমি একান্ত হেয় মনে করি বলিয়া প্রত্যেক সমিতির আনুকূল্য ও শুভ ইচ্ছা আদান-প্রদানের জন্য চেষ্টিত হইয়াছি।…"

"নবীন ও প্রবীণের মধ্যে একটা বৈষম্য আছে। তবে তাহাই বিসংবাদের প্রধান কারণ নহে। ব্যক্তি বিশেষের আত্মম্ভরিতাই প্রকৃত দলাদলির কারণ; ইহা প্রবীণ বা নবীন কাহারও নিজস্ব নহে। প্রবীণ অতি সাবধানে চলিতে চাহেন, কিন্তু পৃথিবীর গতি অতি দ্রুত। যদিও বার্ধক্য তাহার শরীরে জড়তা আনয়ন করে, মন তো তাহার অনেক উপরে, সে তো চিরনবীন! মন কেন সাহস হারাইবে? অন্য দিকে নবীন, অভিজ্ঞতা অভাবে হয়তো অতি দ্রুত চলিতে চাহেন এবং বাধার কথা ভাবিয়া দেখেন না। যাঁহারা বহুকাল ধরিয়া কোনো অনুষ্ঠানকে স্থাপিত করিয়াছেন, তাঁহাদের সেই প্রয়াসের ইতিহাস ভুলিয়া যান হয়তো কখনও প্রবীনের বহু কষ্টে অর্জিত ধন নবীন বিনা দ্বিধায় নিজস্ব করিতে চাহেন। প্রবীন ইহাতে অকৃতজ্ঞতার ছায়া দেখিতে পান। সে যাহা হউক, ধরিত্রী প্রবীণকেও চায়, নবীনকেও চায়। প্রবীণ ভবিষ্যতের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনে যেন উদ্বিগ্ন না হন, আর নবীনও যেন প্রবীণের এতদিনের নিষ্ঠা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন।…"

"কিছুদিন পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন এস্থান পরিদর্শন করিতে আসেন। সেই কমিশনের বিদেশীয় সভ্যগণ ইহার কার্য লক্ষ্য করিয়া ইহাকে জাতীয় জীবন পরিস্ফুটনের এক প্রকার অংগ বলিয়া মনে করিয়াছেন। ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশে ভ্রমণকালেও দেখিলাম, আমাদের এই সাহিত্য পরিষদকে আদর্শ করিয়া তথায় অন্য পরিষদ গঠনের চেষ্টা হইতেছে। এ সবই তো আশার কথা—আশা ব্যতীত আর কি আমাদের সম্বল আছে? সম্মুখে যে ভয়ংকর দুর্দিন আসিতেছে তাহাতে আমাদের জাতীয় জীবন পর্যন্ত সংকটাপন্ন। দুর্দিনের মধ্যে কি আশা লইয়া তবে থাকিব? যে দুই একটি আশার কথা আছে, তাহার মধ্যে সাহিত্য পরিষদ অন্যতম। আমাদের অবহেলায় এই ক্ষীণ প্রদীপটি কি নিবিয়া যাইবে?

পরিষদের সংগে চিরকালই জগদীশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ অব্যাবত ছিল। পরিষদে সাধারণ মানুষের জন্য তিনি নানা বিষয়ের লোকরঞ্জক বক্তৃতার

প্রবর্তন করেন। তিনি নিজে তাঁর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে কেন্দ্র করে বাংলা ১৩২৪ সালের ৭ই চৈত্র ও ১৩২৭ সালের ১৯শে চৈত্র তারিখে আলোকচিত্র সহযোগে ভাষণ দেন। পরবর্তী সময়ে তাঁরই উদ্যোগে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, যদুনাথ সরকার, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, চুনীলাল বসু, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ পরিষদে লোকরঞ্জক বক্তৃতা করেন।

মানুষের রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর ব্যবহারে, তাঁর সৌন্দর্য চেতনায় ও তাঁর ব্যক্তিগত পুস্তক সংগ্রহশালার সংগ্রহকে খুঁটিয়ে দেখলে। এসব ক্ষেত্রে নীরস কিম্বা সরস যে কোন আলোচনার চাইতে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হৃদয়গ্রাহী।

জগদীশচন্দ্রের প্রাক্তন ছাত্র অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর "আচার্য জগদীশচন্দ্রের মহাপ্রয়াণ" প্রবন্ধে বলেছিলেন, "সেটা ১৯০৩ সাল, আমরা তখন এম. এ ক্লাশে তাঁহার ছাত্র। তিনি সকল ছাত্রকে একদিন বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন। খাবারের আয়োজন হইতেছে। তিনি ছেলেদের সহিত গল্প করিতেছেন। কিছুদিন পূর্বে এদেশে ফনোগ্রাফ আসিয়াছে। দেশী records ও প্রস্তুত হইতেছে। তিনি ফনোগ্রাফে একটা গান দিলেন। গানের গোড়াটা এই—

"মন মাঝি তোর বইঠা নেরে,—আমি আর বাইতে পারলাম না।"

গানটা শেষ করিতে দিলেন না। বলিয়া উঠিলেন—দেখ বিদেশীরা বলে আমরা অসভ্য জাত। কিন্তু দেখ সমাজের নিম্নস্তর অবধি আমাদের শিক্ষা আমাদের সভ্যতা কিরূপ পৌঁছিয়াছে। একটা চাষা বাড়ী ফিরিবার সময় পথে যে কথাগুলি বলিতেছে সেগুলি মন দিয়া তোমরা শোন—বলিয়া আবার গানটি দিলেন। গান শেষে তাঁহার মুখ লাল হইয়া উঠিল। তিনি আবার আরম্ভ করিলেন—আমার বড় ক্ষোভ এই যে আমাদের প্রকৃত গৌরব ভুলিয়া মিথ্যা আড়ম্বর লইয়া আমরা পড়িয়া আছি। বাহিরের অনেক দেশ ভাল করিয়া দেখিয়া এখন বুঝিতে পারি, কোন দেশে সভ্যতা এতদূর নিম্নস্তর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে। অন্য কোন্ জাতি অনার্যকে আর্য করিতে পারিয়াছে।…

বসু বিজ্ঞানমন্দিরের প্রাক্তন কর্মী ডঃ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর জগদীশ-স্মৃতি "প্রবন্ধে বলেছিলেন,"…ইহার আগে কখনও তাঁহার লাইব্রেরীর ঘরে প্রবেশ করি নাই, কোন দরকারও পড়ে নাই। লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম—রামায়ণ মহাভারতের বিভিন্ন সংস্করণ হইতে আরম্ভ করিয়া নানা

বিষয়ের অনেক বাংলা বই রহিয়াছে। বাংলা একখানা গীতা-ভাষ্যের একস্থলে একফালি কাগজের চিহ্নও দেখিলাম। বঙ্কিমচন্দ্রও আছেন···

কিছুকাল পরে দার্জিলিং-এ তাঁহার পড়িবার ঘরে দেখিতে পাইলাম—সুদৃশ্য মলাটে বাঁধানো শরৎচন্দ্রের সবগুলি বই টেবিলের পাশে র‍্যাকের মধ্যে সজ্জিত রহিয়াছে। সযত্ন-রক্ষিত তাঁহার একটি বাক্সে "ফায়ার ফ্লাই" নামে অতি সুদৃশ্য মলাটে বাঁধানো রবীন্দ্রনাথের একখানি ছোট্ট বই দেখিয়াছিলাম।···

তিনি ছিলেন আর্টের সমঝদার—সৌন্দর্যের উপাসক। তাঁহার পড়িবার ঘর, বসিবার ঘর, হল ঘর, এমনকি—খাবার ঘরেও দেশীয় প্রখ্যাত শিল্পীদের অঙ্কিত ছবি, বিশেষতঃ অজন্তা গুহাচিত্র এবং দেশীয় শিল্পকলার যেসকল নমুনা সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা হইতেই তাঁহার সৌন্দর্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া তাঁহার বাড়ীর দ্বিতলের* হল্ ঘরের চতুর্দিকে বড় বড় এমন কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য ছবি সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন, যাহা সচরাচর কোথাও দেখা যায় না। সেগুলি হইল ফেরাওদের আমলের প্রাচীন মিশরের শিল্প, ভাস্কর্য, সামাজিক অনুষ্ঠান, যুদ্ধবিগ্রহ এবং নানাবিধ বৈষয়িক ব্যাপার সম্পর্কিত চিত্রাদির নিখুঁত প্রতিলিপি। ছবিগুলির নাম ছিল—"THE BOOK OF THE DEAD"—অতি প্রাচীন মিশরের চিত্রাক্ষর 'হাইরোগ্লিফিক্স্' হইতে আরম্ভ করিয়া ইহাতে ফেরাওদের 'মমি' তৈয়ারীর বিচিত্র প্রক্রিয়ার সর্বসমেত প্রায় দেড়-শতাধিক ছবি ছিল। কিন্তু সবগুলি টাঙান সম্ভব হয় নাই। সু-প্রাচীন বিদেশীয় সভ্যতার ঐতিহ্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি সম্বন্ধে কতখানি অনুসন্ধিৎসা এবং অনুরাগ থাকিলে মানুষের হাতে এইরূপ বস্তুর সংগ্রহ সম্ভব হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়।

বিজ্ঞান-মন্দিরের সুবৃহৎ অট্টালিকা, হল্ঘর, বক্তৃতা-গৃহ গবেষণা-কক্ষ প্রভৃতি সব কিছুই ভারতীয় পদ্ধতি অনুসরণে জগদীশচন্দ্র কর্তৃক পরিকল্পিত।···

বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতীক-চিহ্ন বজ্র ও অর্ধামলক তাঁহার নিজের পরিকল্পনা। নির্যাতিত দেবতাদের দুর্দশা মোচনের জন্য মৃত্যুবরণ করিয়া দধীচি নিজের অস্থি দান করিয়াছিলেন—আর সসাগরা ধরণীর অধিপতি মহারাজ অশোক যথাসর্বস্ব দান করিয়া আধখানা মাত্র আমলকি নিজের জন্য

---

*আচার্যভবনের দোতলায় কোন হল ঘর নেই। হল ঘরটি আছে তিনতালায়। ডঃ ভট্টাচার্য সম্ভবত সেই হল ঘরের কথাই বলেছেন।

রাখিয়াছিলেন, অপরের প্রয়োজনে সেই অবশিষ্ট আমলকি-খণ্ড দান করিয়া রিক্ত-হস্তে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। এই আদর্শকেই তিনি প্রতীক-চিহ্নে রূপায়িত করিয়া বিজ্ঞান-মন্দিরের সর্বত্র অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবনের কর্মধারা পরিসমাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত তাঁহার আদর্শকে যেভাবে বাস্তবে রূপায়িত করিয়া গিয়াছেন তাহার সহিত এই প্রতীকের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রহিয়াছে।…"

বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রাক্তন কর্মী আশুতোষ গুহঠাকুরতা তাঁর বর্ণনায় বলেছিলেন,…ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল এবং পাশ্চাত্য দেশে সেই সভ্যতার বাহকরূপে নিজের পরিচয় দিতে গর্ববোধ করতেন। বিজ্ঞান-মন্দির রচনায়ও তিনি সেই প্রাচীন আদর্শেরই অনুবর্তী হয়েছিলেন। নালান্দা-তক্ষশীলার ঐতিহ্য বহন করে চলবে এই উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্দিরগৃহ নির্মাণেও তিনি নালান্দার স্থাপত্য রীতি অনুসরণ করেন।…

বিজ্ঞান-মন্দির রূপায়ণে ও তৎসংলগ্ন উদ্যান রচনায়, তিনি যে বৈজ্ঞানিক প্রতিভার অন্তরালে একটি শিল্পীমন সযত্নে লালন করতেন তা প্রকাশ পেয়েছে। উদ্যানের স্থানে স্থানে কৃত্রিম পাহাড়, ঝর্ণা, নদী, হ্রদ কোথাও বা পাহাড়ের উপর ক্ষুদ্র সেতু এবং পরিবেশ অনুযায়ী বিভিন্ন উদ্ভিদের দ্বারা সজ্জিত করে নানা রম্যদৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল। কোথাও কোন অসামঞ্জস্য তাঁর নজরে আসলে তখনই তা পরিবর্ত্তনের আদেশ দিতেন। উদ্যানের কোথাও বা গাছের ওপর একটি ঘর বা মঞ্চ। হরিণ, ময়ূর, সারস ও অন্যান্য নানারূপ পাখি রাখার নানা ব্যবস্থা—এই সব মিলিয়ে সেখানে একটি তপোবনের পরিবেশই সৃষ্টি হয়েছিল।*

১৮৮৭ সালে জগদীশচন্দ্র কিছুদিন সস্ত্রীক চন্দননগরে হুগলী নদীর ধারে "পাতালপুরী" নামে একটি বাড়িতে বাস করতেন। এ সময়ে অবলাদেবী তাঁর অসাধারণ ধীসম্পন্ন খেয়ালী স্বামীর যথার্থ সহধর্মিণী হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলেন। জগদীশচন্দ্র তখন প্রতিদিন চন্দননগর থেকে প্রেসিডেন্সী কলেজে যাতায়াত করতেন। তাঁদের একটি "জলিবোট" ছিল। জগদীশচন্দ্র সকালে চন্দননগর থেকে জলিবোটে হুগলী নদী পার হয়ে আসতেন নৈহাটি

*বর্ত্তমানে বিজ্ঞান-মন্দিরের সম্প্রসারণের প্রশ্নে বড় বড় বাড়ী তৈরী হওয়ায় সে সবের অনেককিছুই আজ আর নেই।

স্টেশনে। তারপর ট্রেনে শেয়ালদহ স্টেশান। বিকেলে প্রায় রোজই অবলাদেবী জলিবোট নিয়ে যেতেন নৈহাটির ঘাটে। স্বামীকে ফিরিয়ে আনতে। জীবনের এই পর্বে জগদীশচন্দ্র নানারকমের বৈজ্ঞানিক খেয়াল নিয়ে অবসর সময় কাটাতেন। অবলাদেবীও জগদীশচন্দ্রের এসব খেয়ালে অংশ নিতেন। এ বিষয়ে অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন বসু বলেছিলেন, "জগদীশচন্দ্র ফিজিক্সের খুব ভাল অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর গ্র্যাজুয়েট ও পোস্ট গ্রাজুয়েট ছাত্রদের জন্য একটি ভাল ফিজিক্স-ল্যাবরেটরি তিনি গড়ে তোলেন। শিক্ষকতার জন্য ভাল বন্দোবস্ত করে দিয়ে তিনি অবসর সময়ে নিজের ও বন্ধুদের আনন্দের জন্য তাঁর বৈজ্ঞানিক খেয়ালগুলি নিয়ে কাটান—যেমন এডিসনের নূতন আবিস্কৃত ফনোগ্রাফে গলার সুর তুলে নেওয়া, এক্সরে করা আর বাইরে গিয়ে ফটোগ্রাফ তুলে আনা। ছেলেবেলা থেকেই জগদীশচন্দ্র প্রাচীন ভারতের পৌরানিক ও বৌদ্ধযুগের গল্পগুলি শুনে মুগ্ধ হতেন। দীর্ঘ অবকাশের সময় তিনি দেশের নানাস্থানে ভ্রমণে যেতেন আর সুন্দর সুন্দর প্রাচীন মন্দির ও স্তুপ খুঁজে বার করে তাদের ফোটো তুলে নিতেন। তখনকার দিনে ভ্রমণে বার হওয়া খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। কোনো কোনো দুর্গম পথে গোরুর গাড়ী, টাটু ঘোড়া, ডাণ্ডিতে, কখনো বা হেঁটেও যেতে হত।* জগদীশচন্দ্র ১০"× ১২" প্লেটের ক্যামেরা নিয়ে যেতেন আর ফোটো ডেভেলাপ করা, এনলার্জ করা, প্রিন্ট করা—সব নিজে করতেন। অবলা বসু তাঁর ভ্রমণের সঙ্গী হয়ে এসব কাজে তাঁকে সাহায্য করতেন।" প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পুরাকীর্ত্তি ও নানা দেশের নানা কালের মুদ্রা সংগ্রহেরও প্রবণতা জগদীশচন্দ্রের মধ্যে ছিল। তার কিছু কিছু নিদর্শন আজও বর্ত্তমান।

জগদীশচন্দ্র প্রায় বছরখানেক চন্দননগরে ছিলেন। তারপর তিনি কলকাতায় চলে আসেন। কলকাতায় নিজস্ব বাড়ী না হওয়া পর্যন্ত জগদীশচন্দ্র শহরের নানা ঠিকানায় বাস করেন। ১৮৮৫ সাল থেকে ১৮৯২ পর্যন্ত ৬৩/২ মেছুয়াবাজার স্ট্রীটের বাড়ীতে, ১৮৯২ সাল থেকে ১৮৯৬ সাল পর্যন্ত ইন্টালির কনভেন্ট রোডের একটি বাড়ীতে, ১৮৯৭ সাল থেকে ১৮৯৯ সালের শেষ পর্যন্ত

*দেশের দর্শনীয় স্থানগুলির মধ্যে অজন্তা, ইলোরা, সোমনাথ, বুদ্ধগয়া, পাটলিপুত্র, নালন্দা, তক্ষশিলা, হম্পা, বদ্রীনাথ, কেদারনাথ, কাশ্মীর, পিণ্ডারি গ্লেসিয়ার, উড়িষ্যাও সমগ্র দক্ষিণভারতের মন্দিররাজির কারুকার্যের কথা জগদীশচন্দ্রের প্রবন্ধ ও ডায়রীতে বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে।

থাকেন ১৩৯নং ধর্মতলা স্ট্রীটের বাড়ীতে। এরপর বিদেশ ভ্রমণ শেষে চলে আসেন ৮৫নং আপার সার্কুলার রোডের বাড়ীতে। ১৯০০ সালের জুলাই মাসে পুনরায় বিদেশ যাত্রার কিছু আগে বর্ত্তমান আচার্য ভবনের জমিটি কেনেন। ১৯০২ সালে জগদীশচন্দ্র নিজের বাড়ী বর্ত্তমান আচার্য ভবনে পাকাপাকিভাবে বসবাস শুরু করেন। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন বসু তাঁর স্মৃতি-কথায় বলেছিলেন, "বছরখানেক এরকম (চন্দননগরে) কাটাবার পর জগদীশচন্দ্র আমার বাবা মা, মোহিনীমোহন বসু ও সুবর্ণপ্রভার সঙ্গে কলকাতার বৌবাজারে একটি ফ্ল্যাট ভাড়া করে থাকার ব্যবস্থা করেন। বাবা মোহিনীমোহন বসু হলেন আনন্দমোহন বসুর ছোট ভাই আর মা সুবর্ণপ্রভা ছিলেন জগদীশচন্দ্রের বোন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মশায় তখন প্রেসিডেন্সী কলেজে বি. এ ক্লাশের ছাত্র। তিনি লিখেছেন, এই বৌবাজারের বাড়িতে জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে প্রায় আসতেন সে সময়কার এই ছাত্র শিক্ষকের সম্বন্ধ ক্রমে স্থায়ী বন্ধুত্বে পরিণত হয়। প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ-এর সম্পাদক—জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক আবিস্কারকে জনপ্রিয় করার জন্য সর্বদা তাঁর পত্রিকায় স্থান রাখতেন।

কিছুদিন পরে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষে বা ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে আমার বাবা মা সস্ত্রীক জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে একটি বড় একতলা বাড়ি ভাড়া নেন ৬৪/২ মেছোবাজার স্ট্রীটে। বাড়ির সামনে ছিল বাগান, খেলার মাঠ, পুকুর। সে বাড়ি এখন আর নেই। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জগদীশচন্দ্র আমার বাবা মার সঙ্গে এই বাড়িতে থাকতেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে জগদীশচন্দ্র কনভেন্ট রোডে একটি বাড়ি ভাড়া নিলেন, চন্দননগর থেকে তাঁর রুগ্ন বাবা মাকে সেখানে আনার জন্য।

মেছোবাজারের বাড়িতে কিছুকালের জন্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এসেছিলেন জগদীশচন্দ্রের অতিথি হয়ে। এডিনবারা থেকে ফেরার পর প্রফুল্লচন্দ্রকে কয়েকমাস অপেক্ষা করতে হয়; পরে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে কেমিস্ট্রীর সহকারী প্রফেসারের কাজে নিযুক্ত হন। এই কাজ পাবার পর প্রফুল্লচন্দ্র ৯১ আপার সার্কুলার রোডে এক বাড়ি ভাড়া করে থাকেন; এই বাড়িতে তিনি বাস করেন ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত।··· জগদীশচন্দ্র ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ৯৩ আপার সার্কুলার রোডে নিজের বাড়ি করেন।···"

অধ্যাপক বসু তাঁর আচার্যভবনের স্মৃতিচারণে বলেছিলেন, "···আমরা

প্রায় সব সময়ে মামার নিকটবর্তী কোন বাড়িতে বাস করিয়াছি। সে সময়ে রবীন্দ্রনাথের কাব্য রচনা প্রতিভার চেয়েও গায়কের প্রতিভার বেশী প্রচার ছিল। মামার বাড়িতে আসিলে কিছু কবিতা পাঠ কিম্বা গান করার অনুরোধ হইত। মনে আছে স্বদেশীর সময়ে রবীন্দ্রনাথ সপ্তাহে কয়েকখানা স্বদেশী গান রচনা করিয়া মামার নিকট ৯৩ U. C Road-এ আসিয়া গান করিয়া শুনাইতেন। আমার জাঠতুতো দাদা ৺হেমেন্দ্রমোহন বসু সেই সময়ে বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে Phonograph-এ মোমের Cylinder-এ record করতেন। রবীন্দ্রনাথের সব স্বদেশী গান তিনি মামার বাড়ীতে আসিয়া record করেন। তখনকার record-এর মধ্যে ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম গান', রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তি "সোনারতরী" ও গান "ওই ভুবন মন মোহিনী", "সার্থক জনম মম", "তোর ডাক শুনে যদি কেউ না আসে" ইত্যাদি। সব সেই সময়ের রচিত গান। দুঃখের বিষয় বছর পনেরর ভেতর সেই সব record নষ্ট হয়ে যায়। যাঁরা রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তি ও গান শুনেছেন তারাই বুঝবেন যে তাহাতে কি একটা মূল্যবান জিনিষ recordগুলির সঙ্গে নষ্ট হয়ে গিয়াছে।…"

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সে সময় এ বাড়িতে (আচার্য ভবনে) বসেই বর্ত্তমান ফেডারেশন হল বা মিলন মন্দিরের গঠনমূলক উন্নতির প্রস্তাব নেওয়া হয়। এই আচার্য ভবন থেকেই আনন্দমোহন বসু অসুস্থ শরীরে মিলনমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে লেখা জগদীশচন্দ্রের একটি চিঠি তুলে ধরছি। তাতে দেখা যাবে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের বিপরীতে ও ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়ের পাশে অবস্থিত বর্ত্তমান ফেডারেশন হল বা মিলনমন্দির কি আদর্শে তৈরী করার চেষ্টা হয়েছিল।

২০এ অক্টোবর
১৯০৫

বন্ধু,

তোমাকে একটা বিষয় পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে। সর্বপ্রথম আমাদের বঙ্গভবন প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। একটি মূর্তিমান এবং বর্দ্ধমান জিনিষ আমাদের উৎসাহের প্রধান সহায় হইবে। তারপর এই স্থান কেন্দ্র করিয়া যত বড় কাজ আছে হইবে। এইস্থানে ৫০০০ লোকের বসিবার হল হইবে, সেখানে প্রতি পক্ষে নিয়মিতরূপে ছাত্রদের জন্য বক্তৃতা, কথকতা ইত্যাদি হইবে। তারপর আমাদের সেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের

বক্তৃতা এখানে নিয়মিতরূপে দেওয়া হইবে। এ বিষয়টি অতি গুরুতর, কারণ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ছাত্রদিগকে বহিষ্কার জন্য বিবিধ সাংঘাতিক চেষ্টা হইতেছে—ইহার প্রতিবিধান একান্ত আবশ্যক।

তারপর জাতীয় ভবনে তোমার সমাজের অধিবেশন হইবে, নানা department শিল্প বাণিজ্য ইত্যাদির শাখা থাকিবে। Subscription তুলিয়া mill ইত্যাদি করিবার চেষ্টা ভুল। এই কেন্দ্র হইতে নানা বিষয়ের অনুসন্ধান, সংবাদ ইত্যাদির দরকার।

এ স্থানে বঙ্কিম, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামমোহন রায় ইত্যাদির স্মৃতিচিহ্ন থাকিবে ইত্যাদি।

তুমি এ বিষয় অতি সুন্দর প্রবন্ধ প্রস্তুত করিবে। ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ার দিন একস্থানে পঠিত হইবে।

এ সময় আমাদের বিজ্ঞজনেরা বিবিধ জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিবেন এবং ঘুমাইবার পরামর্শ দিবেন। এখনই জাগ্রত থাকিবার সময়। তোমাকে চৌকিদারী করিতে হইবে।

তোমার বন্ধু

জগদীশচন্দ্র প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথের রচনাগুলি ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করে বিশ্ব সাহিত্যের ক্ষেত্রে বন্ধুকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। একথা আমরা জগদীশচন্দ্রের প্রথম জীবনের চিঠিপত্রে দেখেছি। পরবর্তীকালে এই সূত্র ধরেই হয়ত রবীন্দ্রনাথ নিজের সাধনা-সঙ্গীতগুলি ইংরেজীতে তর্জমা করেন ও নোবেল পুরস্কার পান। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কেও জগদীশচন্দ্র দেশপ্রেমমূলক রচনায় নূতনভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। এপ্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জীবনীকার দেবকুমার রায়চৌধুরী লিখেছিলেন, "...বলা বাহুল্য, মাতৃভূমির সুসন্তান দেশভক্ত জগদীশচন্দ্রের এই অমূল্য উপদেশ কবির অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে গিয়া তখনই এক অভূতপূর্ব আন্দোলন উপস্থিত করিল এবং তাহারই ফলে দ্বিজেন্দ্রলাল সেই দেশাত্মবোধক মহান সংগীত "আমার দেশ" রচনা করিয়া বঙ্গ সাহিত্যকে ও বাঙ্গালী জাতিকে সমৃদ্ধ ও উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিলেন।"

জগদীশচন্দ্রের স্বদেশভাবনার পরিচয় বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, জীবনের নানা ঘটনায় ও রবীন্দ্রনাথকে লেখা নানা চিঠিপত্রে সুন্দরভাবে পরিস্ফুট। তাঁর স্বদেশপ্রীতি সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদে আবদ্ধ ছিল না।

জীবনের শেষ প্রান্তে নানা আর্থিক সঙ্কটের মধ্যেও দেশের নানা হিতকর কাজে তিনি তাঁর সাধ্যের অতীত অর্থ দান করেছিলেন। বৈজ্ঞানিক পরিভাষার ওপর গবেষণার জন্য জগদীশচন্দ্র বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে অর্থ সাহায্য করেছিলেন। মৃত্যুর বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই জগদীশচন্দ্র প্রতি বছর বিহারের খনি অঞ্চল গিরিডি শহরে যেতেন। সকাল সন্ধ্যায় উপলব্ধি করতেন সাধারণ শ্রমিকদের প্রতি খনি মালিকদের নানা বঞ্চনার কূটকৌশল। মালিকশ্রেণীর অত্যাচারে শ্রমিকরা নির্যাতিত। খনি মালিকদের তরফ থেকে শস্তাদরে মাদকদ্রব্যের যোগানের ফলে শিক্ষাহীন নির্যাতিত শ্রমিকরা বাকরুদ্ধ। ন্যায্য পাওনায় ও সুস্থ জীবনযাপনে তাঁরা বঞ্চিত। মৃত্যুর কিছু আগে জগদীশচন্দ্র ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদকে* ডেকে পাঠান। বিহারের নির্যাতিত খনি শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য এক লক্ষ টাকা দান করে শ্রমিক কল্যাণের কর্মভার ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের ওপর ন্যস্ত করেন। এই অর্থদানের পরিণতি জগদীশচন্দ্র দেখে যেতে পারেন নি। এ প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন :

Before he died Sir J. C. donated a large amount for prohibition work in the mining areas of Bihar and asked me to use the income from the interest of that amount. The prohibition work continued under my supervision till my imprisonment in 1942. Lady Bose continued to remit the interest money ragularly…"

---

*ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ তখন জাতীয় কংগ্রেসের নেতা ছিলেন।

পরিশিষ্ট

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জগদীশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তখন ভারতবর্ষে আধুনিক বিজ্ঞানচর্চার কোন বাতাবরণ সৃষ্টি হয়নি। আর প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানচর্চার অগ্রগতি বহুযুগ আগেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কারণ যাঁরা লেখাপড়া শিখে পণ্ডিত হতেন তাঁরা হাতের কাজ করতেন না। স্বাভাবিক কারণেই বস্তুজগতের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। আর যাঁরা হাতের কাজ করতেন তাঁরা লেখাপড়া জানতেন না। ক্ষুদ্রগোষ্ঠী স্বার্থে ও অজ্ঞতাহেতু তাঁরা যা করতেন তা লিখে রাখতেন না। ফলে উভয়ের সমন্বয়ের অভাবে ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চা ক্রমশ বিলুপ্তির পথে গিয়েছিল।

জগদীশচন্দ্র একাধারে বিজ্ঞানী ও যন্ত্রবিদ ছিলেন। তিনিই প্রথম আধুনিক ভারতে উভয়ের সমন্বয় সাধন করেছিলেন। জগদীশচন্দ্র অনেক সময় বলতেন, ভারতবর্ষে বিজ্ঞানচর্চার সূত্রপাত করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। ভারতের বিজ্ঞানের পুনর্জাগরণই তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যসাধনে জগদীশচন্দ্র পৃথিবীর বিজ্ঞান গবেষণার বহু শাখায় পুরোধা হয়ে আছেন!

১৮৯৫ সালের Electrician কাগজ জগদীশচন্দ্রের পদার্থবিজ্ঞানের কাজ সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণী করে লিখেছিল, "His sensitive detector of electromagnetic radiation, perfectly prompt in its self-recovery, should serve to revolutionise the existing methods of wireless Telegraphy."

রাশিয়ার State University তাসকেন্টের অধ্যাপক Prof Leno বলেছিলেন, "The great success of Comparative Electro physiology is indivisibly connected with your name. The translation of your works would be of the greatest help to Russian Physiologists"। বিখ্যাত রাশিয়ান বিজ্ঞানী Timiriazeff বলেছিলেন, "A very remarkable example of the application of exact physical methods to the physiology of plant is afforded by the labours of the Indian savant whose very name indicates a new era in the development of Science in general. His work

must at once be acknowledged as a classic in the field of physiological research…"

১৯২২ সালের ১৪ই মার্চ প্রখ্যাত শারীরতত্ত্ববিদ Prof. Nemec লিখে-ছিলেন, "I admire you original methods in studying plant reaction and growth, and I believe it means a new epoch in plant physiology."

আচার্য জগদীশচন্দ্রের গবেষণা সম্পর্কে Encyclopaedia Britanica মন্তব্য করেছে, His work was so much in advance of his time that the precise evolution of it was not possible। মন্তব্যটি যথাযথ। 'মাইক্রোওয়েভ' আবিষ্কার ছাড়াও তাঁর গবেষণার অন্য একটি অবদান P-type ও N-type coherers। পরবর্তীকালে এটি P-type ও N-type Semiconductor নামে চিহ্নিত হয়। নোবেল বিজ্ঞানী Brattain জগদীশচন্দ্রের এই গবেষণা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, Between 1889 and 1902 J. C. Bose pioneered in P-type and N-type Semiconductor which Bose called coherers (Proc. I.R.E 1954-58)। ১৯০১ সালে জগদীশচন্দ্র আলোক-কোষ বা photo cell (তেজোমিটার) আবিষ্কার করেন। এই গবেষণা জগতের অগ্রজ বিজ্ঞানী ব্রুনো ল্যাঙ্গে (Bruno Lange) সম্প্রতি তাঁর বিখ্যাত 'Photo Element' গ্রন্থে জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন—"গ্যালেনা (Lead Sulphide) টেলুরিয়াম এবং অন্যান্য খনিজ নির্দেশকের আবিষ্কার হয়েছিল সুদূর পূর্বপ্রান্তে কলকাতার জগদীশচন্দ্র বসু কর্তৃক। তথ্যটির সন্ধান পাওয়া যাবে আমেরিকান একটি পেটেন্টে।"

আচার্য জগদীশচন্দ্রের এই বিপুল অবদানের প্রচার সম্পর্কে আমাদের দেশে কিন্তু দুটি ধারা প্রকটভাবে চোখে পড়ে। প্রথম ধারাটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে 'শনিবারের চিঠির' সম্পাদক সজনীকান্ত দাশ দুঃখ করে বলেছিলেন, "জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের স্পষ্ট বা অস্পষ্ট কোন ধারনাই নাই। নিতান্তই কিংবদন্তীর জোরে বেতারের সঙ্গে তাঁর একটা সম্পর্ক খাড়া করিয়া অনেককেই দুঃখ করিতে শোনা যায়, নেহাৎ পরাধীন দরিদ্র ভারতবাসী বলিয়াই তিনি তাঁর আবিষ্কারের মূল্য পান নাই। মাঝখান হইতে মার্কনি সাহেব নাম করিয়া

ফেলিলেন।" প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জগদীশচন্দ্রের জড় পদার্থের সাড়া ও উদ্ভিদ-তাত্ত্বিক গবেষণা সম্পর্কে নানা আজগুবি ধারণা দেখতে পাওয়া যেত। আজও কিন্তু সজনীকান্তের মন্তব্য বহুলাংশে সত্যি।

সাধারণ মানুষের জানার মাধ্যম নানা বিজ্ঞজনের জনপ্রিয় লেখা। জগদীশ-চন্দ্র ও তাঁর গবেষণা সম্পর্কে যে সব লেখা চোখে পড়ে তার অধিকাংশই ঘটনা-প্রবাহ সম্পর্কে সীমিত জ্ঞান নিয়ে ও এক ধরণের আবেগকে সম্বল করে লেখা। তাতে সঠিক তথ্য পাঠকদের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস খুব কম চোখে পড়ে।

দ্বিতীয় প্রচারটি বহুধা বিভক্ত হলেও মূল সুর তাতে একটিই। যেন তেন প্রকারে জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে নানা অপপ্রচার সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরা। এইসব বিভ্রান্তিমূলক অপপ্রচার সম্পর্কে জগদীশচন্দ্র সে সময় মোটামুটি একটি ধারণা করেছিলেন। জানা যায় পয়লা আগষ্ট ১৯২৯ সালে লেখা জগদীশচন্দ্রের একটি চিঠি থেকে। জগদীশচন্দ্র দুঃখ করে অধ্যাপক ভাইনসকে লিখেছিলেন, It is much easier to raise oneself from obscurity by criticising or appreciating the work of a man who is becoming well-known. The object of the propaganda is evidently to discredit my work, and as the Government grant is subject to the vote of Delhi Assembly (House of Commons) it might serve to harm the Institute by the refusal of grant."

জগদীশচন্দ্র নিজের চেষ্টায় গবেষণা শুরু করেছিলেন। অসংখ্য বাধা বিপত্তির মধ্যে তাঁকে অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগুতে হয়েছিল। বরাবরই সরকারী সাহায্য অনিয়মিত ছিল। তিনি তাঁর গবেষণা শুরুর কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন, What was my equipment and what was my Laboratory ? There were practically no instruments, and the extent of my laboratory was a small room about 20ft. square with an attached bathroom. তাই হয়ত তিনি তাঁর বিরুদ্ধে সমস্ত অপপ্রচারকে সে সময় বহুকষ্টে তৈরী বসু বিজ্ঞান মন্দিরে সরকারী অর্থসাহায্য কমানোর প্রচেষ্টা ছাড়া অন্য কিছু ভাববার অবকাশ পাননি। কিন্তু আজ সময়ের ব্যবধানে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, এই অপপ্রচার কি শুধুই বসুবিজ্ঞান মন্দিরের সরকারী সাহায্য কমিয়ে দেওয়ার অপপ্রয়াস ? না

এর মূলে অনেক গভীরে ছিল ? ভারতীয়রা নিজের চেষ্টায় বিজ্ঞান গবেষণার পথিকৃত হবে—এ সত্য এক ধরনের বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীল মানুষের কাছে চিরকালই অসহ্য। সুতরাং অভীষ্ট সিদ্ধির প্রথম সোপান আধুনিক ভারতীয় বিজ্ঞান গবেষণার জনক আচার্য জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা। আর ভাবীকালের মানুষদের কাছে বলা—না ভারতীয় বিজ্ঞান গবেষণা পশ্চিমের আশীর্বাদেই শুরু হয়েছিল। এতে ভারতীয়দের কোন প্রচেষ্টা নেই।

জগদীশচন্দ্রের যুগান্তকারী (আজকের) পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক কাজগুলো-সম্পর্কে বিভ্রান্তিমূলক প্রচার কম চোখে পড়ে। কারণ জগদীশচন্দ্রের পদার্থবিজ্ঞানের কাজগুলো ছিল পাশ্চাত্য চলমান গবেষণার বিস্ময়কর অগ্রগতি। কিন্তু জগদীশচন্দ্র যখন জড়পদার্থের সাড়া ও উদ্ভিদতত্ত্ব নিয়ে যুগান্তকারী আবিষ্কার করে নিজের নূতন চিন্তার মৌলিকত্ব প্রচার করছেন, তখনই অপপ্রচারের সূত্রপাত দেখা যায়। বর্তমানে মাত্র কয়েকটি বিভ্রান্তিমূলক অপপ্রচারের নমুনা পাঠকদের সামনে উপস্থিত করছি। এই অপপ্রচার বিস্ময়কর হলেও তখনকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯১৯ সাল। জগদীশচন্দ্র সবে ক্রেস্কোগ্রাফ (Crescograph) যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন (দশলক্ষগুণ বড় করে উদ্ভিদের বৃদ্ধি পরিমাপক যন্ত্র)। গাছের বৃদ্ধির ওপর বিভিন্ন উত্তেজক পদার্থের প্রতিক্রিয়া মাপিয়ে দেখছেন। ১৯শে মে তারিখের "Daily News" পত্রিকায় খবর বেরুল :

"DRUNKEN FLOWERS"

Discovery of Famous Indian.........১৯২৫ সালের ১৩ই অক্টোবর তারিখের Popular Science Sifting Vol. LXIIX. No 1774 Tuesday, জগদীশচন্দ্রের "Photosynthetic Bubbler Recorder" (গাছের সালোকসংশ্লেষণ পরিমাপক যন্ত্র) সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখল :

"PLANT THINK AND FEEL"

......Recent discoveries by Sir Jagadis Chandra Bose, the distinguished Plant Psychologist of Calcutta......এই একই গবেষণা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে "Northern Whing" কাগজ ২১. ৮. ১৯২৫ তারিখে লিখল :

"THYROID GLAND ON PLANTS"

Indian Doctor's Tests……

উদ্ভিদের ওপর তাপমাত্রার প্রভাব সম্পর্কে জগদীশচন্দ্র সুন্দর কতগুলো গবেষণা করেছিলেন। এ গবেষণায় জগদীশচন্দ্রের অপরাধ (?) একটিই ছিল। কারণ যে গাছটিকে নিয়ে তিনি তাঁর প্রাথমিক গবেষণা পর্ব শুরু করেছিলেন, ঘটনাচক্রে সেই গাছটির অবস্থিতি ছিল একটি মন্দির প্রাঙ্গনে। গবেষণাটির বর্ণনা গ্রন্থের অন্যত্র দেওয়া হয়েছে। এ গবেষণা সম্পর্কে "Morning post" কাগজ মূল গবেষণাকে আড়াল করে ৯ই নভেম্বর ১৯২৫ তারিখে লিখল :

"TREES' REACTION TO SOUND"

কয়েকদিন পর ১২ই নভেম্বর তারিখে "Glasgow Herald" কাগজ একই কায়দায় লিখল :

··It has been found that plants do react to sound, and that, for example, a certain palm tree bends earthwards as if in obeisance when the temple bells in the vicinity begin to ring, Sir Jagadis Chandra Bose.……

জগদীশচন্দ্র বনচণ্ডাল গাছের (Desmodium gyrans) স্বতঃস্পন্দন ও তার বৈদ্যুতিক লিপি নিয়ে কাজ করছেন। ৩০শে জুন ১৯২৬ সালের "West Minister Gazette", জগদীশচন্দ্রের এই আবিষ্কারের কথা বলতে গিয়ে বলল :

"HEART BEATS OF PLANTS"

More emotional than Human beings. The plant spoke and wrote its life's history with the leaves. এ বিষয়ে "Daily News"কাগজ ২৬শে মে ১৯২৭ তারিখে তাদের সংবাদের শিরোনামে লিখল :

THE PLANT PSYCHOLOGIST !

ঐ একই গবেষণা বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে ২২. ৫. ১৯২৭ তারিখের Reference ও ২৬.৬.১৯২৭ তারিখের Observer পত্রিকা তাদের প্রতিবেদনের শিরোনামে লিখল :

"THE PERSONALITY OF PLANTS"

এ জাতীয় অপপ্রচারের সুযোগ নিয়ে জনৈক Mr. Dastur বোম্বের Sir Cowasjee Jahangir Hallএ এক ভাষণ দিলেন। তিনি বলে বসলেন;

জগদীশচন্দ্রের উদ্ভিদতাত্ত্বিক গবেষণা নাকি ঠিক নয়। দু একটি কাগজে খবরটি প্রকাশিত হল।

এতদিন সমস্ত বিভ্রান্তিমূলক অপপ্রচারকে জগদীশচন্দ্র অসীম ধৈর্য সহকারে উপেক্ষা করে এসেছেন। কিন্তু এবার তা সম্ভব হলো না। তিনি Mr. Dastur সম্পর্কে মন্তব্য করতে বাধ্য হলেন। তিনি বললেন, The greatest Scientists in the World have accepted my theory and I cannot condescend to enter into a controversy with a novice in Science", জগদীশচন্দ্রের বাক্তব্যটি ৫ই অক্টোবর ১৯২৮ তারিখের "Englishman" কাগজে প্রকাশিত হল। দু'চার দিনের মধ্যেই জগদীশচন্দ্র সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে আর একটি ঘোষণা করলেন। তাতে তিনি বললেন, In answer to the misrepresentation that my work shows a proneness to mysticism I can do no better than quote the following from a review of one of my recent works that appeared in the "New York Times". The reviewer unlike many others, taking care to read through the book and stating that, "It is impossible to ignore the relentless logic of his conclusion which are based upon the most modern methods of Scientific laboratory procedure. There is not a trace of mysticism ; but it does contain miracles aplenty—modern laboratory miracles……

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই সব অপপ্রচারে বিজ্ঞানী মলিশ (রেক্টর, ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়) মর্মাহত হয়ে চৌঠা আগষ্ট তারিখের (১৯২৮) "Nature" পত্রিকায় এক প্রবন্ধে বলেছিলেন, তিনি বহু বছর ধরে জগদীশচন্দ্রের প্রায় সমস্ত গবেষণা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, জগদীশচন্দ্রের সমস্ত উদ্ভিদতাত্ত্বিক গবেষণাই আধুনিক বিজ্ঞানের নূতন দিশারী।

শুধু বিদেশবাসীরাই নন, কিছু দেশের মানুষও জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। সে বিষয়ে গ্রন্থের প্রথমদিকে একটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। এইসব প্রতিক্রিয়াশীল মানুষদের সম্পর্কে ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯২৮ সালের "Forward" সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখেছিলেন, "It is a striking coincidence that at about the time when Sir

J. C. Bose has returned to his native land, rich in honour, conscious of the triumphs he has achieved abroad, some of his own countrymen should seek to assail his undisputed position…".

আচার্য জগদীশচন্দ্রের মহাপ্রয়াণ ঘটে ১৯৩৭ সালের ২৩শে নভেম্বর। তারপর বসু বিজ্ঞান মন্দিরের কর্ণধার হন জগদীশচন্দ্রের উত্তরসূরী (ভাগিনেয়) অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন বসু। তিনি দীর্ঘ ত্রিশ বছর বিজ্ঞান মন্দিরের কর্ণধার ছিলেন। অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন কর্মজীবন থেকে অবসর নেন ১৯৬৭ সালে প্রায় ৮৭ বছর বয়সে। ১৯২৮ থেকে ১৯৬৭ সাল অর্থাৎ জগদীশচন্দ্রের সেই প্রকাশ্য উক্তির পর থেকে দেবেন্দ্রমোহনের কর্মজীবনের শেষদিন পর্যন্ত জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে অপপ্রচার খুব কম চোখে পড়ে। এরপর আবার নতুন করে কিছু বিদেশী ও দেশী এই দুই অপপ্রচারেরই সূত্রপাত হয়। ১৯৭৪ সালের ১০ই অক্টোবর Peter Tompkins নামে এক ভদ্রলোক বসু বিজ্ঞান মন্দিরে দর্শনার্থী হয়ে আসেন। তিনি এ সময়ে তাঁর লেখা "The Secret life of Plants" নামে একটি পুস্তক বিজ্ঞান মন্দিরের প্রবীন কর্মীদের উপহার দেন। বর্তমান লেখককেও তিনি এক কপি পুস্তক উপহার দিয়েছিলেন। বইটির অধিকাংশ রচনাই Plant-Psychology-বিষয়ক কথাবার্তায় ভরা। মাঝে জগদীশচন্দ্রের কাজের কিছু উল্লেখ তাতে চোখে পড়ে। বইটির লেখক বিজ্ঞানের ছাত্র কিনা তার কোন উল্লেখ নেই। পরিচিতিতে প্রথম পাতায় লেখা—"Peter Tompkins…Educated at Harvard College, Columbia University…he became a war correspondent in Europe and Africa and was later involved in intelligence work in Europe. He is the author of a number of works of biography and history……"

১৯৭৬ সালের জুলাই মাসে Mr. Walon Green নামে এক ভদ্রলোক "The Secret life of Plants" নামে পূর্বর্ণিত বইটির চিত্ররূপ দেওয়ার জন্য বসু বিজ্ঞান মন্দিরে আসেন। বইটির চিত্ররূপে আরও নগ্ন। স্বাভাবিক কারণেই উক্ত ব্যক্তিকে জগদীশচন্দ্রের কোন কিছুর (যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য জিনিষপত্রের) ছবি তুলতে অনুমতি দেওয়া হয়নি। ১৯৭৮ সালের ১৪ই মার্চ তারিখে Mr. Marcel Vogel নামে অন্য এক ভদ্রলোক বসু বিজ্ঞান মন্দিরে

আসেন। তিনি জগদীশচন্দ্রের যন্ত্রপাতি ও তার পরীক্ষা দেখে বলেন, জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপ প্রশংসার দাবী রাখে। বসু বিজ্ঞান মন্দিরে এসে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করছেন। তিনি নাকি জগদীশচন্দ্রের প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে ইতিমধ্যে কিছু কাজ করে ফেলেছেন। তিনি দাবী করলেন, বহু পরিশ্রমে ও কঠোর নিষ্ঠায় তিনি ভারতীয় যোগচর্চা রপ্ত করে কিছু গবেষণা ইতিমধ্যে সাঙ্গ করেছেন। প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় প্রমাণ করেছেন, যোগ সাধনায় গাছের বৃদ্ধি ভীষণভাবে বাড়িয়ে দেওয়া যায়। প্রয়োজনে কমানও সম্ভব। বর্তমান লেখক জগদীশচন্দ্রের বিখ্যাত ক্রেস্কোগ্রাফ যন্ত্রে একটি ছোট্ট ঘাস লাগিয়ে Mr. Vogel-কে তাঁর যোগক্ষমতা প্রয়োগ করতে অনুরোধ জানান। বহু প্রবীন বিজ্ঞানীর উপস্থিতিতে তিনি শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করে বলেন, পরীক্ষাধীন গাছটি আমার যোগ ক্ষমতা থেকে বেশী শক্তিশালী বলে মনে হচ্ছে। পরের দিন আবার চেষ্টা করবেন— এই কথা দিয়ে তিনি সেদিনের মত বিদায় হন। কিন্তু পরে আর কোনদিনই তাঁকে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের কাছে পিঠে দেখা যায় নি। এ জাতীয় নাটকের চূড়ান্ত ঘটনা ঘটে এই ঘটনার মাস পাঁচেক পরে। ২২শে আগষ্ট ১৯৭৮ সালে Dr. Novillo Pruli নামে এক ভদ্রলোক বসু বিজ্ঞান মন্দিরে এসে দাবী করেন, তিনি নাকি জগদীশচন্দ্রের উদ্ভিদতাত্ত্বিক গবেষণার একজন মুগ্ধ ভক্ত। জগদীশচন্দ্রের প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে নূতন এক সিদ্ধান্তে এসে পেঁৗচেছেন। একই জমিতে একই সঙ্গে একই রকমের গাছের বীজ পুরুষ ও মহিলারা আলাদা আলাদা বপন করলেই পুরুষদের হাতে লাগানো বীজ অপেক্ষা মহিলাদের হাতে লাগানো বীজ থেকে গাছ আগে বড় হয় এবং খুব ভাল ফসল ফলে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এ জাতীয় কপট বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টা সম্পর্কে 'Science Today' পত্রিকায় ১৯৭৯ সালের নভেম্বর সংখ্যায় 'The Not so—Secret life of plants' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বসু বিজ্ঞান মন্দির থেকে প্রবন্ধটির সমর্থনে তাঁদের এ জাতীয় অভিজ্ঞতার উল্লেখ করে 'The Danger of Pseudo-Science' নামে একটি চিঠি পত্রিকাটিতে পাঠান হয়। চিঠিটি ১৯৮০ সালের মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

এতো গেল বিদেশী অপপ্রচারের আধুনিক রূপ। সম্প্রতি দেশেও জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে দু একটি বিভ্রান্তিমূলক প্রচার শুরু হয়েছে। আশীষ নন্দী নামে দিল্লীর Centre for the Study of Developing Societies-

এর জনৈক মনস্তত্ত্ববিদ (?) একটি বই লিখেছেন। বইটির নাম Alterrative Sciences'। তাতে তিনি শুধু জগদীশচন্দ্রকেই হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন নি, ভারতের প্রথম FRS রামানুজমকেও একহাত নিয়েছেন। জগদীশ-চন্দ্র সম্পর্কে তাঁর অভিযোগগুলি বড় মজার। আশীষবাবু বলেছেন জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক ফলাফল যথাযথ নয়। প্রায় পুরো ব্যাপারটাই গোঁজামিলে ভরা। এককথায় পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের ফাঁকি দিলেও জগদীশচন্দ্র তাঁর কাছে ধরা পড়ে গেছেন। জগদীশচন্দ্র নাকি বন্ধুবান্ধব ও পরিচিত সাংবাদিকদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে নিজের কাজ সম্পর্কে প্রচার করেছিলেন। তাছাড়া জগদীশচন্দ্র অঙ্ক জানতেন না। তাই তিনি পদার্থ বিজ্ঞান ছেড়ে উদ্ভিদচর্চা করেন। বইটির অন্য এক জায়গায় জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, প্রতিভাধর পদার্থবিদ পরের জীবনে প্রভাবশালী উদ্ভিদবিজ্ঞানী হয়েছিলেন ইত্যাদি আরো অনেক কথা। জগদীশচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কেও তিনি কটাক্ষ করেছেন। তিনি বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তিতে জগদীশচন্দ্র ঈর্ষাপরায়ন হয়েছিলেন। আশ্চর্য কল্পনাশক্তি। রবীন্দ্রনাথের সম্মানপ্রাপ্তি উপলক্ষে জগদীশচন্দ্র লিখেছিলেন, "পৃথিবীতে তোমাকে এতদিন জয়মাল্য ভূষিত না দেখিয়া বেদনা অনুভব করিয়াছি। আজ সেই দুঃখ দূর হইল। চিরকাল শক্তিশালী হও। চিরকাল জয়যুক্ত হও……।" রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে বাংলার সমস্ত সাহিত্য-সেবীদের তরফ থেকে রবীন্দ্রনাথকে যে অভিনন্দন জানানো হয় তার সভাপতি ছিলেন জগদীশচন্দ্র। সেই অনুষ্ঠানে জগদীশচন্দ্র নিজের সাধনার প্রতীক চিহ্ন হিসেবে ছোট গাছ সমেত একটি টব উপহার দেন। গাছটি ছিল একটি সতেজ লজ্জাবতী লতা। রবীন্দ্রনাথের ৭০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে দেশবাসীর পক্ষ থেকে "রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব পরিষদ" গঠিত হয়। তারও সভাপতি ছিলেন জগদীশচন্দ্র। সভাপতির ভাষণে জগদীশচন্দ্র বলেছিলেন, "…আজিকার এই জয়ন্তী উৎসবের স্মৃতি জাতির জীবনে অক্ষয় হোক।…তোমার পূর্ববর্তী সকল সাহিত্যাচার্যগণকে তোমার অভিনন্দনের মাঝে অভিনন্দিত করি।… তোমার সৃষ্টির সেই বিচিত্র ও অপরূপ আলোকে স্বকীয় চিত্তের গভীর ও সত্য পরিচয়ে কৃতকৃতার্থ হইয়াছি।…হাত পাতিয়া জগতের কাছে আমরা নিয়াছি অনেক, কিন্তু তোমার হাত দিয়া দিয়াছিও অনেক।…এই শুভদিনে তোমাকে

শান্তমনে নমস্কার করি। তোমার মধ্যে সুন্দরের পরম প্রকাশকে আজি বারম্বার নতশিরে নমস্কার করি।" জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ে উভয়ের প্রতিষ্ঠানে পরস্পরকেকার্যনির্বাহক সমিতিতে যুক্ত করে আনন্দিত হয়েছিলেন। স্বাভাবিক কারণেইবয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক কারণে ও নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের নানা গঠনমূলক কাজে দুজনেই ব্যস্ত থাকতেন। দেখা সাক্ষাৎ কিছুটা কম হত। ১৯২৬ সালে জগদীশচন্দ্র তাঁর বিখ্যাত "The Nervous Mechanism of Plants" বইটি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করে লিখেছিলেন To my life-long Friend Rabindranath Tagore। মৃত্যুর বছর খানেক আগেও জগদীশচন্দ্র বিশ্ব-ভারতীর উন্নতিকল্পে অর্থ সাহায্য করেছিলেন।

অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু সম্প্রতি নিবেদিতার ওপর গ্রন্থ ও 'দেশ' পত্রিকায় একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখেছেন। এই সব লেখাগুলো থেকে কয়েকটি বিভ্রান্তিমূলক প্রচার পাঠকদের দরবারে তুলে ধরছি।

জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে নিবেদিতার প্রথম পরিচয় ১৮৯৮ সালে। নিবেদিতা জগদীশচন্দ্রের অসীম সংকল্প ও বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ করার দৃপ্ত মানসিকতা দেখে মুগ্ধ হন। তারপর থেকে নিবেদিতা জগদীশচন্দ্রকে বিজ্ঞানের কাজে উৎসাহ দেন। তাছাড়া তিনি সে সময়ে আমাদের দেশের বহু নূতন প্রকল্পেরও উৎসাহদাত্রী ছিলেন। কিন্তু শঙ্করীবাবু তাঁর ধারাবাহিকলেখার শুরুতেই বলেছেন, "নিবেদিতাকে যাঁরা নিছক ধর্মান্দোলনে যুক্ত দেখেন,·· তাঁরা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ভুলে যান জগদীশচন্দ্র বসুর বিজ্ঞান সাধনার পিছনে অন্য যে কোনও ব্যক্তি অপেক্ষা এই নারীর দান অধিক।" এ ধরণের বক্তব্যের অবতারনা করা নিতান্তই অনুচিত। কারণ মহাপুরুষদের জীবনের গতি খরস্রোতা নদীর মত। আপন নিজস্ব গতিতেই সে চলে। কে বেশী কে কম সাহায্য করেছেন তা দাঁড়িপাল্লায় মাপতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

শঙ্করীবাবুর পরবর্তী বক্তব্য নজিরহীন। তিনি বলেছেন নিবেদিতার "আশ্চর্যজনক ক্ষমতা" ছিল। তা দিয়ে তিনি জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ লিখে দিয়েছেন ও বইয়ের বৈজ্ঞানিক নক্সাও (Scientific Diagram) প্রস্তুত করে দিয়েছেন। জগদীশচন্দ্রের "Plant Response as a means of Physiological Investigation" (1906) গ্রন্থটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে শঙ্করীবাবু তাঁর "নিবেদিতা লোকমাতা" গ্রন্থের ৬৬০ পাতায় মন্তব্য করেছেন, "আবিষ্কারের অংশ জগদীশচন্দ্রের, প্রেরণার প্রধান অংশ নিবেদিতার, রচনাংশ

তারই, নক্সা প্রভৃতিও বহুলাংশে তিনিই করেছেন।" এই বইটি সম্পর্কে ও বইটি লেখার প্রস্তুতিপর্বে জগদীশচন্দ্রের মানসিক অবস্থা সম্পর্কে জানা যায় রবীন্দ্রনাথকে লেখা জগদীশচন্দ্রের চিঠিগুলোতে। পাঠকদের উদ্দেশ্যে দুটি চিঠি তুলে ধরছি,

জগদীশচন্দ্র লিখছেন রবীন্দ্রনাথকে :

১৮ই আগস্ট ১৯০৩, ৯৩নং আপার সার্কুলার রোড।

"আমি এত লোকের মধ্যে এখানে সম্পূর্ণ একাকী মনে করি। তুমি কবে আসিবে তাহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছি। আমি একটা খুব বড় তথ্যের অনুসন্ধান লইয়া ব্যস্ত আছি। কিন্তু তুমি কাছে নাই বলিয়া কার্যে অবসাদ জন্মে।"

২৯/৬/১৯০৪ তারিখে লিখেছেন :

"...ইহা হইতে বুঝিতে পারিবে কিরূপ বাধার সহিত আমাকে সংগ্রাম করিতে হইতেছে। তোমাকে লিখিয়া বোঝা অনেক দূরে হইল। কয়দিন পর পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিব।..."

(এই চিঠিতে জগদীশচন্দ্র যে বইটি লেখার কথা উল্লেখ করেছেন সেটি হল "Plant Response as a means of Physiological Investigation").

এই ২৯/৬/১৯০৪ চিঠিরই শেষদিকে নিবেদিতার সে সময়ের কর্মব্যস্ততা সম্পর্কে লিখতে গিয়ে জগদীশচন্দ্র লিখেছেন, "...Sister নিবেদিতা ও Christine তোমার বাড়ীতে স্কুল খুলিবার জন্য বিশেষরূপে লাগিয়াছেন। তবে ছাত্রী যোগাড় কি করিয়া করিবেন জানি না—আর টাকারও দরকার মনে হয়। নিবেদিতা আশা করিতেছেন যে, তাঁহার নূতন পুস্তক বিক্রয় দ্বারা এই অভাব কতকটা দূর হইবে।...তোমার বন্ধুদের মধ্যে এই পুস্তক (নিবেদিতার নিজস্ব বই) বিক্রয়ের সুবিধা করিও।..."

প্রসংগত উল্লেখ্য, জগদীশচন্দ্রের Plant Response as a means of Physiological Investigation বইটি ৫৮+৭৮১ পাতার। তাতে ২৮৭টি বৈজ্ঞানিক নক্সা ও ছবি রয়েছে। বইটি রচনা করতে জগদীশচন্দ্রের দু'বছর সময় লেগেছিল।

শঙ্করীবাবু তাঁর "লোকমাতা নিবেদিতা" গ্রন্থের ৫৯২-৫৯৩ পাতায় ছোট্ট আধা পাতার এক পাণ্ডুলিপির (?) প্রতিচ্ছবি হাজির করেছেন। তাতে লেখা "জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার ও নিবেদিতার রচনা...এখানে জগদীশচন্দ্রের গ্রন্থের (কোন্ গ্রন্থ বলেন নি। যিনি ইতিহাসের অনুসন্ধানকারী

তার পক্ষে এটি রীতিবিরুদ্ধ কাজ) একটি অধ্যায়ের পাণ্ডুলিপির এক পৃষ্ঠার প্রতিলিপি দেওয়া হল—হস্তাক্ষর নিবেদিতার।" কিন্তু জগদীশচন্দ্রের লেখা গ্রন্থগুলিতে ঐ তথাকথিত পাণ্ডুলিপির কোন অস্তিত্ব নেই। যদি শঙ্করীবাবুর কথামত জগদীশচন্দ্রের কোন এক গ্রন্থের কোন এক পৃষ্ঠায় ঐ তথাকথিত পাণ্ডুলিপির অস্তিত্ব দেখা যেত, তাহলেই বা ঐ ছোট্ট চিরকুট থেকে কি প্রমাণিত হত ?

সে যুগে যে সব গবেষণা জগদীশচন্দ্র করেছিলেন তা সবই ছিল অগ্রবর্তী মৌলিক গবেষণা।

মূল কাজের সঙ্গে আগাগোড়া প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না থাকলে কখনো কি কারু পক্ষে সম্ভব (বিশেষ করে যিনি বিজ্ঞানী নন)। বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলোকে বিশ্লেষণ করে রচনা ও নকশা প্রস্তুত করা? বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচনার ব্যাপারে নিবেদিতার পক্ষে কোনমতেই সাহায্য করা সম্ভব নয়। তার আর একটি প্রমাণও পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি। ৪ ডিসেম্বর ১৯৮২ তারিখের "দেশ" পত্রিকায় শঙ্করীবাবু পরিবেশিত নিবেদিতার ২৪শে এপ্রিল ১৯০৭ সালের চিঠির একটি লাইন তুলে ধরছি। নিবেদিতা লিখছেন, "…এর পরেই অবিলম্বে সে (জগদীশচন্দ্র) 'সাইকলজিক্যাল ইনফারেন্স' সংক্রান্ত দুটি অধ্যায় জুড়ে দিয়েছে।" জগদীশচন্দ্র কোনদিনই "সাইকলজিক্যাল ইনফারেন্স" বলে কোন কাজ করেন নি। উনি কাজ করেছিলেন ও লিখেছিলেন সম্পূর্ণ অন্য এক বিষয়ে, তা' হল "সাইকোফিজিক্যাল ফেনোমেননের" ওপর। যিনি অগ্রবর্তী বিজ্ঞান গবেষণার তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে ও নক্সা প্রস্তুত করে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ লেখেন তিনি আর যা করুন, এ ভুল করবেন না। কিন্তু নিবেদিতার পক্ষে এ ভুল খুবই স্বাভাবিক। কারণ তিনি বিজ্ঞানী নন। তিনি ছিলেন জগদীশচন্দ্র তথা বসু পরিবারের শুভাকাঙ্ক্ষী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জগদীশচন্দ্র তাঁর এ পর্যায়ের গবেষণার শুরুতে রবীন্দ্রনাথকে ১৫ই অক্টোবর ১৯০১ সালে এক চিঠিতে বলেছিলেন, "তুমি জাননা তোমার পত্র পাইয়া আমি কিরূপ আশ্বস্ত হই। আমার পদে পদে কত বিঘ্ন তাহা তুমি মনেও করিতে পারনা।…আর আমার কার্য এরূপ কঠিন যে ইংলণ্ডে ২/৩ জন লোক (বিজ্ঞানী) ব্যতীত আমায় শ্রোতামণ্ডলী নাই, তাহারাও পুরাতন মতের অবলম্বী।…"

জগদীশচন্দ্র সর্বমোট ১৪টি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচনা করেন। নিবেদিতা বেঁচে

থাকতে তিনটি। নিবেদিতা হয়ত জগদীশচন্দ্রকে গ্রন্থ রচনার ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন। তবে সেটি কোন ধরণের তা পরিষ্কার নয়। প্রুফ রিডিং, ডিকটেশন নেওয়া ইত্যাদি নানাভাবে লেখককে সাহায্য করা যায়। উল্লেখ্য, জগদীশচন্দ্র তাঁর বইগুলিকে উৎসর্গ করেছেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী অবলাদেবী ও অন্যান্যদের নামে।

শঙ্করীবাবু তাঁর ধারাবাহিক লেখার এক জায়গায় বলেছেন, "১৮১৭ (?) সালে ইংলণ্ডে থাকাকালে ভালো চাকরির প্রস্তাব পেয়েও বসু (জগদীশচন্দ্র) প্রত্যাখ্যান করেন। তার জন্য পশ্চাত্তাপ করতে হয়েছিল তাঁকে। শ্রীমতী বসুরও সেজন্য ক্ষোভ ছিল।" নিবেদিতার সঙ্গে পরিচয়ের আগে (১৮৯৬-৯৭) জগদীশচন্দ্র যখন ইয়োরোপে বৈজ্ঞানিক সফরে যান তখন অলিভার লজ ও লর্ড কেলভিন তাঁকে অধ্যাপনার কাজ নিতে অনুরোধ করেন। জগদীশচন্দ্রের প্রতিক্রিয়া জানা যায় অবলাদেবীর লেখা "বাঙ্গালী মহিলার বিলাত ভ্রমণ" প্রবন্ধে। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "তাহারা দুজনেই (অলিভার লজ ও কেলভিন আচার্যকে ইংলণ্ডে থাকিয়া অধ্যাপক হইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষের হাওয়া ছাড়া তিনি কাজ করিতে অসমর্থ বলিয়া আচার্য তাহাদিগকে অসম্মতি জানাইলেন।" দ্বিতীয় আমন্ত্রণ আসে ১৯০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। অধ্যাপক Barret বলেন, "We had a talk last night (Lodge was one of them). We thought your time is being wasted in India, and you are hampered there. Can't you come over to England? Suitable chairs fall seldom vacant here, and there are many candidates. But there is just now a very good appointment and should you care to accept it, no one else will get it." এই আমন্ত্রণের পরিপ্রেক্ষিতে জগদীশচন্দ্র ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯০০ সালে রবীন্দ্রনাথকে এক চিঠিতে উপরের আমন্ত্রণলিপি উদ্ধৃত করে বলেছিলেন, "...আমার সমস্ত inspiration এর মূলে আমার স্বদেশীয় লোকের স্নেহ—সেই স্নেহ বন্ধন ছিন্ন হইলে আমার আর কি রহিল ?" জগদীশচন্দ্র সর্বদাই বলতেন, "আমার হৃদয়ের মূল ভারতবর্ষে, যদি সেখানে থাকিয়া কিছু করিতে পারি তাহা হইলেই আমার জীবন ধন্য হইবে।" তাছাড়া তিনি ১৯০১ সালে একবার বলেছিলেন, "প্রেসিডেন্সি কলেজের সহিত সম্বন্ধ সহজে একেবারে কাটিতে চাহি না। কারণ তাহা হইলে আমার কার্যে কোন বাঙ্গালী নিযুক্ত

হইবে না।" জগদীশচন্দ্রের কথাগুলি থেকে কি মনে হয় যে তাঁর 'পশ্চাত্তাপের' কারণ ছিল। বরং গর্বভরে বারবার দেশমাতৃকার কথা উল্লেখ করেছেন। আর যাঁর স্বামীর হৃদয়ের মূলে ভারতবর্ষ, যিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পিতৃব্য দেশপ্রেমিক দুর্গামোহন দাশের কন্যা, রক্তে যাঁর পূর্ণ স্বদেশীয়ানা, যিনি স্বামী বিবেকানন্দের কাছে "সর্বগুণ সম্পন্না গেহিনী", তার কি বিদেশী চাকুরী প্রত্যাখ্যানের প্রশ্নে ক্ষোভ আসতে পারে?

নিবেদিতা বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জগদীশচন্দ্রের আকাঙ্ক্ষাকে উৎসাহিত করেছিলেন। নিবেদিতার মৃত্যুর বেশ কিছু বছর বাদে ১৯১৭ সালের ৩০শে নভেম্বর বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু শঙ্করী বাবু এ ব্যাপারে জগদীশচন্দ্রের কঠোর পরিশ্রম, দেশবাসী ও জাতীয় নেতাদের অকুণ্ঠ দান ও সহযোগিতার কথা কার্যত অস্বীকার করে বলেছেন, "ল্যাবরেটরী (বসু বিজ্ঞান মন্দির) স্থাপনের চেষ্টায় নিবেদিতা নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন।" নিবেদিতা সে যুগে অনেক কিছু করেছেন। কিন্তু শঙ্করীবাবু তাঁর নিজস্ব বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করার অত্যুগ্র আগ্রহে যে বক্তব্য রেখেছেন তাতে তিনি পরোক্ষভাবে নিবেদিতাকেও ছোট করেছেন। কারণ নিবেদিতা যা করেননি তা জোর করে প্রমাণ করতে গেলে নিবেদিতাকেও ছোট করা হয়।

বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রবেশদ্বারে প্রদীপ হাতে একটি নারীমূর্তির ছবি আছে। জগদীশচন্দ্র এটি প্রতিষ্ঠা করে বলেছিলেন, "Entering the Institute, the visitors finds to his left the lotus fountain with a bas relief of a woman carrying light to the temple. Without her no light can be kindled in the Sanctuary. She is the true light bearer and no plaything of man." (Is the plant a Sentient being ?—J C. Bose, The Century Magazine Feb. 1929. vol. 117 No 4)। জগদীশচন্দ্র যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন এটিকে জ্ঞানের প্রদীপ হাতে নারীমূর্তি অর্থাৎ দেবমাতা জ্ঞানের প্রদীপ হাতে দাঁড়িয়ে আছেন—এই কথাই সকলে জানতেন। তখনকার পত্র পত্রিকাতেও ঐ একই কথা লেখা আছে। কিন্তু জগদীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর দু'একজন বলতে আরম্ভ করলেন ঐ মূর্তিটি নিবেদিতার। ভাবতে অবাক লাগে এই প্রচারের অন্যতম প্রচারক হলেন অমল হোম। তিনি জগদীশচন্দ্রের শতবার্ষিকী পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন। তাতে উনি বলেছেন মূর্তিটি নিবেদিতার অথচ উনি যখন Calcutta

Municipal Gazette এর সম্পাদক ছিলেন (জগদীশচন্দ্রের জীবনকালে) তখন ১৯২৮ সালের ১লা ডিসেম্বর ও ১৮ই এপ্রিল ১৯৩০ সালের জগদীশ সংখ্যায় মূর্তিটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন—"Above a limpid lotus pool on the wall standing between the residence of Sir Jagadis and the Bose Institute a bronze plaque with the figure of a woman carrying a lamp symbolizes womanhood as the inspirer of idealism and torch bearer of knowledge."

প্রসংগত উল্লেখ্য, শতবার্ষিকী পুস্তকে অমলবাবু আর একটি গুরুতর প্রমাদ ঘটিয়েছেন যা কোনমতেই বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করা চলে না। উনি জগদীশচন্দ্রের একটি বিখ্যাত ভাষণের (রয়্যাল সোসাইটির) "কোটেশনের" ভেতরে কিছু অংশ পরিবর্তন করে অন্য কিছু কথা ঢুকিয়ে দিয়েছেন। তাতে স্বাভাবিকভাবেই বক্তব্যের অর্থ পাল্টে গেছে। ব্যাপারটি কি করে তখন অত জ্ঞানীগুনী মানুষের নজর এড়িয়ে গেল তা বোঝা মুস্কিল। কিন্তু ইতিহাস বড় নির্মম। বর্তমান খড়গপুর আই. আই. টি. হিস্ট্রি অব সায়েন্সের অধ্যাপক বিশ্বপ্রিয় মুখোপাধ্যায় এই প্রমাদটি সকলের গোচরে আনেন। উনি Indian Journal of History of Science (Vol. 14. No. 2. 1979, P. P. 99-100) এর মুখপত্রে এ বিষয়ে বলেছেন,…"It is very surprising that in the first page of the Acharya Jagadis chandra Bose Birth centenary brochure (1958, edited by A. Home) a portion of the Friday lecture (10 May 1901) was quoted with unexplainable 'emendations', among which the following is very glaring…".

শঙ্করীবাবু ঐ মূর্তির ব্যাপারে জগদীশচন্দ্রের উক্তি অগ্রাহ্য করে পরবর্তী দু'একজন ও অমল হোমের পরবর্তীকালের বক্তব্যের জোরে বলেছেন, জগদীশচন্দ্রের কাছে নিবেদিতা "শরীরিণী" ছিলেন না "মনোময়ী" ছিলেন। তাই "মূর্তিটি নিবেদিতার হওয়াই স্বাভাবিক।" দুঃখের বিষয় কথা কটি উচ্চারণ করতে গিয়ে তিনি নিজেকে ও অমল হোম মহাশয়কে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে ভরসা পাননি। আচার্যপত্নী অবলা বসুকে সাক্ষী দাঁড় করিয়ে ও পাঠক সমাজকে আশ্বস্ত করে ২৩শে অক্টোবর ১৯৮২র "দেশ" পত্রিকায় বলেছেন, "জগদীশচন্দ্রের শতবার্ষিকী

(১৯৫৮) সুভিনিরে—যা শ্রীমতী অবলা বসুর জীবন কালে তাঁর সহযোগিতায় বসু বিজ্ঞান মন্দির থেকে…"। আবার ঐ পত্রিকারই ২৫শে জুন ১৯৮৩ সংখ্যায় বলেছেন, "লেডি অবলা বসুর জীবনকালে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ঠিকানা থেকে অমল হোম সম্পাদিত জগদীশচন্দ্রের শতবার্ষিকী পুস্তকে…", কিন্তু ইতিহাস বলে লেডি অবলা বসু মারা যান ১৯৫১ সালের ২৫শে এপ্রিল তারিখে। আর তাঁর মৃত্যুর সাত বছর পরে জগদীশচন্দ্রের শতবার্ষিকী উৎসব ও শতবার্ষিকী পুস্তিকা প্রকাশিত হয়।

এবার শঙ্করীবাবুর আরও একটি বিস্ময়কর কথা চিন্তাশীল পাঠকদের কাছে তুলে ধরছি। নিবেদিতা ১৯১১ সালের ১৩ই অক্টোবর দার্জিলিং শহরে অধ্যাপক পি, কে রায়ের বাড়ীতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। জগদীশচন্দ্র দার্জিলিং শহরে নিজের বাড়ী তৈরী করেন ১৯২১-২২ সালে, নিবেদিতার মৃত্যুর প্রায় দশ বছর বাদে। অথচ উনি বলেছেন, নিবেদিতা "বসু ভবনে দেহত্যাগ করেন।

পরিশেষে অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু এ ধরণের বক্তব্যের সমর্থনে ২৫শে জুন '৮৩ তারিখের দেশ পত্রিকায় সমগ্র চিন্তাশীল পাঠক সমাজকে আশ্বস্ত করে সবিনয়ে ঘোষণা করেছেন, "…বিশ্বাস করতে পারেন, আমি এই সকল তথ্য হাজির করেছি ধুলো ওড়াবার জন্য নয়। সত্য উদ্ধারের জন্যই।"

ভারতীয় আধুনিক বিজ্ঞান গবেষণার জনক জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে এক ধরণের বিদেশীদের বিভ্রান্তিমূলক প্রচার ও ভুল তথ্য পরিবেশনের কারণ অনুমান করা কঠিন নয় কিন্তু দেশের মানুষদের এই ধরণের প্রবণতার কারণ কি? কারণ হিসেবে কি জগদীশচন্দ্রের সেই উক্তি সামনে রেখে বলতে হয় "It is much easier to raise oneself from obscurity by criticising or appreciating the work of a man who is becoming well known…"। না এই প্রবণতার কারণ অন্য কিছু?

নির্দেশিকা

১। N A I Home Education Nos. 26-28 p. 6

২। The Dacca Review, Dec. 1916

৩। Round the World with my Master—B. Sen, Modern Review—1916

৪। The Hindoo, Dec. 1917

৫। Transactions of the Bose Research Institute 1918—1937

৬। The Bose Research Institute revisited—Prof P. Gaddis, Modern Review, Dec 1922

৭। Civil and Military Gazette—4.12.1922

৮। The New Leader—Feb, 22, 1924

৯। Special Report of the Bose Research Institute—1929

১০। Racial discrimination and Science in Nineteenth Century India—D. Kumar, Kurukshetra Univeristy.

১১। Acharya Jagadish ch. Bose and his Scientific activities —Prof D. M. Bose, Indian Journal of Radiolo:y, Feb, 1949

১২। Reply to the Congratulatory address of his Seventieth Birth-day—Prof D. M Bose, March6, 1955.

১৩। Jagadishchandra Bose—Prof D. M. Bose, N. I S of India. Vol. 1. (1966).

১৪। Jagadish Chandra Bose and Indian Scientific tradition— D. Bose, Mainstream, 13 Annual No. P. 141.

১৫। বাঙ্গালী মহিলার বিলাত ভ্রমণ—অবলা বসু, প্রবাসী, বৈশাখ ১৩০২

১৬। 'পত্র পরিচয়', প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩।

১৭। চিঠিপত্র—ষষ্ঠ খণ্ড, রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতী।

১৮। অব্যক্ত—আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

১৯। আনন্দবাজার পত্রিকা—২৫, ১১, ৫৭

২০। সচিত্র ভারত—১৩৪৪, ১৮ই অগ্রহায়ণ, ৫০শ সংখ্যা

২১। সঞ্জীবনী—৯ই, ১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪

২২। সোনার বাংলা—২৭শে নভেম্বর ১৯৩৭

২৩। বিষাণ—পৌষ ১৩৪৪

২৪। প্রবাসী ষষ্ঠী বার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ।

২৫। তত্ত্বকৌমুদী—১৩৭৫

২৬। আচার্য জগদীশচন্দ্রের অপ্রকাশিত বাংলা রচনা—দিবাকর সেন ও সত্তম ঘোষ। দেশ, ৬ ভাদ্র, ১৩৮৮।

২৭। রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি—দিবাকর সেন, ভারত ও সমাজতান্ত্রিক জি. ডি. আর মে, জুন ১৯৮৩।

২৮। নানা চোখে বাংলার জ্ঞানী জগদীশচন্দ্র—সম্পাদনা : দেবব্রত ভট্টাচার্য ও অজয় চক্রবর্তী।

২৯। "আচার্য ভবনে" রক্ষিত জগদীশচন্দ্রের পাণ্ডুলিপি।

মুদ্রণ প্রমাদে প্রতিটি পরিচ্ছেদের পূর্বে সংখ্যা
বসান যায়নি, তার জন্য আমরা দুঃখিত।